অষ্টমীর চাঁদ



দীপ্তরূপ দাস

ভূমিকা



২০২২ সালে আমার আঁকা পাপার ক্যারিকেচার।

দীপ্তরূপ দাস, আমার পাপা। আমার মতে সময়ের থেকে বহু আগে এগিয়ে থাকা একজন মানুষ। শুধুমাত্র এই পোড়া দেশে, তাও বনগাঁর মতো মফস্বল এলাকায় জন্মানো ও থাকার জন্য তার কাজ অনেকাংশেই কোথাও পৌঁছায়নি। গত ২৩/০৩/২০২৫ পাপা মাত্র ৬৪ বছর বয়েসে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তার সারাজীবনের যত কাজ আর্কাইভ করার প্রথম ধাপ পাপার ২০১৭ সাল নাগাদ লেখা এই আত্মজীবনী প্রকাশ। ধীরে ধীরে অন্যান্য কাজও প্রকাশিত হতে থাকবে।

ছোটবেলা থেকেই আমি যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছি, চারপাশে বই, সিনেমা, ছবি আর গানের সাম্রাজ্য তার অনেকটাই কারণ পাপা এবং অবশ্যই মামও। ছোট থেকে আমাকে কোন বয়েসে কোন বই পড়তে হবে, কোন ছবি দেখতে হবে সবকিছুই পাপা শিখিয়েছিল। বিশেষ করে অনুবাদ সিরিজ এর বইগুলো আমায় পড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়েছিল পাপাই। আমার পড়া প্রথম টিনটিন- 'কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য', যার প্রভাব আমার কাজে অপরিসীম সেটাও পাপারই উপহার। এছাড়া অন্যান্য কিশোর সাহিত্য তো আছেই।

একটু বড়ো হয়ে যখন কলকাতায় ছাত্রজীবন শুরু করলাম, তখন মূলত মামের সাথেই ফোনে কথা হতো, পাপা ছিল নেপথ্য ছত্রছায়া। মনে আছে, আশুতোষ কলেজে ভূগোল নিয়ে ভর্তি হয়ে আমি যখন পড়াশুনোর চাপে পর্যুদস্ত, তখন পাপাই অযথা চাপ না বাড়িয়ে এবং লোকে কি বলবে-তা অগ্রাহ্য করে এক বছরের gap নিতে বলে। সেটা আমার কেরিয়ারের পক্ষে একটা স্বস্তির নিঃস্বাস বলা যেতে পারে। দিল্লিতে আমার কর্মজীবনেও পাপার সাহায্য অপরিসীম। অবশেষে গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমার বিয়েতে (যেটা পাপার বহুদিনের শখ ছিল), পাপা কোনো ত্রুটি রাখেনি। সবশেষে আমার বিয়ের অ্যালবামটা পর্যন্ত নিজে হাতে বানিয়ে তাতে তাড়াহুড়ো করে ছবি প্রিন্ট করে লাগিয়ে, এমনকি একটা ফটো কিউব, যা পাপা অনেককেই উপহার দিয়েছে, তাতেও আমাদের ছবি লাগিয়ে, আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে এসে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের সব দায়িত্ব কানায় কানায় পূর্ণ করে গেল। তার ঠিক পাঁচদিন পরে শেষ খবর পেয়ে আমরা বনগাঁয় যাই। আমার এখনো মনে হয়, পাপা যেন আমার বিয়েটার জন্য ও তাতে নিজদায়িত্ব পালনের জন্যই নিজেকে সামলে রেখেছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বেলাগাম সিগারেট খাওয়া, মিষ্টি খাওয়াতেই জীবনটা শেষ হয়ে গেলো।

এবার আসি পাপার কর্মজীবনে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি পাপা তিন ব্যাচ দর্শন আর সংস্কৃত পড়িয়ে অফিস যেত শুকদেব কাকুর বাঁধা রিক্সায়। পাপার কোচিং সেন্টারের নাম ছিল যৌবরাজ্য। বনগাঁর হেন কোনো বাড়ি বোধ হয় নেই যেখানকার অন্তত একজন পাপার ছাত্র নয়। প্রচুর ছাত্র সমাগমে প্রথম দিকে কোর্ট রোডে, পরের দিকে আমাদের বাড়ির সামনের উঠোনটায় 'সারস্বত উৎসব' হতো। নিশ্চিন্দিপুর নামে লিটল ম্যাগাজিনে বেরোতো, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাসহ। সবই পাপার উদ্যোগে। সেখানে যৌবরাজ্যের সাংস্কৃতিক শাখা অপুর সংসারের পক্ষ থেকে পাপা প্রতিবছর বন্ধু ও

ছাত্রদের নিয়ে যে শর্টফিল্ম বানাতো সেগুলো দেখানো হতো। শুধু তাই নয়, পাপা স্লাইড ফিল্ম নামক এক নতুন গল্প বলার মাধ্যম নিয়ে কাজ করতো, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' আমার নিজের খুব পছন্দের। এরকম স্লাইড ফিল্ম শো আমি সারা পৃথিবী ঘুরেও কোথাও দেখিনি। এমনকি দেশের নানা রাজ্য থেকেও পাপার অপুর সংসারের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা সহ অসংখ্য চিঠি আসত আমাদের কাছে। শুধু তাই নয়, পাপা ফোটোকমিক্স নিয়েও কাজ শুরু করেছিল যা খুব সম্প্রতি আমেরিকায় শুরু হয়েছে। সত্যজিৎ রায় ছিলেন পাপার আদর্শ। তাঁকে নিয়ে অধুনা মহার্ঘ্য উদযাপন দেখতে পাই। কিন্তু ৯০ এর দশকে যখন রবীন্দ্রজয়ন্তী নিয়ে মাতামাতি চলত, সেই সময় খুব সম্ভবতঃ গোটা পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র পাপার অপুর সংসারে সত্যজিৎ জন্ম জয়ন্তী পালন করা হতো। এই সবই পাপা সেই ৯০ এর দশকে বনগাঁর মতো ছোট শহরে বসে ভাবতে পেরেছিলো। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় উনি নিজের সময় থেকে অন্তত ২৫ বছর এগিয়ে ছিলেন। সেই সব ফোটোকমিক্স সমেত পাপার লেখা প্রবন্ধ, ছোটগল্প, পেপার কাটিং ও প্রিন্টেড যাবতীয় ডকুমেন্ট এই বইয়ের অন্তর্গত করলাম যা থেকে ব্যক্তি দীপ্তরূপ আর তার কাজের সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা তৈরী করা যায়। কিছু ভুল ত্রুটি থেকে থাকলে তা মার্জনীয়।

রাজনৈতিক ভাবে পাপা আজীবন কমিউনিস্ট ছিল। যখন বহুমানুষ অন্যদিকে চালিত হচ্ছেন, পাপা কখনো কমিউনিজমের রাস্তা ছাড়েনি, কোনোদিন কোনো ধর্মাচরণ করেনি, এমনকি আমার নামের পদবীও তুলে দিয়ে সেখানে নিজের নাম বসিয়েছে। তার কারণ পদবী মানুষের মধ্যে জাতিবাদ, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় হানাহানি ছড়ায়। পাপা বরাবরই এগুলোর বিরুদ্ধে ছিল। জীবনের শেষে পাপার ইচ্ছে অনুযায়ী পাপার মরদেহ নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে দান করা হয়েছে।

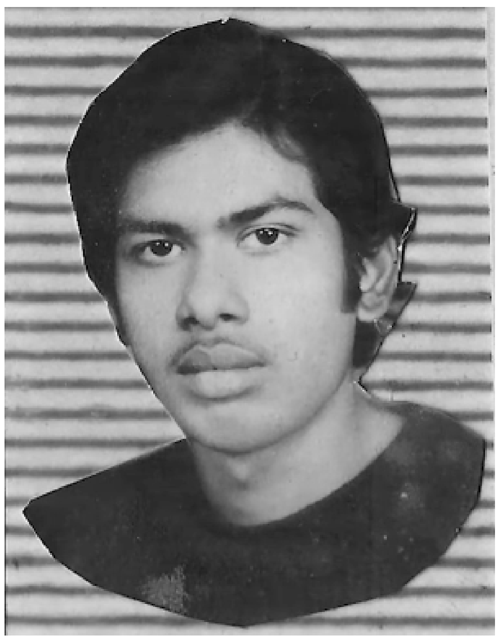
সবশেষে উল্লেখ্য, বনগাঁর ইতিহাসে পাপার নাম চিরকাল লেখা থাকবে। পাপার সমস্ত ফিল্ম, স্লাইড ফিল্ম ও অন্যান্য কাজ আমার কাছেই আছে, সবই একে একে ইন্টারনেট এ প্রকাশ করা হবে। পাপার কাজের মধ্যে দিয়েই পাপা চিরকাল বেঁচে থাকবে। আমি জানি বনগাঁর মানুষ পাপাকে কতটা ভালোবাসে। এই বইতে বনগাঁর বহু মানুষের কথা আছে। তাঁদের আশা করি ভালো লাগবে। এই লেখার কিছু পরে 'নিন্দাবাদ' শিরোনামে পাপা, জীবনে যাদের থেকে যা আঘাত পেয়েছিলো সেসব কথাও কয়েক পাতা লিখেছিলো। কিন্তু তা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলে সেসব বাদ দিলাম। পাপার সমস্ত ব্যবহৃত জিনিস, জামাকাপড়, জুতো, চশমা থেকে শেষ অ্যাশট্রেতে শেষ সিগারেটটা পর্যন্ত সীল করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাছাড়াও পাপার স্কুল- বনগাঁ হাই স্কুলে পাপার নামে দর্শনে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে 'দীপ্তরূপ দাস স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান শুরু করা হয়েছে।

বাকি বিস্তারিত কথা না হয় নিজের আত্মজীবনীতে লিখবো, যদি কখনো লিখি।

চার্বাক দীপ্ত
২৭.০৫.২০২৫
কলকাতা

নিজের সম্পর্কে নিজে লিখতে বসেছি, অন্তত চাকুরী জীবনের প্রান্তে এসে ভাবছি কতখানি সফল আমি? সে দিক থেকে নিজেকে কখনোই সফল বলতে পারি না। না অনার্সে, না M.A., না B. Lib-এ কোনটিতেই সম্মানিত হতে পারলাম না। তবুও, তবুও একেবারেই কি অসফল আমি? যুক্তিবাদী আন্দোলনে, শিক্ষকতায় কোন একটা দাগ কি রাখতে পারলাম না? সে বিচার করবে ভবিষ্যৎ। তাও আমি চুলচেরা বিচারে দেখছি মাষ্টার মশাইদের ভালবাসা, বন্ধুদের ভালবাসা, ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসায় জীবন আমার টইটুম্বুর, বহু কিছু করেছি আমি, ভবিষ্যতের সিন্দুকে তার হয়তো কিছুই স্থান পাবে না তবুও সমসময়? তার কি কোনও দাম নেই? এই ভরসাতেই গুটি কতক কথা লিখছি। বিশেষতঃ আমার সাংস্কৃতিক জীবন এবং অবধারিত ভাবে আমার শিক্ষকতা জীবন এবং গ্রন্থাগারিক এর জীবন আমার কর্ম জীবনের সবটা জুড়ে। সেই জন্যই আমি বলি আমার তিনটে জন্মদিন। এক, যেদিন মা'র গর্ভ থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর মুখ দেখেছি। দুই, ১৯৭৬ সালের ৬ই মে, যেদিন আমার শিক্ষক জন্ম শুরু হয় আর তিন, ১৯৮৬ সালের ২০শে অক্টোবর, যে দিন আমার চাকুরী জীবন অর্থাৎ গ্রন্থাগারিক জন্ম শুরু হয়। আমার কোন প্রয়াসই পূর্ণিমা পর্যন্ত যেতে পারে নি। মাঝপথেই গেছে সে বাঁক ফিরে অন্য রাস্তায়। সেইজন্যই আমার জীবন মানে অষ্টমীর চাঁদ। যে সম্ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করেছি, প্রতিটিই মাঝপথে পথ হারিয়েছে। আমি পথ ভোলা এক পথিক।

যে সব দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে 'আমি' তাঁদেরকে আমার প্রণাম জানাই। সর্বপ্রথম বি.ডি.স্পিনোজা যাঁর ঈশ্বরতত্ত্ব আমাকে আচ্ছন্ন করে। প্রকৃতিই ঈশ্বর এই ভাবনা স্বীকার করে নিলে হিন্দুদের হাজার হাজার মূর্তিপূজা অসার বলে মনে হয়। ব্রহ্ম বা প্রকৃতি আসলে এক এবং অদ্বিতীয় -এই ধারনা পেয়েছি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শংকরাচার্য্যর কাছে। কার্ল মার্কস যাঁর দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ তথা সমাজতন্ত্রে এখনও আমি পুরোপুরি বিশ্বাসী যতই পৃথিবী থেকে মার্কসবাদ উঠে যাক। বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। সিগমুন্ড ফ্রয়েড যাকে আমি অভ্রান্ত বলে মনে করি। মানসিক যে কোন বিকারকে আমি ব্যাখ্যা করি ফ্রয়েডের তত্ত্বকে সামনে রেখে। সমাজ যুদ্ধ ভালবাসা এ সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ' আমার জীবনের ধ্রুবতারা। কলেজে উজ্জ্বল বাবুর অসাধারন ব্যাখ্যা আলোচনায় শ' আমার কাছে মূর্ত হয়েছিলেন। প্রণাম জানাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, অসম্ভব অপমান জ্বালা সহ্য করেও যিনি বাংলার মা-বোনেদের উচ্চতর আসন দান করেছিলেন। তিনি আমার কাছে ঈশ্বরের মূর্তরূপ। প্রণাম জানাই শিক্ষক কুল শিরোমণি হেনরি লুই ভিডিয়ান ডিরোজিওকে, মাত্র ২৩ বছর বয়সে এই দর্শনের অধ্যাপক স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। রামকৃষ্ণদেবের মত "যত মত তত পথ" আমাকে আপ্লুত করে। সর্বশেষে চার্বাক - এই



কিশোর বয়েসের ছবি।

দার্শনিকরা শত কুৎসার মধ্যে দিয়েও আন্দোলন চালিয়ে গেছেন ধর্ম, শোষণ, জন্মান্তর, বেদ, পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে। অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ কোন দিনই আমাকে আকর্ষণ করেনি। মণি মন্ডল, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে বস্তুবাদ ও জড়বাদের প্রবল সমর্থক হওয়ার জন্যই বীর সন্ন্যাসী বা কবিগুরু কারোরই নির্বিচার গুনগ্রাহী হতে পারিনি। বরঞ্চ লালন বা নজরুল যাঁরা জীবন দিয়ে বিধর্মের পূজারী হয়েছেন তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। জীবনে জ্ঞানতঃ কখনও ধর্ম আচরণ করিনি। এর জন্য অনেক অপমান, কুৎসার লক্ষ্য হয়েছি। ভাবি, আমার যদি এই অবস্থা হয় তবে আমার পূর্ব পুরুষ প্রমিথিউস-দের অবস্থা কি হয়েছিল? ভাবতে অবাক লাগে ভারতের সবচেয়ে বড় Industry হল ধর্ম। এখানে লোকে ধর্ম খায়, ধর্ম ঘুমায়, ধর্ম দিয়ে সন্তান উৎপাদন করে। এমনকি বড় মার্কসবাদী নেতাও পূজা করে প্রসাদী সন্দেশ বিলান। কন্যা সন্তান হলে আমজনতা মাকে দোষী ঠাওরায়। উচ্চশিক্ষিত নারী-পুরুষ বিয়ের সময় অর্থ শিক্ষিত পুরোহিতের অস্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ পুনরাবৃত্তি করে বিবাহ সমাধা করে। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত অমর্ত্য সেন বলেছেন "ভারতের লোকের একমাত্র সমস্যা হল চিন্তাহীনতা"। সত্যিই তাই। বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করার ইচ্ছাই নেই। সবাই বলছে বলেই সবাই বলছে "মামার জয়"। "কেন?" এই প্রশ্নটাই কারও মধ্যে নেই। সৌরভ গাঙ্গুলী মঙ্গলচন্ডী পূজা করে গিয়েও প্রথম বলে আউট হয়, তবুও পূজা করেই যাচ্ছে। দেশে শচীনের মতো মহীরুহ সেও গিয়ে সাইবাবার আশীর্বাদ নিচ্ছে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।

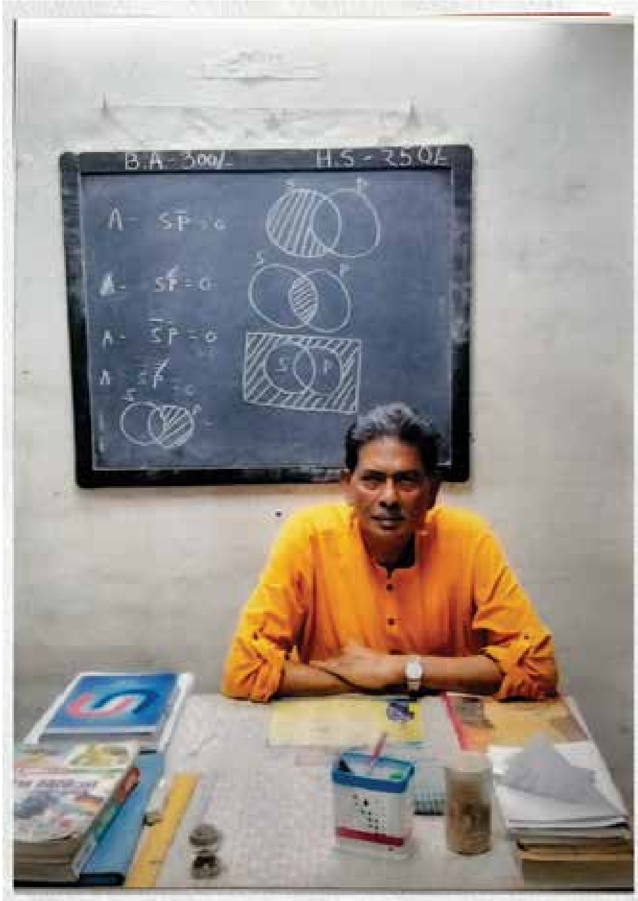


যুবক বয়েসের শখের পাইপ।



বাড়ির বৈঠকখানার লাইব্রেরিতে।

আমার ছাত্র জীবন



নিজের কোচিং সেন্টার ‘যৌবরাজ্য’-এ।

ছাত্র জীবন তো সারা জীবন ধরেই। সেই কবে মা হাঁটতে শিখিয়ে ছিল। তারপর তো শুধুই শেখা। স্কুলে, কলেজে, হাটে, মাঠে, ঘাটে শেখাই তো চলছে। দিদি আমাকে অ-আ-ক-খ শেখালো। ছোড়দা, চিনিদা নিয়ে গেল মডেল স্কুলে। রতন বাবু সেখানেই শেখালেন তাঁর বাঁকা আঙুল সহযোগে ‘এক দিন রাতে আমি স্বপন দেখিনু’। সেই শুরু হল আমার আবৃত্তি চর্চা। এখনও পড়ানো মানে আমার কাছে আবৃত্তিই বটে। ক্লাস টু-তে পড়ার সময় দিদির বিয়ে হল। বড়দির বিয়ে হয়েছিল যখন আমি দুই বছরের। দিদির বিয়ের পর দিন জামাই বাবুর কাছেই প্রথম শুনি গোপাল ভাঁড়ের গল্প। শ্রোতা আমি, খোকন আর মিতা। চমৎকৃত হয়েছিলাম, আবার জামাই বাবুর গ্রাম্য ভাদুয়া গল্প শুনে বিরক্তও হয়েছিলাম বটে। আমার পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে ছোট জামাইবাবুর মুগ্ধতা দেখে আবার আমার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছিল। তার পরেই দিদির শ্বশুর বাড়ী হাদিপুরে আমার যাতায়াত। বড়দির বেহালার শহরে শ্বশুরবাড়ীতে যেন ঠিক হাঁফ ছাড়তে পারতাম না। সেই নিঃশ্বাস ছাড়তাম হাদিপুর গিয়ে। ওখানে তারক, বুলা, সন্ধ্যা, রেবা আরও কত মেয়ের সামনে আমি তো হিরো।



বাড়িতে স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।

থ্রি-তে যখন পড়ি, বড় জামাইবাবু এবং বড়দির অনুকম্পায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল কালিম্পং- এ। অসাধারন একটা সময় কাটিয়ে ছিলাম সেখানে। ‘অপুর অচেনার আনন্দ’ তখন আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে। রাস্তার মাঝখানে পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রাইভার গেল তেল আনতে। বোধহয় আধ ঘণ্টা হবে। তখন প্রকৃতি তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে যেন উপস্থিত আমার

কাছে। বনগাঁর এঁদো গাঁয়ের একটা ছেলে, যে বনগাঁ-কে 'বনগা' বলে, তার জীবনে রাস্তার ধারের ঝর্ণা আর পাহাড়ি ফুলের গন্ধ আবিষ্ট করে দিয়েছিল।



বনগাঁর বাড়িতে, দাদাদের সাথে।

কালিম্পং এর সেই একমাসের ঘোর যেন আর আমার কাটছিলই না। ক্লাস থ্রি- এর পরীক্ষায় একেবারে থার্ড। সবাই বলল পাহাড়ী ভূত ধরেছে। ক্লাস ফোরে বোধহয় মার্চ মাস নাগাদ বন্ধুদের, মানে খোকন, পান্নু, মুন্না, ভাইদাদের নিয়ে করলাম নাটক "অবাক জল পান"। আশ্চর্য জনক ভাবে পরিচালনা করলাম আমিই। ছোড়দা দেখে চমৎকৃত হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে প্রস্তাব দিল 'ডাকঘর' নাটকে অমল হওয়ার। সুধা হবে পাড়ার মেয়ে 'পাকা'। মন প্রাণ দিয়ে অভিনয় করলাম। দিদি কোলকাতা থেকে চলে এলো নাটক দেখতে। অভিনয় শেষে প্রাইজ আর প্রাইজ। কটাদা কোলে নিয়ে আমাকে প্রাইজ দিয়েছিল একটি পেন। কে যেন একটা এ্যালবাম দিয়েছিল। প্রথম পৃষ্ঠায় আমার নকল আংটি (আসল আংটি কোথায় পাব?) প'রে, সেই ছবিটি এখনও আছে সেই এ্যালবামে। তোলা হল চ্যাটার্জী বাড়ীর ছাদে। চ্যাটার্জী বাড়ীর কথায় মনে পড়লো জেঠিমা, বড়দা, বড় বৌদি, মেজ বৌদি, টেপিদি, বুড়িদির কথা। আমরা ছিলাম ওদের ভাড়াটে। বাবা ১৯৪৮ সালে ১৫ই আগষ্ট ইন্ডিয়াতে আসে মা, আমার দুই দাদা, দুই দিদিকে নিয়ে। বাবা মাখন লাল দাস, মা প্রতিমা দাস। প্রথমে তালতলায় লালবাড়ীতে ভাড়া আসে বাবা-মা। পরে সুবোধ চ্যাটার্জীর ভাড়া বাড়ীতে। যদিও আমাদের ভাড়াটে বলে মনেই হত না। ও বাড়ীর দাদা, বৌদিদেরই ডাকতাম বড়দা, মেজদা, বড় বৌদি, মেজ বৌদি বলে। টেপিদি, বুড়িদি আমার দিদিদেরই বন্ধু ছিল। বড়দি তো নিজেদের বাড়ী বলতে ঐ বাড়ীকেই দেখাতো। ঐ বাড়ীরই পালু, মুন্না,



যৌবরাজ্যের 'সারস্বত উৎসব' সঞ্চালনায়।

ফুজু, মিঠু ছিল আমাদের খেলার সাথী। আর ছিল আমাদের সহ-ভাড়াটে বৈকুন্ঠ গোস্বামী। ওর ছেলে খোকন ছিল আমার Best Friend। খোকন, রঘু আর আমি চিনিদাদার কাছে নিই ছোট বেলার শিক্ষা। সিক্স পর্যন্ত রঘুদের বাড়ীতেই চলতো আমাদের পড়াশুনা।

যুদ্ধ লাগলো। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে বাঙ্কার করে মিলিটারিরা থাকতো। ওদের সঙ্গে আমাদের ছিল খুব দোস্তি। ওদের তৈরী মোটা মোটা রুটি সব্জি খেতাম জঙ্গলে বসে। ঐ সময়ই দুর্ভিক্ষ লাগলো। বাড়ীতে আসতো কাউনের চাল, যবের আটা, ভুট্টা আটা। গরিব বাবা আমার। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেলেও আমরা পাঁচ ভাই আর বাবা, মা এই সাত জনের নিতান্ত অনাটনের মধ্যে দিন কাটতো। আশ্চর্য, সেই সময়ে আমার কিন্তু কোন বোধই হয়নি এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে। সব স্বাভাবিক বলে মনে হত। আজও আমার সব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অপমান, যন্ত্রণা সবই সারা জীবন সহ্য করেছি স্বাভাবিক মনে করেই। টু-তে যখন পড়ি তখন সাইকেলে চাপা পড়ে পা ভেঙ্গে গেল। মন অবশ্য ভাঙ্গেনি। সব স্বাভাবিক মনে করার একটা সুবিধা আছে। ভেঙ্গে পড়াটা আমার জীবনে কখনও হয়নি। All for good আমার জীবনের একটি আপ্ত বাক্য। আমি মনে করি আমরা সবাই একটি পরম শিব বা মঙ্গলের দিকে এগোচ্ছি। খারাপ থাকলেও তা কেবল ক্ষণিকের।


যৌবরাজ্যের কোর্ট রোডের পুরোনো ঠিকানায়।


সিকিমে বরফের মাঝে বন্ধু নিখিল বিশ্বাসের সঙ্গে।

ক্লাস-টু তে যখন পড়ি বাবার সঙ্গে



‘আইডল’ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিশ্চিন্দিপুরের জন্য কবিতা সংগ্রহে।

দেখা করতে এলো এক ঠাকুর মশাই। বাবা ছিলেন হীরামহল নামে এক ছোট্ট সিনেমাহলের ম্যানেজার। বড়ই দীনহীন। তবুও আমাদের বাড়ীতে যেন সুখের জোয়ার। বাবার কঠোর অনুশাসনে সব ভাইরাই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি। পড়াশুনায় বাড়ীতে আমি ছিলাম সর্বোত্তম। তাই একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় পেতাম আমি। খাওয়া দাওয়ায় বাবা ছিল First Class First। মামা বাড়ী থেকে প্রায়ই চলে আসতো সবাই আমাদের বাড়ীতে মুখ পাল্টাতে। সেই জিনের উপযুক্ত উত্তরাধিকার রোধ হয় আমি পেয়েছি। আজও কেউ আমাদের বাড়ীতে এসে আমাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়। যা হোক, যা বলছিলাম সেই রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমাকে আর ভাইদাকে দিয়েছিলেন একটি বই-‘যুগে যুগে ভগবান’। সেই বই থেকে আমাদের রোজ সন্ধ্যায় পড়তে হতো-

“ভব সাগর তারণ কারণ হে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে”



জনৈক শিশুর সাথে।

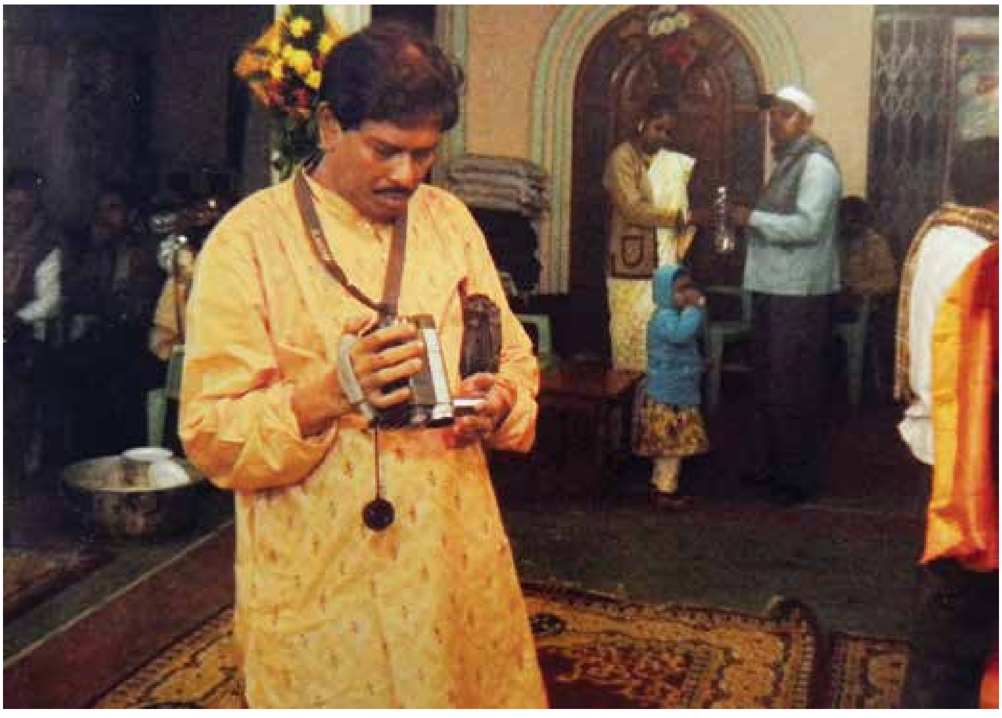


বিয়ের পর অভ্যাগতদের সাথে।

ভাঙ্গা পা নিয়েই মার কোলে শুয়ে শুনতাম আলিবাবা চল্লিশ চোরের গল্প, আলাদিন, সিন্ধবাদের গল্প, এই ভাবেই গল্পবলা আর গল্প পড়া আমার জীবনের সঙ্গী হয়ে গেল।

৭০ সাল। ফাইভে ভর্তি হলায় বনগাঁ হাই স্কুলে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীও পরিবর্তন হল আমাদের। আমলাপাড়া থেকে পেয়াদাপাড়ায়, রঘুদের বাড়ীতে। ওখানে আগে ছিল বড়ুয়া সাহেব, খুশিদি, বুলান, মিলি, বাপ্পা আর মিতা। মিতা ছিল আমাদের ক্লাসের। মডেল স্কুলে আমার বন্ধু ছিল পদ্মশ্রী, মিতা, কল্যানী, মন্টুলি, শৈলেন, মদন এবং খোকন। জানি না এখন কে কোথায় আছে। পদ্মশ্রী এখনও আমাদের পারিবারিক বন্ধু। বোধ হয় কোলাঘাটে থাকে, মেয়ে জামাই এর সঙ্গে। বড্ড দুঃখের জীবন ওর। স্বামী একটা ঝি-কে বিয়ে করে গ্রামে থাকে। যাক তবু পদ্মশ্রী মেয়ের চাকরীর দৌলতে সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছে। অন্যরা কে কোথায় থাকে আজ আর জানি না। খোকন শুনেছি মেলায় মেলায় চুড়ি বেচে। খোঁজ খবর করে ওকে আমার বিয়েতে বর যাত্রী নিয়ে গিয়েছিলাম।

যাক যা বলছিলাম, খুশিদি যে আবার বড়দির ননদ, জলপাইগুড়ি চলে গেল। আমরা সেই সুযোগে ওদের ভাড়া বাড়ী গিয়ে উঠলাম। মাত্র ৪২ টাকা ভাড়া। প্রথম ছাদওয়ালা বাড়ীতে উঠে কি আনন্দ আমাদের। বর্ষায় ছাদ থেকে আর জল পড়বে না, এই ভেবেই আমাদের কি আনন্দ। তার আগে বৃষ্টি পড়লেই আমাদের নাচন শুরু



শ্যালকের বিয়েতে ছবি তোলার ফাঁকে।

হত হাড়ি, কলসি, বালতি নিয়ে টালির ছাদের ফুটো দিয়ে জল আসা বন্ধ করতে। সেটাতো বন্ধ হলো।

নতুন বিশাল স্কুলে ভর্তি হয়ে বিস্মিত হয়ে গেলাম। মডেল স্কুলের ঘুপচি ঘর ছেড়ে বিশাল বিশাল ঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নতুন বন্ধু হলো বিশ্বজিৎ, অলোক দাস, জ্যোতিপ্রসাদ, সন্দীপ শেঠ, আশোক রাহা। পুরানো বন্ধু সব ছাড়াছাড়ি। পুরানো স্যাররাও সব দুরে চলে গেলেন। নতুন স্যর সমীর চন্দ, সমীর ভাস্কর, মগ (ভালো নাম জানি না), বরুন দাস, মৌলবি স্যার, দেবকী দা, নির্মল কাজুরি, নির্মল মুখার্জি এবং সবার উপরে অমরেন্দ্র কান্তি দাশশর্মা, আমাদের হেড স্যার। অসম্ভব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, রাশভারী অবাধ্য শিশুর মতো আমাদের সঙ্গে খেলতেন One Two Three, What do I see? আনন্দের সঙ্গেই কাটিয়ে দিলাম ক্লাস ফাইভ। ফাইনাল পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছিলাম। তাই বা কম কিসের?



সিকিমে স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।



প্রিয় গরদের ধুতি পাঞ্জাবি বেশে।

৭১ সাল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ন বছর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লো India। ইন্দিরা গান্ধীর প্ররোচনাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আন্দোলনের ডাক দিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। দুটি ঘটনা ঘটেছিল ৭১ সালে। প্রথমার্ধে বন্যা। সেই বন্যায় বহু লোক দুর্গত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল বীনাপাণি প্রাইমারি স্কুল। সেখানে শ'খানেক লোক এসে উপস্থিত। তাদের রোজ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হত রিলিফ অফিস থেকে। পাড়ার ছেলে, বৌ-রা হাতে হাতে রুটি, সজি তৈরী করে তাদের খাওয়াতো। দিব্যি জগ্যিবাড়ি, সকাল থেকে রাত্রি। মাস দু-তিন বোধ হয় তারা ছিল সেখানে। আত্মীয়তায় বাঁধা পড়েছিলাম যেন আমরা সবাই। মনে আছে মনোজ নামে একটি ছেলেকে। আমার থেকে কিছু বড়। বন্ধুত্ব

হয়েছিল তার সঙ্গে পড়াশোনার সুবাদেই।



বিয়ের পর স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।

যুদ্ধ শুরু হলো। সত্যজিৎ রায় তার আগেই সিনেমা করেছেন ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’। যুদ্ধ বিরোধী স্লোগান ছিল তাতে। তবুও সাধারণ মানুয়ের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে কি উন্মাদনা। ভারতের পক্ষে রাশিয়া আর পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা। আমাদের বনগাঁর উপর দিয়ে গড় গড় করে যেত ট্যাঙ্ক। আমরা অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম সেই সাঁজোয়া গাড়ীর দিকে। আবার উদ্বাস্তু! হাজার হাজার পূর্ব পাকিস্তানি লোকে ছেয়ে গেল বনগাঁ তথা পশ্চিমবঙ্গ। পোশাকি নাম ছিল refugee। নতুন নতুন শব্দে তখন আমরা মাতোয়ারা। জানি না যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রের দাম কি হয়েছিল। সে বাবারা বোধ হয় জানতো। সাধারন মানুষের কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক নেতাদের জাতীয়তাবাদী জয়নাদে। আবার বীণাপানি স্কুল, আবার রিলিফ। স্বপনদা, আমার খুড়তুতো দাদা আর ওর বন্ধু দেবদাসদা আমাদের বাড়ীতে এসে উঠলো বনগাঁয় রিলিফ-এর চাকরী নিয়ে। পাশের বাড়ীর দাদার বৌ-বীণা বৌদির সঞ্চালনায় বাড়ী তখন লোকজনের উৎসবে জমজমাট। আমার চিরবুদ্ধু বাবা লোকজনকে আপ্যায়ণ করতেই উদ্বাহু। পরে জানা গেল সেই দেবদাসদা ঢাকা কলেজের প্রফেসর।



আমলাপাড়ার বাড়ির সামনে যৌবরাজ্যের বাইরে দাদা প্রদ্যুৎ ও ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে।

দিব্যি বিনা পয়সায় লজে কাটিয়ে গেল তিন-চার মাস। অবশেষে ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলো। নতুন নাম হলো বাংলাদেশ। 'আমার সোনার বাংলা'। সিমলা চুক্তিতে সই করলেন ইন্দিরা গান্ধী আর পাকিস্তান শাসক জুলফিকার আলী ভুট্টো।



'সারস্বত উৎসবে' দাদাদের সঙ্গে।

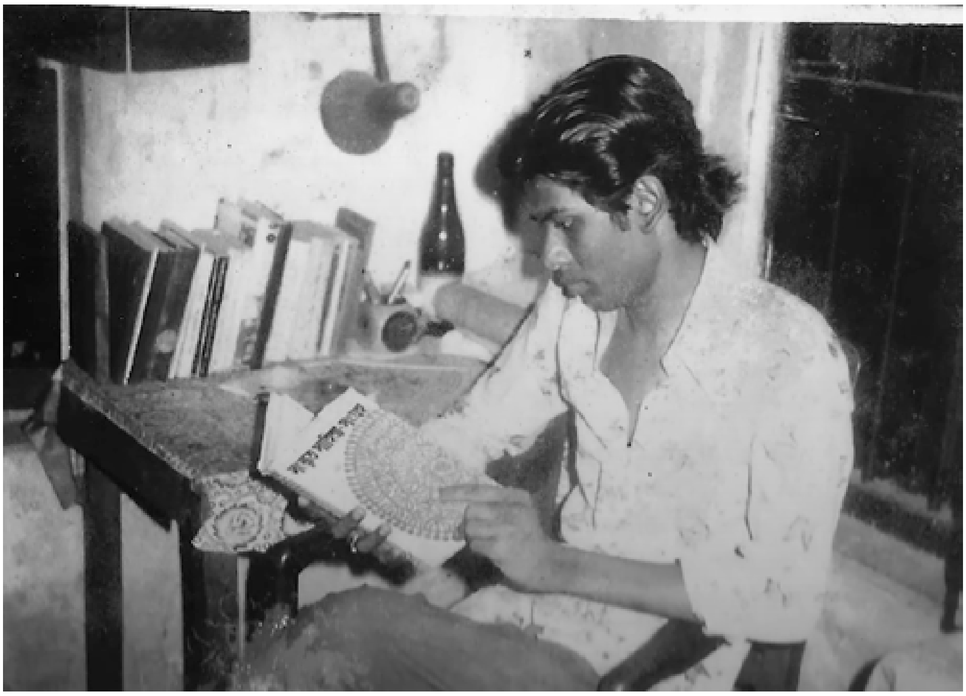
ক্লাস ফাইভ এ যখন পড়ি, উদ্যোগ চলছে বীণাপানি টিউটোরিয়ালে 'ডাকঘর' নাটকে অভিনয় করার। সেই সময় একদিন বাড়ীর বাইরে মডেল স্কুলের হেড স্যার রতন সাধুর গলা 'দীপ্তরূপ বাড়ী আছিস?' বেরিয়ে আসলাম বাড়ীর সবাই। জানা গেল বনগাঁ মহকুমায় আমি বৃত্তি পেয়েছি। মাসে ৩ টাকা করে। আমার আনন্দ দেখে কে? মডেল স্কুলে বার্ষিক অনুষ্ঠানে রতন বাবু আমার হাতে তুলে দিলেন একটি Dictionary। আজও যা আমার বই এর তাকে শোভা পাচ্ছে।

যুদ্ধে আপাত দৃষ্টিতে ভারত জিতেছিল। কিন্তু তখনই দু'টুকরো পাকিস্তানের সাক্রোশ গর্জন ছিল- আগামী ২০০ বছর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলবে। তাই চলছে। আজও আমরা ভারত-পাকিস্তানের নাগরিকরা যতই পরস্পরের সঙ্গে মিশতে আগ্রহী, রাজনৈতিক নেতারা কিন্তু জেহাদ ঘোষণা করেই চলেছেন। ভারতে চলছে পাকিস্তান বিরোধী জিগির আর তার খেসারত দিচ্ছি আমরা। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের জেরে বিক্রি বাড়ছে মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রের, আর আপামর ভারতবাসী পাকিস্তানবাসীর ট্যাক্স জমা পড়ছে সরকারী কোষাগারে। আমার নিজের ধারনা, ভারতের যাবতীয় দুঃখের মূলে রয়েছে তিনজন। এক, নেহরু, যার অপরিসীম



শ্যালিকা অজন্তা ও ইলোরার সাথে।

উচ্চাকাঙ্খার জন্য ভারত ভাগ হলো; দুই, ইন্দিরা গান্ধী, যার বাংলাদেশের বাজার দখলের স্বপ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে স্থায়ী যুদ্ধ আর রাজীব গান্ধী, যার অপরিপক্ক বুদ্ধিতে বাবরী মসজিদের দরজা খুলে দেওয়া। তারই ফলে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে বি.জে.পি.-র রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা। সত্যি বলছি, আমার ছোট বেলায় হিন্দু মুসলমানের জাতিবৈরিতার কিছুই টের পাইনি। একসঙ্গে মেলামেশায় কোন অসুবিধায় দেখিনি। অথচ এখন বি.জে.পি. আচ্ছন্ন দেশে আমরা-ওরার হাতছানি।



কিশোর বয়েসে প্রিয় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠরত দীপ্তরূপ।

৭২ সাল। আমার ক্লাস সেভেন। এতদিন পড়তাম চিনিদাদার কাছে রঘুদের বাড়ীতে। আমি, রঘু আর খোকন। আরেক বিস্ময়। Private পড়ি অনেকে মিলে, ছেলে, মেয়েসহ। নতুন বন্ধু হলো মিতালি, স্বপ্না, দুর্গা। ২৫শে বৈশাখ নাটক করলাম 'মুকুট', 'ধুরন্ধরের' চরিত্রে। ভাইদা 'রাজধর'। জয়দেব আচার্য, রিন্টুদা, স্বপন বাছাড় এবং সুকুমারদা ঈশা খাঁর চরিত্রে। যতবার অভিনয় করেছি ততবারই হাততালি পেয়েছি। মনে মনে গর্বও হয়েছিল অনেক প্রাইজ পেয়ে। কিন্তু বিনুদা, আমার friend- philos-opher-guide, বারণ করেছিল রবীন্দ্র নাটকে অঙ্গভঙ্গি করতে। বিনুদাই আমাকে শিখিয়েছিল অভিনয় কাকে বলে। উত্তমকুমার যে টিপিক্যাল অভিনেতা আর সৌমিত্র যে সেরিব্রাল অভিনেতা এটা শিখেছিলাম

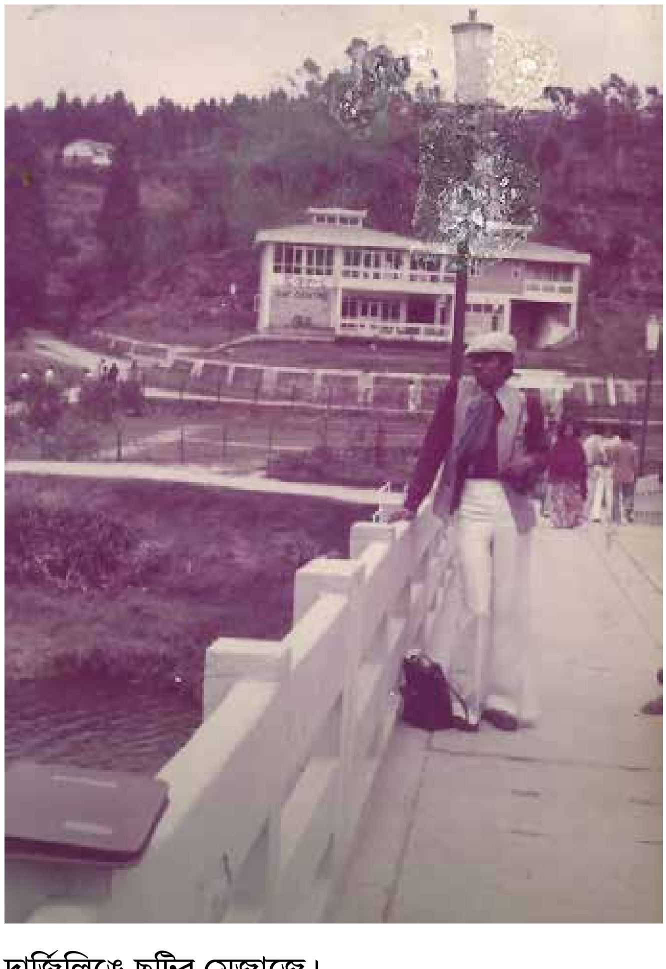


হায়দ্রাবাদ ভ্রমণে স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।

বিনুদার কাছেই। অসম্ভব রসিক, জ্ঞানী এবং অহঙ্কারী বিনুদা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। বলতে গেলে এক ছাদের নীচে থাকতাম আমরা আর বিনুদারা, মানে বিনুদা, অনুদি, বুড়িদি আর কালিদি। গোবরে পদ্মফুল ছিল বিনুদা। ঐ পরিবারে কি করে বিনুদার মতো মানুষ জন্মালো, এ এক বিস্ময়। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের Clerk থেকে নিজের অধ্যবসায়ে B.C.S. পাস করে Deputy Magistrate পর্যন্ত হয়েছিল বিনুদা। যদি যৌবন পর্যন্ত বিনুদাকে সঙ্গে পেতাম তাহলে আমার, ভাইদারও ভবিষ্যৎ অন্যরকম হতো। বিনুদার সঙ্গে তুলনীয় আরেকজনকেই পেয়েছি জীবনে-মণিবাবু, বনগাঁ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। তখন সেভেন-এইটে পড়ি। বিনুদাকে দেখছি লক্ষ্মীপুজার নৌকা বানাতে যেমন তেমন ভাবে। আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীপুজাতে খুব ধুমধাম হতো। বাবা স্বভাবসিদ্ধভাবে লোকজনকে বিভিন্ন রকমের পায়েস খাইয়ে যারপরনাই আহ্লাদিত। সেখানে নৌকাটিও খুব সুচারু ভাবে করা হতো। আমি বিনুদাকে অমন ভাবে নৌকা বানাতে দেখে বললাম আরও ভালোভাবে নৌকা বানানো যায় না? বিনুদার সদন্ত উত্তর 'লক্ষ্মীর বাবার ভাগ্য ভালো আমি নৌকা তৈরী করে দিচ্ছি'। ধার্মিক বাড়ীর আমি তো 'হাঁ'। বিনুদাকে একাই রিক্সায় আসতে দেখে আমি প্রশ্ন তোলায় বিনুদার উত্তর 'আমার পাশে বসার মত বনগাঁয় কেও নেই তাই' আমি আবার 'হাঁ'। নিজ মতে স্থির বিনুদা, বিনয় সেনের আমাকে সস্নেহ উপদেশ ছিল 'নিজের ঢাক নিজেই বাজা, কারো দায় পরেনি অন্যের ঢাক বাজানোর'। আমি আজও এই মতে বিশ্বাসী।



অশোকনগর পার্কে 'আজ বসন্ত' সিনেমার শুটিং-এ পরিচালকের ভূমিকায়।



দার্জিলিঙে ছুটির মেজাজে।



বিয়ের আগে ভিক্টোরিয়ার মাঠে হবু স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।

সেভেনে থাকতেই আমার শুরু বিদেশী বই এর অনুবাদ পড়া। মনে আছে বীনাপানি গ্রন্থাগার থেকে 'অলিভার টুইস্ট' বই নিয়ে যশোহর রোড ধরে পড়তে পড়তে গেছি আমি। এখনকার যশোর রোডের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না তার। কোনও গাড়ী নেই, মোটর সাইকেল নেই। সাইকেল, রিক্সা আর ঘোড়ার গাড়ী শোভিত সেই যশোর রোড আজ ক্রিম, পাউডার শোভিত এক মহাসড়ক। সেই শুরু। তার পর থেকে শুধুই বই কেনা আর বই পড়া। বড়রা বাড়ীতে বেড়াতে এসে যাওয়ার সময় দুই-এক টাকা দিয়ে যেত। তাই দিয়েই কল্যানী বুক হাউসে গিয়ে দুই পয়সা, তিন পয়সা, পাঁচ পয়সা ঢেলে দিয়ে কিনতাম অনুবাদ সিরিজের বই। ইংরাজীতে তুখোড় সুভাষদাকে request করে অনুবাদ করিয়েছিলাম 'ট্রেজার আইল্যান্ড'। কি হাবা আমি! যে বই কিনতেই পাওয়া যেত দেবসাহিত্য কুটিরের থেকে তা আমি সুভাষদাকে খাটিয়েছিলাম অনর্থক। বন্ধুরা মিলে আমার বারান্দায় করলাম 'সাহিত্য মন্দির' লাইব্রেরি। সবাই সবার বই দিয়ে পুষ্ট করেছিলাম এই গ্রন্থাগার। তখন কি জানতাম এই গ্রন্থাগারিকতাই হবে আমার পেশা! সেভেনে ফাইনাল পরীক্ষায় বিশ্বজিৎ হলো ফার্স্ট, সিদ্ধার্থ ঘটক সেকেন্ড আর আমি ও সন্দীপ হলাম থার্ড। প্রাইজও পেয়েছিলাম 'আশাপূর্ণা দেবীর হাসির গল্প'। ভাগ্য ভালো আমার গল্পের বই পড়ায় বাড়ীর কেউ বাধ সাধেনি। বিশেষ করে ছোড়দা। বিভিন্ন বিষয়ে ছোড়দাই আমাকে উৎসাহ দিত। ছোড়দাই আমাকে আর ভাইদাকে পয়সা দিয়েছিল শ্রীমা হলে 'হাতি মেরে সাথী' সিনেমা দেখতে। কৃতজ্ঞ ছিলাম ছোড়দার প্রতি। আর একটা ব্যাপারেও ছোড়দার যথেষ্ট প্রশ্রয় ছিল আমার প্রতি। সেই সময়ই আমার নেশা



স্ত্রী সন্তানের সাথে।

হয়েছিল বাড়ী বানানোর। বাবার সিনেমাহলে আসতো কার্বনের বাক্স। তাই দিয়েই হতো আমার স্থাপত্য। বিভিন্ন ডিজাইনের বাড়ী বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতাম সবাইকে। এমনকি ঢেকি, কুয়োওয়ালা গ্রামের বাড়ীও। বাড়ীর সবার উৎসাহ না পেলে আমার এই অনর্থক কাজ গুবলেট হয়ে যেত।



পরিচালকের ভূমিকায় ছবি তোলার মুহূর্তে।

এই লেখায় কারও নিন্দা করবো না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বনগাঁ হাই স্কুলের দুই জনকে আমি ভুলতে পারি না তাদের দুর্ব্যবহারের জন্য। শিক্ষকের জ্ঞান কম হতে পারে কিন্তু ছাত্র বৎসল হতে বাধা কোথায়? জিতেশবাবু, সংস্কৃতের শিক্ষক। এইটে যখন পড়ি, সংস্কৃতের ক্লাসে আমি খাতা জমা দেওয়ার পর খাতা দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো নাম কি? আমি নাম বলাতে স্যার মুখ ভেংচিয়ে বললো- এঃ, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। তাই আজও সেই কথা মনে আছে। নিশ্চিত ভাবেই আমি বনগাঁ হাই স্কুলের সর্বকালের সংস্কৃতের সেরা ছাত্র। অথচ আমাকেই, যে তার পুত্রসম তাকে এই ভাবে অপমান করেছিল। নেহাতই রসিকতা। তবুও একটা বাচ্চার মনে এটার রেখাপাত অপরিসীম। আরেকজন হলেন সৌরেন বাবু-সৌরেন্দ্র বিলাস ঘোষ। সত্যিই বিলাসী। ক্লাসে এসে আমাদের কাজ দিয়ে দুই পা টেবিলের উপর তুলে দিত। আমাদের সামনে স্যারের চরণ দুটি। ঘৃণা হত আমার। বহু বছর শিক্ষকতার সুবাদে বলতে পারি সন্তানসম ছাত্রদের সামনে দুটি পা তুলে দেওয়া শিক্ষকোচিত তো নয়ই, মনুষ্যোচিতও নয়।



বন্ধুদের সাথে ঘুম স্টেশনে।

এইটে পড়তে পড়তে বীনাপানি টিউটোরিয়ালে অভিনয় করলাম ‘মুক্তির উপায়’ নাটকে। দোলা, শ্বেতাদি, স্বপ্না, মিতালী ছিল



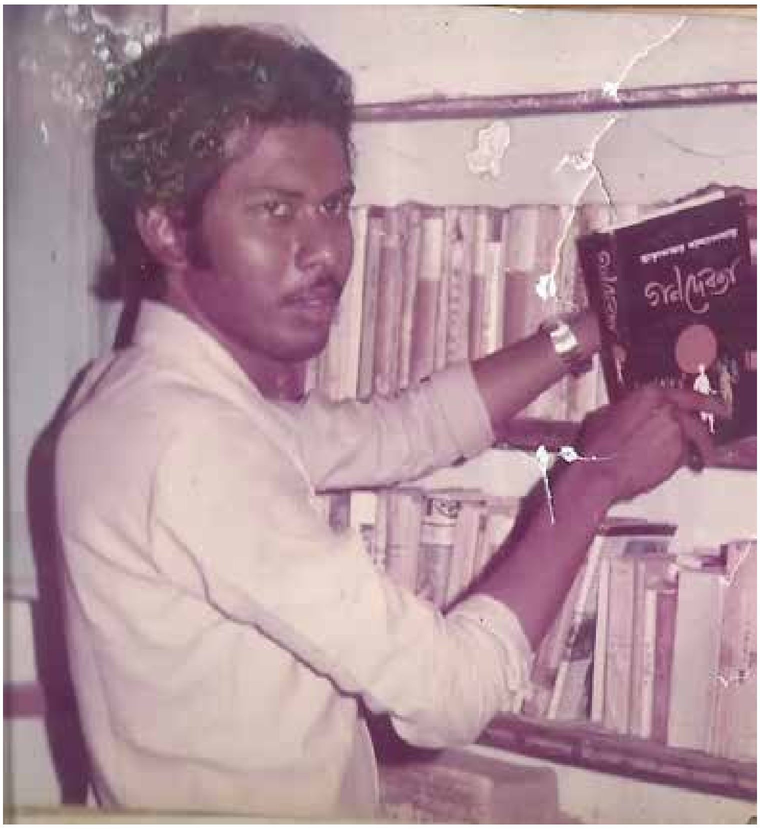
কিশোরে বয়সে বন্ধুদের সাথে।

আমাদের নাটকে। ঐ ক্লাসেই পেয়েছিলাম পিতৃতুল্য শিক্ষক নির্মল মুখার্জী যিনি 'ইতিহাসের বনগ্রাম' বই এর লেখক, দেবকীদার সরস ইতিহাস পড়ানো। ভূগোল আমার কোনদিনই ভালো লাগে না। Geography আর Geometry এই দুই Geo আমাকে কোন দিন জিওতে দেয়নি। ক্লাস X এ Half-yearly -র পর অংক ক্লাস। নির্মল সাধু স্যার জ্যামিতি করতে দিয়েছেন। আমি তো আটক। স্যার জিজ্ঞাসা করলেন Half-yearly তে অংকে কত পেয়েছিলি? আমার ঝটিতি উত্তর ৬০। স্যার জিজ্ঞাসা করলেন কি ভাবে পেলি? আমার উত্তর, জ্যামিতির ৪০ বাদ দিয়ে বাকী ৬০ মার্কের উত্তর করে ছিলাম। স্যার একটু থতমত। বাস্তবিকই পাটিগণিতে আমিই ছিলাম সেরা। চিনি দাদার মিষ্টি করে অংক শেখানোতে আমিও স্বাদ পুরোপুরি নিয়েছিলাম। VII-এ চিনি দাদা যে ইংরাজী Tense শিখিয়েছিল, তারও কোন জবাব নেই। আজও যে ইংরাজী লিখি তা ঐ চিনিদাদার কাছে ইংরাজী শেখার দৌলতেই।

বীণাপানি টিউটোরিয়াল আমার জীবনে অনেক কিছু। শিক্ষকদের অকুণ্ঠ স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি ওখানে। দীপকদা, নিখিলদা, চন্ডীদা, সুকুমারদা, গৌরদা, দিলীপদা (মন্ডল), আশিসদা সর্বোপরি অনিলদার ভালোবাসায় আমি চির কৃতার্থ। বন্ধু ভাগ্যও ছিল আমার যারপরনাই ভালো। হারান, প্রদীপ, শ্যামল অজয়, সুমিতা, উমা, মালতী, মিতু এদের বন্ধুত্ব আমার সেইসব দিনগুলো রঙিন করে দিয়েছিল। বীণাপানিতেই আমার কবিতা আবৃত্তি, নাটক করা, প্রবন্ধ লেখার উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল। চন্ডীদার কাছে সংস্কৃত পড়া তো একটা অভিজ্ঞতা। ঘণ্টার পর ঘন্টা আমি আর চন্ডীদা সংস্কৃত নিয়ে আলোচনা করতাম। তারই ফলশ্রুতি ক্লাস X এ যখন



দিঘায় স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।



কিশোরে বয়েসে বই গোছানোর মুহূর্তে।

পড়ি তখন আমি বাংলা 'সাগর সঙ্গমে নবকুমার' সংস্কৃত অনুবাদ করি। চন্ডীদা আজ আর নেই। মাত্র ৪২ বছর বয়সে শান্ত, ধীর, নম্র চন্ডীদা মারা যান। IX এ যখন পড়ি বীণাপানিতে অভিনয় করি 'পরিত্রাণ' নাটকে। আমার স্ত্রীর চরিত্রে ছিল স্বপ্না। অনিল কাপুর আর শ্রীদেবী যাকে বলে।

ক্লাস X এ একদিকে বীণাপানি টিউটোরিয়াল আর একদিকে বনগাঁ হাই স্কুল। বাঘা বাঘা সব শিক্ষকদের কাছে পড়া। পড়তে না চাইলেও পড়ার মজায় পড়তাম তখন। বিশ্বরঞ্জন বাবু, গোপাল সাধু, দেববাবু, কাঞ্জিলাল বাবু আবার টিউটোরিয়ালে দীপকদা, দীপঙ্করদা, চন্ডীদা, গৌরদা, ছোড়দা, অনিলদা পড়ানোর সময় যেন আলো বিচ্ছুরিত হতো। এ বছরই হাই স্কুলে 'দুই বিঘা জমি' নাটকে উপেনের চরিত্রে অভিনয় করলাম। হাত বদল হতে হতে শেষে আমার ভাগ্যেই জুটলো চরিত্রটা। চুটিয়ে অভিনয় করলাম। ৭৫ সালে ১৪ই ডিসেম্বর দাদার বিয়ে হলো। ১৬ই ডিসেম্বর বৌভাত। এদিকে আমার তো শিরে সংক্রান্তি। ঐ দিনই আমার মাধ্যমিকের টেস্ট শুরু। লোকজনে ভর্তি বাড়ী থেকে পরীক্ষা দিতে গেলাম। এটি আমার প্রতি অবহেলা ছিল নাকি বাড়ীর লোকের অশিক্ষা, এ ধন্দ আমার এখনও আছে। আজকাল যখন দেখি মাসতুতো - পিসতুতো ভাই বোনেদের পরীক্ষার তারিখ খেয়াল করে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়, তখন বুঝি এ অবহেলা আমার প্রাপ্য ছিল না।

মাধ্যমিক। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থায় একযুগের শুরু হলো। এর আগে ছিল IX-X-XI নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক। ছেলে মেয়েরা IX থেকেই বিভিন্ন Stream এ ভর্তি হতে পারতো। আমাদের বছর থেকেই শুরু



বেহালার ফ্ল্যাটে স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।

হলো সার্বজনীন মাধ্যমিক। আমাদের না ছিল অতীত, না ছিল বর্তমান। স্রেফ চোখ বন্ধ করে অন্ধকার রাস্তায় ছুটে যাওয়া। পর্যাপ্ত বই নেই, সাজেশান নেই। একেবারে সূচীপত্র থেকে অনুশীলনী পর্যন্ত পড়ে যাওয়া। এমনকি ১৫ টাকার Test Paper ও কেনার ক্ষমতা ছিলনা আমার। বন্ধু সমিতরঞ্জন দাসের সঙ্গে শেয়ার করে বই কেনা হয়েছিল। দু'ভাগ করে Test Paper Solve করা। সমিত, হিমক আর আমি ছিলাম 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স'। সমিত ভালো ছেলে আর হিমক ছিল ডাকাবুকো। অথচ কি অবলীলায় আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল।



দিঘায় স্ত্রী সঞ্চিতা ও এক ছাত্রের সাথে।

VII-VIII-IX এই তিন ক্লাসেই NCC করতাম। পারতাম না কিছুই। বেঢপ ভাবেই প্যারেড করতাম। আমাদের ক্যাপ্টেন ছিল সুকুমার সাউ। বন্ধুর ভাই বলে কিছুটা ফেভার পেতাম। নতুবা NCC তে আমার Marking ছিল প্রায় Zero। যা হোক, VII-এর দুর্গা পূজার ঠিক আগে NCC করে পেয়েছিলাম সাড়ে এগারো টাকা ট্রুপ কম্যান্ডার বরুন বাবুর হাত থেকে। সেই বয়সে আর সেই সময়ে সাড়ে এগারো টাকা পেয়ে আমি তো হারুন-অল-রসিদ। সম্ভবত প্রথম আয় দিয়ে জুতোর ব্রাশ কিনে ছিলাম বাটা থেকে।

ক্লাস X এ যখন পড়ি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল আমার। আজও তা নিয়ে আমার একটু শ্লাঘা আছে। সদ্য শেক্সপিয়ার রচনাবলী বাংলাতে পড়েছি। ওথেলো নাটকে



বরানগরে ছেলের বিয়েতে ছেলে, পুত্রবধূ ও স্ত্রীয়ের সাথে।

ওথেলো ডেসডিমোনাকে নিয়ে পালিয়েছে। ডেসডিমোনার বাবা ব্রাবানসিও ডিউককে নালিশ করতে গিয়েছেন। ডিউক তখন আসন্ন তুর্কি আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করছেন। ব্রাবানসিওকে বললেন, "এ ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিন"। ব্রাবানসিও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন- তাহলে আপনিও তুর্কি আক্রমণকে হেসে উড়িয়ে দিন। এই উক্তিটায় আমি খুব মজা পেয়েছিলাম।



কর্মস্থল শ্রমিক পাঠাগারে শিক্ষক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষের সাথে।

গিয়ে বললাম আমার পথ প্রদর্শক বিনুদার কাছে। বিনুদা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে পেঙ্গুইন এর Complete Shakespeare টা দিয়ে বললো "এখান থেকে যদি ঐ Dialogue টা বের করতে পারিস তবে আমি তোকে একটা রসগোল্লা খাওয়াব" and I did it। বিনুদার দেওয়া রসগোল্লাটা আজ পর্যন্ত আমার শ্রেষ্ঠ প্রাইজ। কত কি যে মনে পড়ে স্কুল জীবনের কথা।



হাস্যমুখে পারিবারিক আড্ডায়।

বনগাঁর বিভিন্ন জায়গায় কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় গিয়ে প্রাইজ পাওয়া, Model Competition এ অংশ নেওয়া, work education এর বিভিন্ন Model নিজ হাতে করা আমার সৃজনী সত্তাকে উস্কে দিতো। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায়, নাটকে, আবৃত্তিতে মন ভরে থাকতো। এই বেলা আমার স্কুলের বন্ধুদের কথা কিছু বলি। প্রথমেই বলি বিশ্বজিৎ এর কথা। আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো বিশ্বজিৎ। কি পড়াশুনায়, কি debate এ, কি আবৃত্তিতে, কি অভিনয়ে ও ছিল চ্যাম্পিয়ান। ঐ বয়সেই বিশ্ব সাহিত্য, সিনেমার জ্ঞান ছিল টনটনে। ও এখন বনগাঁর S.L.R.O. অলোক দাস ছিল 1st Boy। টিপিকাল ভালো ছেলে। ও এখন ডাক্তার। সমিত রঞ্জন দাস ছিল মিতবাক অথচ সাহিত্য রসে টইটম্বুর। সন্দীপ শেঠ ছিল ভালো ছেলে অথচ নষ্টামিতে নায়ক। পরে ragging করে কাগজে নাম পর্যন্ত তুলে ফেলেছিল। শ্যামাপ্রসাদ ছিল পড়াশুনাতেও ভালো আবার দুরন্ত ফুটবলার। অশোক রাহা-তারা মিত্রর ভাগ্নে। ইংরাজীতে ওর মতো পারদর্শী ছেলে খুব কম দেখা যায়। ভালো মানুষ অশোক কে নিয়ে খুব মজা করতাম আমরা। জ্যোতিপ্রসাদ দত্ত। বাবা বিখ্যাত উকিল রবি দত্ত। জীবনেও স্কুল করতো



বৈঠকখানায় নিজের তৈরী সত্যজিৎ কোলাজের সামনে।

না। বাড়ীতেই পড়াশুনা করতো। দেখা হতো শুধু পরীক্ষার সময়। অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করতো। ওর কাছেই প্রথম শুনি Pen-Friend শব্দটা। দেশ বিদেশে বিভিন্ন বন্ধু ছিল ওর। সে সব চিঠি দেখাতো আমাকে ওর নিজস্ব ঘরে বসে। আমার অগ্রজ বন্ধু ছিল হিমক কর আর টোটন, রঘু। দুষ্টুমিতে 1st, 2nd, 3rd। হিমক এখন পুলিশে চাকরী করে। রঘু- টোটন কোথায় কি করে জানি না।

৭৬ সালে ২৩শে এপ্রিল মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হলো। পরীক্ষাটাও ছিল আমাদের আরেকটা মজার খেলা। শেষ হলো ৪ঠা মে। রেজাল্ট বেরোলো ৪ঠা সেপ্টেম্বর। আমি 2nd division এ পাশ। পেয়েছিলায় ৫৪%। সে যুগে সেটাই বিরাট মার্কস।

বনগাঁ কলেজ। ভর্তি হলাম XI-এ। Arts নিয়ে। সহপাঠী ছিল সুবল, অমিত, অশোক রাহা, সুমিতা, মালতী, মিতু, অপর্না। এখানেই পেলাম দুই মহারথী শিক্ষককে। জ্যোতির্ময় ঘোষ আর মনি মন্ডল কে এবং অধ্যক্ষ সুবোধ ঘোষাল। অসাধারন এদের পড়ানো। ইংরাজী আর দর্শন ক্লাসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতাম। পড়তাম বীণাপানি টিউটোরিয়ালে। আমরাও অপটু, শিক্ষকরাও অপটু কারন একদম নতুন সিলেবাস, নতুন question pattern। আমরা সবাই হাবুডুবু।



নিমন্ত্রণ বাড়িতে জনৈক আত্মীয়ার পাশে।

এর মধ্যেই আমার আকাশ আরেকটু বড়ো হয়ে গেল। ছোড়দা, নিখিলদা-দের সঙ্গে কোলকাতায় স্টার হলে দেখলাম 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটক। তার পর পরই দেখলাম বনগাঁয় পেশাদারী নাটক। এক টাকা টিকিট কেটে দেখলাম 'শেক্সপিয়ার, দ্য সেকেন্ড'। পরিচালক মহিদুল ইসলাম। যে লোকটি প্রধান চরিত্র স্যামুয়েলের পার্ট করে ছিল, অবাক বিস্ময়ে তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরে বীণাপানিতে সেই লোকটিই এসেছিল Physics পড়াতে। এখন অবশ্য দিলীপদা আমার প্রিয় দাদা বন্ধু।



অপুর সংসারের সদস্যবৃন্দ, বন্ধু ও ছাত্রদের সাথে।

XI এর পরীক্ষায় 3rd হলাম কারন সুমিতা, পদ্মশ্রী আর আমি ছাড়া কেউই সব subject এ পাশ করেনি। সেই সঙ্গে চলছে আমার সিনেমা দেখা। অসম্ভব সিনেমা দেখতাম আমি আর শ্যামল। হিন্দিতে ধর্মেন্দ্র আর হেমা ছিল আমার প্রিয় জুটি। ঐ জুটির প্রায় সব সিনেমাই আমার দেখা। ঐ জুটির সম্ভবত সেরা সিনেমা কামাল আমরোহির 'রাজিয়া সুলতানা'। সিনেমার মিউজিক এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করে। বাংলায় সৌমিত্র-এর সিনেমা সাধারন ভাবে ছাড়তাম না। অপূর্ব লেগেছিল-দত্তা, জব চার্ণকের বিবি, অগ্রদানী, কোনি, অমরগীতি-কত নাম বলবো?



শৈশবের প্রথম ছবি।

৭৭ সাল। ভারতীয় ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য বছর। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে চলা কংগ্রেস রাজত্বের অবসান হলো। নেহরু, শাস্ত্রী থেকে ইন্দিরা গান্ধী। ৭৫ সালের ২৬শে জুন ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল বোধ হয় দেশের ভালোই হবে। পরে বোঝা গেল এক নায়কতন্ত্রের চরম অবস্থা হলো এই জরুরী অবস্থা। তেমন কিছু বোঝার বয়স

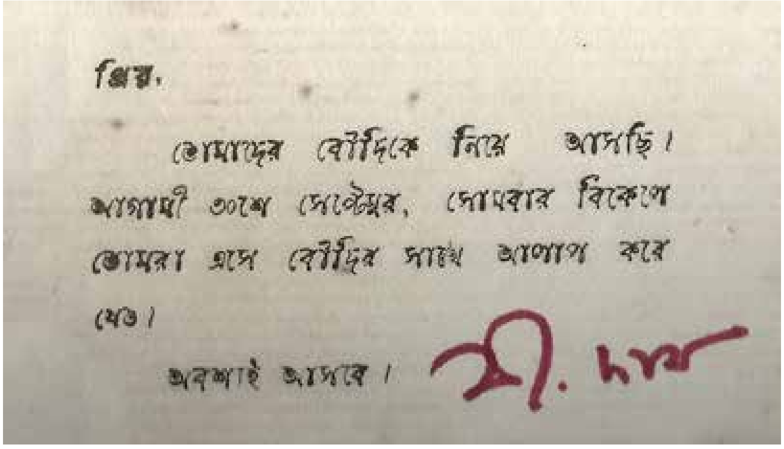
না হলেও বুঝলাম সরকার বিরোধী কোন কথা প্রকাশ্যে বলা যাবে না। মিশা আইনের অপপ্রয়োগে বিরোধী নেতারা জেল বন্দী হলেন। এমনকি সেজ মামাও পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালো। তার পর ইন্দিরা গান্ধী অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে নির্বাচন ডেকে দিলেন। নির্বাচনে ভরাডুবি হলো কংগ্রেসের। আমিও জীবনে প্রথম রাজনীতির স্বাদ পেলাম। আমার বাবা চিরকালই ছিল কংগ্রেস সমর্থক। মা অবশ্য বামপন্থী বাড়ীর মেয়ে। সম্ভবত মায়ের প্রভাবেই আমিও, শুধু আমি কেন, আমরা সব ভাইরাই অল্প বিস্তর বামপন্থী চিন্তা ধারার পথিক। আসলো জনতা সরকার। জনতা মানে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস, জনসংঘ, বামপন্থী দল গুলোর এক খিচুড়ি সরকার। অবশ্য বামপন্থীরা সরকারে যায়নি। আমার নিজে মনে হয়েছে বামপন্থীদের পর্যাপ্ত সদস্য না থাকলে সরকারে যাওয়াও উচিত না। পরবর্তী কালে জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রীত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তাতে আখেরে কোন লাভ হতো না। প্রকৃত পক্ষে বামপন্থা একটি আন্দোলন। সরকারে যাওয়ার কোন শর্টকাট রাস্তা নয়। আজীবন এই ধারনাই হয়েছে আমার। মোরারজি দেশাই হলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও সেবার পালা বদল। জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। অনেক আশা নিয়ে বামপন্থীরা সরকার গড়লো। তখন বুঝিনি বামপন্থী হোক আর যেই হোক সরকারে গেলে বেনো জল ঢুকবেই। আর সে সব ঢুকলে বামপন্থার পদস্খলন ঘটবেই। হলোও তাই। তবু তার মধ্যেই বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো মানুষের কাজে লাগলো। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রি, সাধারন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপরি বর্গা আইন একটি যুগের সূচনা করলো। যদিও বড় লোকরা এতে যারপরনাই বিরক্ত হলো বামফ্রন্ট সরকারের উপর।



দিঘায় স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।



বনগাঁর বিভূতিভূষণ ঘাটে পিকনিকে।



প্রিয়,

তোমাদের বৌদিকে নিয়ে আসছি। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, সোমবার বিকেলে তোমরা এসে বৌদির সাথে আলাপ করে যেও।

অবশ্যই আসবে।

ছাত্রদের জন্য নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র।

সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। টেস্টের রেজাল্ট খুব মজার হয়েছিল। আমি একাই সব সাবজেক্টে পাশ। স্বভাবতই আমি first। Form fill up করেছি। বেতন কিছুটা মকুব করার জন্য আবেদন করেছি। মিটিং এর পর দিন কলেজ গেছি। SFI এর ছেলেরা বললো তোমার ফ্রি হয়নি। ছাত্র পরিষদের ছেলেরা বারণ করেছে। কারন তোমার বাবা, দাদারা চাকরী করেন। আমার তো মাথায় হাত। টিউশনি করে পড়ার খরচ, জামা কাপড়, হাত খরচ চালাই। বেতন মকুব না হলে অসুবিধায় পড়ে যাব। গেলাম তখন প্রিন্সিপালের ঘরে। ঘর ভর্তি ছাত্র পরিষদের ছেলেরা। আমি স্যারকে কিছু বলতেই স্যার বলে উঠলেন আরে তোমার তো ফ্রি হবেই, তুমি তো ভালো ছেলে। আমার তখন লঙ্কাজয়ী রামের অবস্থা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি কে কে শুনলো কথাটা। উল্লেখযোগ্য দিন ছিল সেটা। আমায় খুব আনন্দ দিয়েছিল ঘটনাটা।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলাম। অদ্ভুত একটা পরীক্ষা। আগে পিছে কিছুই জানি না। শুধু বইটা মুখস্থ ছিল। আমার একটা আলাদা পদ্ধতি ছিল পড়ার। কলেজে যাতায়াতের পথে পড়াটা যথাসম্ভব চর্বন করতাম। রাস্তাঘাটও ছিল ফাঁকা। সুতরাং স্যারদের পড়ানোটা গলাধঃকরন করাটা খুব অসুবিধার হয়নি। পরীক্ষার সময় শুধু মনে মনে বই এর পৃষ্ঠাটা উল্টে যেতাম। এমনকি গার্ডরাও আমার পরীক্ষার attitude-এ যুগ্ধ হয়েছিল। তবু তার মধ্যেই



বনগাঁয় ছেলের বৌভাতে স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।



শুটিংয়ে পরিচালকের ভূমিকায়।

একদিন ইংরাজী পরীক্ষার দিন বন্ধু তরুন মন্ডলকে সাহায্য করতে গিয়ে সমীর চন্দ স্যারের কাছে হেনস্তা হয়েছিলাম। হায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে ধার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল-'পরোপকার কি সব সময়ই ভালো নয়?'।

H.S. এর পরেই একটা কাজে হাত দিলাম। ডিকেন্সের A Tale of Two Cities এর নাট্যরূপ দিলাম। পরিচালনা করে নাটকটা মঞ্চস্থ করলাম ২০শে আগষ্ট আমাদের বাড়ীর সামনে লনে। আমি করেছিলাম ডঃ ম্যানেটের পার্ট। সঙ্গে ছিল শ্যামল, বাবুল, শংঙ্কর চক্রবর্তী, গোপাল এবং সুষমা। চমৎকার makeup-এ just ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। দর্শক আসনে ছিল উমা। স্পষ্ট শুনেছিল পেছন থেকে কে যেন বলেছে - বুড়ো ঠিক বুড়োর পার্টই নিয়েছে। সত্যি অকাল বৃদ্ধ হয়তো আমি! নতুবা যে বয়সে আমার বন্ধুরা বাবার সঙ্গে গিয়ে দোকানে পুজোর বাজার করে, সেই সময় সারা দিন রাত টিউশনি করে তা দিয়ে সেকেন্ড-হ্যান্ড প্যান্ট কিনে পুজোর সময় পরি? বাবা আমার বড্ড গরীব ছিল তো। উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোল ৪ঠা সেপ্টেম্বর। ৫৪.১% মার্কস পেয়েছিলাম আমি। এখনকার হিসাবে হয়তো খুবই কম মার্কস। কিন্তু তাতেই আমি বনগাঁ মহকুমায় Arts এ সর্বোচ্চ মার্কস পেয়েছিলাম। ১৭ই সেপ্টেম্বর নিজের খরচে শিক্ষকদের, হারান আর সুমিতা কে বাড়ীতে খাওয়ালাম। অসাধারন ভালো ছেলে হারান Joint-এ 1st হয়েছিল।



চিন্তামগ্ন যুবক দীপ্তরূপ।

ভর্তি হলাম বারাসত গভর্ণমেন্ট কলেজে। কলেজের সেরা ছেলে আমি। সেই অহংকারেই বোধ হয় পড়াশুনায় ঢিলে হয়ে গেল। তাছাড়া ট্রেনে ২ ঘন্টা-২ ঘণ্টা নষ্ট হওয়াতে পড়ার সময় গেল কমে। তারপর টিউশনিতে অনেক সময় খরচ হতে লাগলো। সর্বোপরি প্রেমে



কিশোর বয়েসে বন্ধুদের সাথে। (ডানদিক থেকে তৃতীয়)

পড়লাম। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি লোকে প্রেমে 'পড়ে' আর রাজনীতিতে 'নামে'। আমি এমন কাউকে দেখিনি যে প্রেমে 'ওঠে'। সঞ্চিতা, আমার স্ত্রী তখন ছিল আমার ক্লাসমেট। বাবুল, সৌরেন, রত্না, পার্থ, রাজশেখর তখন যেন আকাশে উড়ছি। বাবুন সৌরেন যেমন তখন থেকেই চাকরীর চেষ্টা করছে, আমি, জন্ম-হাবা, তখন ভাবছি আগে তো Graduate হই, তারপরে দেখা যাবে।

৭৮ সালে আবার বন্যা। বামফ্রন্ট আসবার পরে পরেই এই বন্যা সরকারকে খানিকটা পিছিয়েই দিল। সারা বনগাঁ ডুবু ডুবু। তার মধ্যেই আমাদের বারাসাত যাওয়া আসা, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা। কলেজে পড়তেই বহু থিয়েটার দেখেছিলাম- কলরব, সম্রাট ও সুন্দরী, কালবৈশাখী, অঘটন, সুবর্ণলতা, দাঁড়াও পথিকবর, নহবৎ, নামজীবন। তখন হাতিবাগান এলাকায় ছিল নাটকের আড়ৎ। কত কত হল- প্রতাপমঞ্চ, সারকারিনা, স্টার, রঙ্গনা, রংমহল, বিশ্বরূপা, ক্লেম ব্রাউন মঞ্চ, নেতাজী মঞ্চ, দক্ষিণে ছিল তপন থিয়েটার। কোলকাতার প্রায় সব হলেই নাটক দেখেছি আমি। এখন খারাপই লাগে যখন বাণিজ্যিক থিয়েটার বলেই আর কিছু নেই। কিছু গ্রুপ থিয়েটার থোড়বড়ি খাড়া-খাড়াবড়ি থোড় নাটক করে যাচ্ছে। নিজেরাই পিঠ চাপড়াচ্ছে আর বঙ্গভূষণ,



ছেলের সঙ্গে।



বন্ধুদের সঙ্গে তাসের আড্ডায়।

বঙ্গবিভূষণ পুরষ্কারে পুরস্কৃত হচ্ছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এক পিগমি যুগে বাস করছি। যে সময় আমি সদ্য যুবা, ভাবলে অবাক লাগে কাদের সঙ্গে এক ভারতের মাটিতে ছিলাম। ক্রিকেটে সানি গাভাস্কার, কপিল দেব, বিশ্বনাথ। গানে লতাজি আশাজি, মুকেশ, রফি, কিশোর, হেমন্ত, মান্না, শ্যামল মিত্র। সিনেমা পরিচালনায় সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তরুন মজুমদার, তপন সিংহ। ওদিকে রাজ কাপুর, হৃষিকেশ মুখার্জী, গুলজার। অভিনয়ে উত্তম কুমার, সৌমিত্র, উৎপল দত্ত, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু -জহর, রবি ঘোষ। সুর মূর্ছনায় রবিশংকর, আল্লারাখা, জাকির হোসেন, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, শিবকুমার শর্মা, বিসমিল্লা খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ। চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন, সুনীল দাস, গণেশ পাইন, পরিতোষ সেন আমাদের অহঙ্কার। সঙ্গীতের মুর্ছনায় মন ভরিয়ে দিতেন S.D., R.D., L.P., খৈয়াম, শিব-হরি। আজ যখন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর ব্যবস্থা চারিদিকে তখন এদের স্মৃতি নষ্টালজিক করে তোলে মনকে। আমাদের সময়ই সবচেয়ে ভালো এরকম কথা না ভাবলেও এখনকার শিল্পীদের সৃষ্টি দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। লিলিপুটদের দেশে brobdingnagian গল্প বলাই বৃথা। যাঁদের নাম বলতে ভুলে গেলাম নাটকের তিন মহীরুহ উৎপল দত্ত- অজিতেশ - শম্ভু মিত্র। ফুটবলে পি.কে.-চুনী-বলরাম।
রবীন্দ্র সঙ্গীতে জর্জ বিশ্বাস-সুচিত্রা মিত্র-সুমিত্রা সেন। নজরুল গীতিতে ফিরোজা বেগম-মানবেন্দ্র-অনুপ ঘোষাল। সাহিত্যে সুনীল-শক্তি- তারাপদ রায় - দুই সমরেশ-শংকর এবং নারায়ণ সান্যাল। হিন্দিতে নাসির-ওম পুরি-শাবানা- স্মিতা।

৭৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর চিনি দাদার সঙ্গে শুভনদির, আমাদেরই প্রতিবেশী, লেখক, স্থিতপ্রজ্ঞ অনিল চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে



কর্মক্ষেত্র চারঘাট যোগেশ পাঠাগারে।

হলো। বাড়ীতে খুশির আমেজ বয়ে আনলো এই বিয়ে। অবশ্য দাদা বৌদি স্থান অকুলানের জন্য চলে গেল বালিগঞ্জে বৌদির বাপের বাড়ীতে। আসলে বৌদির কোন ভাই নেই। তাই বৌদির বাবাই প্রস্তাব দিলেন দাদাকে ওদের বাড়ী আর দুই বুড়ো বুড়িকে সামলানোর জন্য। দাদা বৌদি ওখানে থাকলেও ছোট্ট তুপুলকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহেই চলে আসতো বনগাঁর বাড়ীতে। সেদিন যেন বাড়ীতে খুশির জোয়ার।



মন্দারমনিতে স্ত্রীয়ের সাথে।

৮০র জানুয়ারীতে সবাই মিলে চললাম পুরী বেড়াতে। সেই আমার প্রথম নিজের খরচে বাইরে যাওয়া। অবশ্য তার আগে বীনাপানি টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থাপনায় গেছি তারাপীঠ-বক্রেশ্বর-শান্তিনিকেতন। নিজের খরচে বেড়াতে যাওয়ার যে সুখ তা অনির্বচনীয়। সেই সব বেড়াতে গিয়ে সাদা কালো ফিল্মের ছোট ছোট ছবি এখনও আমার অ্যালবামে শোভা পাচ্ছে। সামনেই বি.এ. পরীক্ষা। ৮০র ১লা জানুয়ারী পিকনিক করলাম কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে পি.জি.-র বাগান বাড়ীতে।



সপরিবারে পেয়াদাপাড়ার ভাড়া বাড়িতে।

৮২ সাল। ১৫ই মার্চ বি.এ. পাশ এর মার্কশিট নিয়ে xerox করে জমা দিলাম হাবড়া গান্ধী সেন্টিনারী বি.এড. কলেজে। সেই প্রথম দেখলাম xerox মেশিন। বারাসাতের এই দিকে কোথাও সেই মেশিন ছিল না। বহু পরে বনগাঁয় রাঘব মন্ডলরা প্রথম বনগাঁয় xerox মেশিন আনলো। সেটাও ছিল manual। যাহোক ভর্তি হলাম বি.এড.-এ। সত্যি কথা কি হাবড়া বি.এড. কলেজই আমার জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর আগেও পড়াতাম আমি। কিন্তু পড়ানোটাও যে একটা শিল্প, নিয়ম শৃঙ্খলা যে কি জিনিস প্রথম জানলাম হাবড়ায় গিয়ে। এখানেই পেলাম হিমালয় সদৃশ শিক্ষক কালিদাস চক্রবর্তী, হেমবাবু এবং সর্বোপরি আমার পিতৃপ্রতিম শিক্ষক পরিমল মুখার্জীকে। মৃত্যু পর্যন্ত ওনার সঙ্গে আমার এবং বন্ধুবর বংশীবদন কর্মকারের ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধন। কত

কিছু শিখেছি পরিমলবাবুর কাছ থেকে। কালিদাসবাবুর ক্লাসে উদ্দাম নাটক, হেমবাবুর স্মিত হাসির সঙ্গে ছোট ছোট রসিকতা ক্লাসকে করে তুলতো মজাদার।



কর্মক্ষেত্র ঘোজাডাঙ্গা সাধারণ পাঠাগারে।

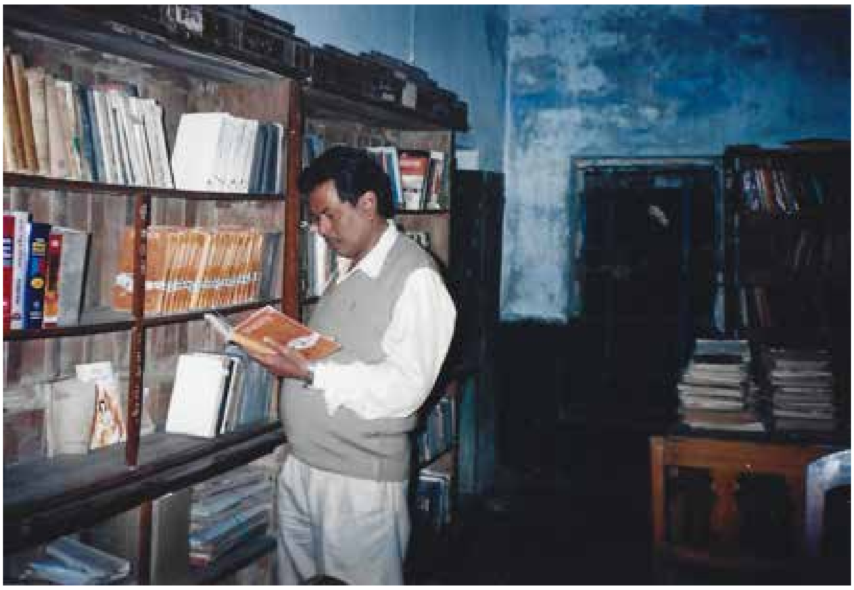
এখানেই বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলাম বিনয়দা, সব্যসাচীদাকে। সব্যসাচীদার মতো রসিক বন্ধু খুব কম পেয়েছি। নিজে একটুও না হেসে রসিকতা করে যাচ্ছে ক্লাসে আর আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ছি। হাবড়া কলেজের পঙক্তি ভোজন, না লাভ না লোকসানে নিজেদের রান্নাঘর, অসংখ্য অনুষ্ঠান পড়াশুনায় আলাদা মাত্রা এনে দিত। কলেজের সঙ্গেই গিয়েছিলাম দীঘা বেড়াতে। গৌরীদি, গোপাদি, সুমনা এদের বন্ধুত্বের ছায়ায় থাকতে থাকতেই বি.এড. পাশ করে গেলাম। এরই মধ্যে ৮২র ১৮ই নভেম্বর ছোড়দার সাথে বিয়ে হলো আমার ছোট বেলার বন্ধু স্বপ্নার সঙ্গে। ছোড়দাও ছিল আমার বি.এড. এর ব্যাচমেট। ছোড়দা পড়তো গোবরডাঙ্গা বি.এড. কলেজে।



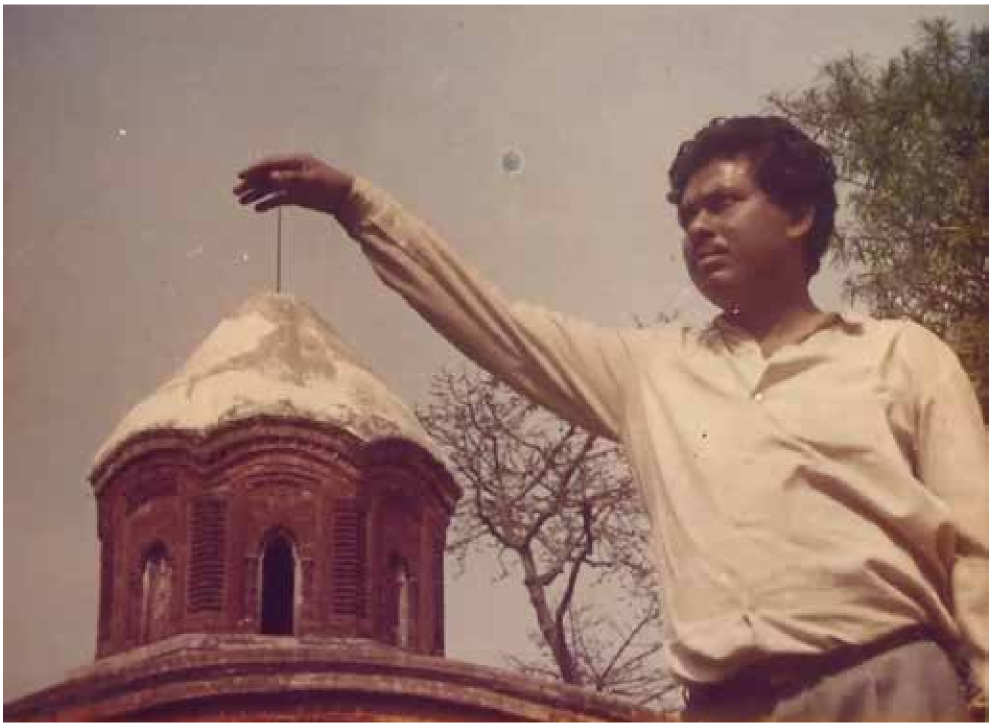
নিজের বাড়ির ছাদে এক অনুষ্ঠানে।

বি.এ., বি.এড. পাশ করবার পর তখন আমি দিশে হারা। বিভিন্ন চাকরীর পরীক্ষা দিচ্ছি কিন্তু কিছুই বাধছে না। বন্ধু-বান্ধব সবাই চাকরী পেয়ে গেছে। শ্যামল রেলে, বাবুল এয়ারপোর্টে, সৌরেন P & T তে। আমি আর অসীম বোস শুধু পড়ে আছি। প্রদীপ ভট্টাচার্য্য D.V.C. তে ইঞ্জিনিয়ার। এমনকি একবার P.S.C. Clerk-ship-এ empanelled হলাম। রোলটাও মনে আছে আমার-28858। আমার serial ছিল 780। আশায় আশায় দিন গুনছি। ৭৫৬ জন নেওয়া হয়ে গেছে। রত্নার দাদা শ্যামলদা খবর দিল আমার সম্ভবত রাইটার্স বিল্ডিং এ পোস্টিং দেবে। আমি তো আকাশে উড়ছি। এমন এক সময় দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন পরের বছরের panel বেড়োলো। স্বভাবতই আমাদের panel cancelled। খুবই মুষড়ে পড়েছি আমি। আত্মীয় স্বজন গুরুজন সবার কাছ থেকে নিরুৎসাহিত হয়ে আমি হতাশ। এ সময় সঞ্চিতার একটা

কবিতা আমাকে সাহস দিত। 'ওরা পারে'। হাতদুটো আর মাথাটা যখন রয়েছে তখন কিছু একটা হবেই। S.S.C. পূর্ব যুগে শুধু qualification থাকাটা যথেষ্ট ছিল না। সেই সময় দেবদূতের মতো রতন সাধু আমাকে পরামর্শ দেন Library Science পড়বার। ওনার কথামতো Library Science Admission Test দিই। মোট চার বার পরীক্ষা দিই আমি। পদ্মপুকুর Bengal Library Association এ বছরে দু'বার admission test হতো। Summer session এবং winter session। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে দার্জিলিং চলে যাই বেড়াতে। এসে শুনলাম আমার নাকি নাম উঠেছিল। খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, ৯০ জনের মধ্যে আমার নাম ছিল। তার থেকেই interview -র মাধ্যমে ৬০ জনকে নেওয়া হয়েছে। ঐ দিনই আমি বুঝলাম 'ওরা পারে' যেমন, তেমন 'আমিও পারি'। পরের বার বি.এড. পড়তে পড়তেই আবার পরীক্ষা দিলাম। এবারও chance পেলাম। Interview-তে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো আপনি এখন কি করছেন। আমি বললাম- বি.এড. পড়ি। সটান উত্তর পেলায় বি.এড. পড়লে আমরা তাকে নিই না। আপনি শিক্ষকতাই করবেন। শুধু শুধু আমাদের একটা সিট আটকাবেন কেন? হায়রে, আমার তো কোন দেশেই সাকিন নেই। ফিরে এলাম। তৃতীয়বার আবার পরীক্ষা দিলাম। এবার লিখিত পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারলাম না। চতুর্থবারে রবার্ট ব্রুস পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে admission নিল। ক্লাস শুরু হলো ১৯৮৩-র ২০শে ডিসেম্বর। খুব আনন্দ করে, Central Library, National Library, CU Library, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চষে বেড়িয়েছি এক বছর। সঙ্গী ছিল তমাল, অরুন, মালবিকা, শম্পা এরা। শনি, রবিবার ক্লাস করে বাড়ী ফিরতাম রাত



বনগাঁর কর্মক্ষেত্র টাউন লাইব্রেরিতে।



হুগলির অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে।

এগারোটা বারোটায়। একদিন ঝড় জলের রাত্রে ট্রেন না চলার জন্য আশ্রয় নিলাম বিড়ায় সঞ্চিতাদের বাড়ীতে। পরদিন ভোরে ফিরে এসে আবার টিউশনি। একদিন রাত বারোটায় ফিরে সাইকেল না পেয়ে শীতের রাত্রে একা একা বাড়ী ফিরে আসা। অসম্ভব কষ্ট করেছি ঐসময়। টিউশনি, Library Science



বনগাঁর বাড়িতে দাদা প্রদ্যুতের সঙ্গে।

এর Class, আবার রবীন্দ্র ভারতীতে রাতে এম.এ. পড়া। কিন্তু পাপ ছাড়েনা বাপেরে। যতই গোপনে দুটি কোর্স করিনা কেন, শেষ পর্যন্ত দুটোরই পরীক্ষা শুরু হলো ৮৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, আমার কালা দিন। বন্ধুদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত Library Science-এর পরীক্ষাই দিলাম। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা হয়েছিল আমাদের। অসাধারন একটা পরীক্ষা দিলাম Library Science-এর। কলেজ জীবন থেকে শুনি বিদেশে পরীক্ষা হয় Library তে বসে। যে যা খুশি বই নিয়ে এসে তা থেকে উত্তর লিখতে পারে। নিজে কোন দিন এই ভাবে পরীক্ষা দিই নি। এবার দিলাম সেই ভাবে পরীক্ষা। পরীক্ষা হলে সবার টেবিলে একটা করে বই। প্রশ্নপত্র আসার পরে ঐ বই থেকেই উত্তর লিখতে হবে। অনেক হেডমাষ্টার মশাইকে বলেছি একবার এই সিস্টেমে পরীক্ষা নিতে। ছেলে মেয়েরা হাতে পায়ে আর টুকলি নিয়ে যাবে না। তারা সবিনয়ে বলেছেন, বলেছেন ভালো, কিন্তু করা যাবে না। আমি হতাশ।



শুটিংয়ে পরিচালকের ভূমিকায়।

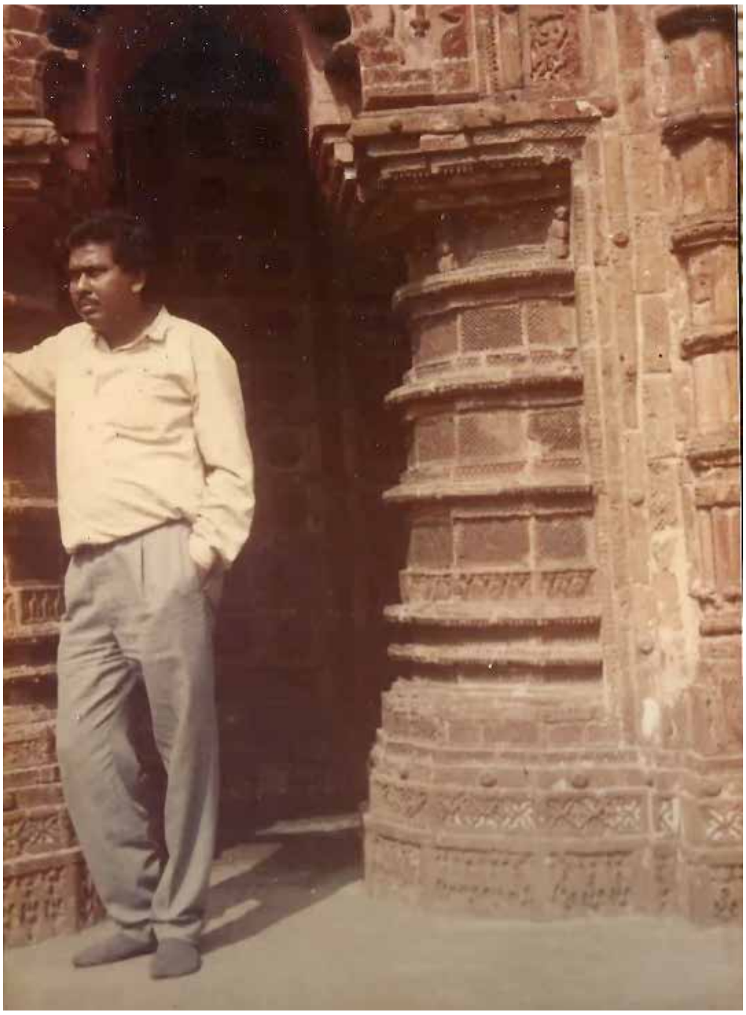
বেহালায় থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। প্রতিদিন যাদবপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ফিরতে হতো। এই সময়ই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় রসিকতাটা শুনি

Library Science এর Bibliography র শিক্ষক সত্যব্রত ঘোষালের কাছ থেকে। সত্যব্রত বাবু আমাকে bibliography করতে দিয়েছিলেন বনগাঁর ছেলে হওয়ার সুবাদে 'দীনবন্ধু মিত্র'। হদ্দ ফাঁকিবাজ আমি সত্যব্রত বাবুকে যাদবপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'স্যার, মোটামুটি লিখলে পাশ মার্কস ৩৫% পাওয়া যাবে?' স্যারের উত্তর- না। হতাশ আমি জিজ্ঞাসা করলাম কত পাওয়া যাবে? স্যার বললেন ৫৫%। এর চেয়ে বড় রসিকতা আমি জীবনে শুনিনি। পেয়েছিলাম ৫৯%।



স্বাসকষ্টের চিকিৎসার জন্য বনগাঁ হসপিটালে।

এই হলো আমার প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র জীবন। এছাড়াও গল্পের বই পড়ে, হাটে, মাঠে, ঘাটে আমার শিক্ষকরা ছড়িয়ে। ভুলতে পারি না সেই চারঘাটের ভ্যানওয়ালাকে যে বলেছিল 'বাবু, আমরা বলি দুনিয়ার মজদুর এক হও, অথচ আমরা ভ্যানওয়ালারা যখন মিছিল করি তখন চাষীরা হ্যা হ্যা করে হাসে। আবার ওরা যখন মিছিল করে তখন আমরা হাসা হাসি করি।' এও তো এক শিক্ষা।



হুগলির অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে।

আমার শিক্ষকরা

প্রয়াত মনি মন্ডলকে একদিন সকৌতুকে বলেছিলাম-'স্যার, আপনার চেয়ে আমি ভালো পড়াই।' তিনি প্রশ্ন করলেন 'কেন রে?' আমারও সপ্রতিভ উত্তর ছিল 'কারণ, আমি অনেক ভালো শিক্ষকের কাছে পড়েছি, যা আপনি পাননি।' বাস্তবিকই আমি গর্বিত আমার শিক্ষকদের জন্য। অসংখ্য ভালো শিক্ষকদের সাহচর্যে এসেছি।

যাঁদের আশীর্ব্বাদ আমার জীবনের রাস্তাকে সুগম করে তুলেছে। সোজা কথায় এঁদের থেকে ধার করেই আমার শিক্ষকতা।


বন্ধুদের সঙ্গে কিশোরে বয়সে (বামদিক থেকে তৃতীয়)।

প্রাইমারীতে ভর্তি হয়েছিলাম মডেল স্কুলে। তখন হেড মাষ্টার মশাই ছিলেন স্বর্গতঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সহঃ শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত শ্রী রতন সাধু। আমি B.Ed. এ শিক্ষকের যে গুণাবলী পড়েছি আশ্চর্য সেই copy book শিক্ষক যেন রতন সাধু। তখন পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেনি কোন recitation centre বা music school৷ অথচ রতনবাবু আমাদের ধরে ধরে শেখাতেন আবৃত্তি। শুধু তাই নয়, স্কুলে নাটক- আবৃত্তি, গানে ছাত্র-ছাত্রীদের রীতিমতো অংশগ্রহণ করিয়ে ছাড়তেন। অসাধারণ সুন্দর হস্তাক্ষরের মালিক রতনবাবু শেষদিন পর্যন্ত পুরানো ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ খবর নিতেন। পুত্র স্নেহে জীবনের অসহায় মুহর্তে আমাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ার উপদেশ দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ সমস্যাকে সহজ করে তুলেছেন। বনগাঁর গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং সাংবাদিকতার পথিকৃৎ, প্রান্তদেশ পত্রিকার সম্পাদক ‘স্যার’ কে আমার হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।


ভাইপোর ছেলে বার্ণিকের সঙ্গে রাজারহাটের ফ্ল্যাটে। পেছনে শাশুড়ি মঞ্জু দেবনাথ।

ক্লাস V থেকে X পর্যন্ত পড়েছিলাম বনগাঁ হাই স্কুলে। অসংখ্য ভাল শিক্ষকদের মধ্যে মনকাড়া শিক্ষক ছিলেন শ্রী সুনীল ঘোষ। যিনি এখন Economies এর অধ্যাপক। ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী অমরেন্দ্র কান্তি দাশশর্মা ও শ্রী জগদীশ চন্দ্র ইন্দ্র মহাশয়, যাঁরা তাঁদের অসাধারণ শৃঙ্খলার



বনগাঁয় ছেলের বৌভাতে।

মধ্য দিয়ে ঐ স্কুলকে নিয়ে গেছেন এক উত্তুঙ্গ সীমায়। ছিলেন জ্ঞান তপস্বী বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রী গোপাল চন্দ্র সাধু এঁদের জ্ঞানের ছায়ার থেকে অনুশীলন করেছি নিত্যনতুন সংস্কৃতির। একটি ঘটনা বলি তখন Class X -এ পড়ি। ইতিহাস পড়াচ্ছেন প্রাক্তন বনগাঁ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী দেবকুমার মুখার্জী। কোনও একটি বিষয় হঠাৎ তিনি ভুলে যাওয়ায় আমাদের একজনকে পাঠালেন গোপালবাবুর কাছে। সঠিক উত্তরটি জেনে নিলেন ছাত্রসুলভ ভঙ্গিতে। একই সঙ্গে দুজনেই আমার কাছে হয়ে গেলেন বিশাল মাপের মানুষ। এখন যখন এক শিক্ষক অন্য শিক্ষককে সর্ব্বদাই টেক্কা মেরে যাওয়ার যুগ তখন এই ব্যবহার সমীহ জাগায় নিঃসন্দেহে।

'৭৮ সালে আমি নাট্যরূপ দিই 'টেল অব টু সিরিজ' এর। নাটক হবে। ইচ্ছে ছিল ডিকেন্সের একটি ছবি স্টেজে রাখবার। কিন্তু ডিকেন্সের ছবি পাই কোথায়? বহু ইংরাজী শিক্ষকের বাড়ী ঘুরলাম। কিছুই পেলাম না। পেলাম শেষ পর্যন্ত গোপালবাবুর নিজস্ব সংগ্রহে। তিনি সস্নেহে আমাকে ডিকেন্সের ছবিটি অ্যালবাম থেকে কেটে দিলেন পরম মমতায়। মহাবোধ তপস্বী গোপাল সাধুর স্মৃতির অমরত্ব কামনা করি।

বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপকের নাম সশ্রদ্ধ উচ্চরণ করি। তাঁরা হলেন মনি মন্ডল এবং শ্রী জ্যোতির্ময় ঘোষ। মনিবাবু বহুবছর হলো আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন তবুও তাঁর বন্ধুসুলভ ব্যবহার আমায় আচ্ছন্ন করে রাখে। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় যাই মনিবাবুর সাথে গিয়ে আড্ডা দিই। যুক্তিবাদের প্রথম পৃষ্ঠাটা আমার সামনে খুলে দিয়েছিলেন মণিবাবুই।

প্রথম যুক্তি নির্ভর হতে তখনই শিখি। অসম্ভব বন্ধু বৎসল, সমাজ সচেতন এই সুলেখক দার্শনিক সারাটা জীবন শুধুই খুঁজে গেলেন নতুন মানুষ। তারই



রাজারহাটে ছেলের ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক।

ফলশ্রুতি-‘মুরমু’, ‘ভাঙ্গানী’, ‘দেশটা ভারতবর্ষ’। একবার ঠিক হলো সায়েন্স ক্লাব করতে হবে। বেশ কিছুদিন চললও। পরে উৎসাহী লোকের অভাবে উঠে গেল। আমার বন্ধু, দার্শনিক, পথ নির্দেশক এই মহান শিক্ষককে জানাই বিনম্র প্রণতি।

জ্যোতির্ময় ঘোষ।



বনগাঁর বাড়িতে সস্ত্রীক।

প্রথম দিকে ওনার ধারনাই ছিল যে, কোন ভালো ছেলে Arts নেয় না। পরে বোধ হয় ভুল ভেঙেছিল এবং প্রকাশ্যেই আমার বন্ধু অশোক রাহাকে ‘হবু রাজা’ এবং আমাকে ‘গবু মন্ত্রী’ উপাধি দেন। আপাদমস্তক মার্কসবাদী এই ভদ্রলোককে শিক্ষক হিসাবে পাওয়া আমার জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। মার্কসবাদী নন্দন তত্ত্বের প্রয়োগে, বাগ্মিতায়, নানা বিষয়ে পড়াশোনায় তিনি প্রায় একমেব। বহু বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বারে বারেই থেমে যেতে হয়েছে আমাকে তাঁর সামনে। না, বিরক্ত তো হনই নি, বরং রীতিমতো প্রশ্রয় দিয়েছেন আমাকে, যতই অবান্তর আলোচনা করি না কেন। কি serious আলোচনা



বন্ধুদের সাথে, একেবারে বামদিকে।

কি comic আলোচনা সবেতেই সুরসিক, সাহিত্যিক, romantic জ্যোতির্ময় বাবুর অবাধ বিচরণ। Punning তাঁর কাছ থেকে সৌরেন, বাবলু, আমি শিখেছিলাম। শব্দ নিয়ে খেলা করা। রাজনীতির ঘোলাজলে দাঁড়িয়েও স্বচ্ছ হৃদয়ের ও চরিত্রের এই মহর্ষিকে জানাই আমার রক্তিম অভিবাদন।



স্ত্রী ও বন্ধুদের সাথে, বেহালার ফ্ল্যাটে।

বারাসাত গভঃ কলেজে পেয়েছিলাম এক দৃঢ় চেতা, স্পষ্ট বক্তা আদর্শবান শিক্ষককে, নাম উজ্জ্বল কুমার বসু, যিনি প্রাক্তন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। তিনি পরিচয় করে দিয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ'র সঙ্গে আমাদের। তাঁর জন্যই সেই হাস্যরসিক, নোবেলজয়ী, অমর নাট্যকার আজীবন আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

হাবড়া বি-এড কলেজে একজন যুবক অধ্যক্ষ ছিলেন, বয়স ৫৮, নাম পরিমল মুখোপাধ্যায়। যিনি সহজভাবে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টানা ক্লাস নিয়ে চলেন, যিনি নিয়ম নিষ্ঠায় ত্রুটিহীন, যিনি সহজেই ছাত্রের চটি হাত দিয়ে সরিয়ে দেন, যিনি ৫৮ বছর বয়সে ঋজুভাবে ২২ বছরের ছাত্রের থেকে এগিয়ে যেতেন, তিনি এক মাত্র পরিমল মুখোপাধ্যায়, আমার শিক্ষক।

প্রকৃতপক্ষে বি-এড পড়বার আগে আমার discipline সম্পর্কে কোন ধারনাই ছিল না। যার জন্য আমার শিক্ষকতাও ছিল সেই রকম। পরিমল বাবু হাতে ধরে আমাদের শিখিয়েছিলেন শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যবোধ। যাঁর অনেক অনেক ভালো কথার মধ্যে একটি "তুমি কম জানতে পারো, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীকে ভালবাসতে তো পারো। সেটাতো আর তোমার কম নেই।"



শ্বশুড়বাড়ির সবার সঙ্গে বালিগঞ্জে।

জানি না শিক্ষকের মর্যাদা সমাজের কাছে কতটুকু, কিন্তু পরিমলবাবু শিক্ষকতাকে নিয়ে

গিয়েছিলেন সেই সীমানায় যেখানে শিক্ষক এবং পিতা এক হয়ে যান। আমি এই হিমালয় সদৃশ গান্ধীবাদী শিক্ষককে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

আজ প্রায় ৪২ বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার শিক্ষকদের ভাবধারা আমি কতটুকু বয়ে নিয়ে যেতে পারছি জানিনা। যদি তাঁদের কিয়দংশও আমি সফল হতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।



রাজারহাটের এক পাঁচতারা হোটেলে ছেলের বৌভাতে।

আমার শিক্ষক জীবন

বীণাপাণি টিউটোরিয়ালে একটা নিয়ম ছিল-যে সব ছাত্র ছাত্রীরা সেখান থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিত, তাদের থেকেই পরবর্তী শিক্ষক নির্বাচন করা হতো। এ ভাবেই বীণাপাণি শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল ছোড়দা, গৌরদা, সুকুমারদা, দীপকদা, চন্ডীদা, তাপসদা, শুভনদি, সুভাষদা, জয়দেবদা অনেকে। কানাঘুষো শুনছিলাম আমাকে আর হারানকেও নাকি নেওয়া হবে। যা হোক, মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেই একদিন টিউটোরিয়ালে গেছি। রবীন্দ্র জয়ন্তীর তোড়জোড় চলছে। নিখিলদা আমাকে সংবাদ দিল যে, মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে আমাকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলো '৭৬ সালের ৪ঠা মে। পরদিন বাদ দিয়ে



বন্ধুদের সাথে পিকনিকে, একেবারে ডানদিকে।

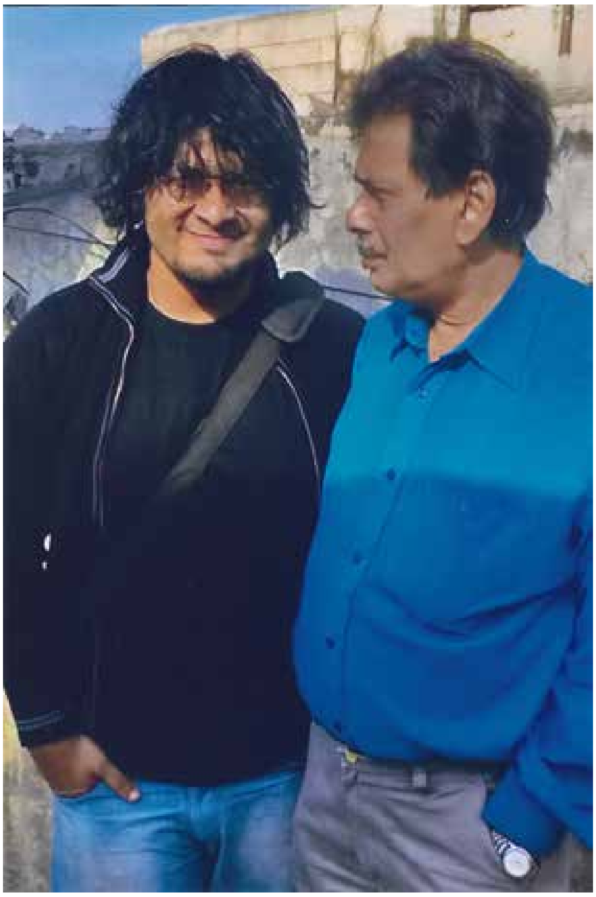


কিশোরবয়েসে বন্ধুদের সঙ্গে, ডানদিক থেকে দ্বিতীয়।

৬ই মে আমার অভিষেক ক্লাস VIII-এ। সত্যিকথা কি প্রায় সমবয়সী মেয়েদের পড়াতে গিয়ে আমার তো 'ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। পর দিন দেওয়া হলে VI-এ। তারপর স্থায়ী ভাবে Class VII-এ বাংলা, সংস্কৃত আর অংক করানোর জন্য নিযুক্ত হলাম। তিন দিন-তিন দিন করে দুটো ব্যাচ পড়াতাম। পার্টনার ছিল শ্যামল আর অজয়। মাসের শেষে পেলাম student পিছু ১ টাকা ২৫ পয়সা হিসাবে সাড়ে ২২ টাকা। এ কিরকম হলো? পরের মাসেই আরও দুইজন ছাত্র ভর্তী হলো। মাইনে হলো ২৫ টাকা। কিম্ আশ্চর্যম্! হারান টিউশনি করে পায় ৫০ টাকা আর আমি ২৫ টাকা! এই সময়ই দিলীপ মন্ডল আমাকে নিয়ে গেল দারাদের বাড়ীতে। খোকা সরকারের ছেলে, ডোরার ভাই দারা। ওখানে পেলাম মাসে ২৫ টাকা। আমারও আয় ৫০ টাকা। হারান শুনলাম আয় করে ৮০ টাকা। পরে আমারও আয় দাঁড়ালো ৮০ টাকা। কখনও কি সন্তুষ্টি আসে? এখনও মনে হয় আরও কয়েক হাজার টাকা আয় বাড়লে বেশ হতো। এই তো জীবন। ভারতীয় দর্শনে যে বলা হয়েছে 'সর্বম্ দুঃখম্' সেটাই ঠিক। আমাদের জন্য দুঃখ, জরা দুঃখ, মরণ দুঃখ। যে সর্বসুখী তারও একদিন চুল



স্ত্রী ও শাশুড়ির সাথে এক রেস্তোরাঁয়।



ছেলের সাথে, দিল্লিতে।

সাদা হবে, দাঁত পড়বে, চামড়া কুঁচকাবে, তার পর একদিন.......। নিজের অবস্থায় কেউই সুখী নয়। আরও-আরও-আরও এই মনোবৃত্তি যেমন এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমন সংকুচিতও করে তোলে মানব হৃদয়।

সে সময় আমার ডেইলি রুটিন ছিল দুর্বিষহ। সকাল ৭ টা থেকে ৯.৩০টা অবধি টিউটোরিয়ালে পড়া বা পড়ানো, তার পর কলেজে যাওয়া, কলেজ থেকে সোজা শক্তিগড়ে মমতা দির ভাই মান্নাকে পড়ানো, পড়িয়ে বাড়ী এসে খেয়ে বীণাপাণি টিউটোরিয়ালে লাইব্রেরীতে ২ ঘণ্টা লাইব্রেরীয়ানের কাজ করা, ৭টায় আবার বসাকপাড়ায় গিয়ে ৩দিন class IX আর তিন দিন class VII পড়ানো। এই সময়ই পড়িয়েছি সুষমা, তরুন, সঞ্জয়, গৌর আর পরমেশ্বরকে। পরমেশ্বর দাস, উড়িয়া, একজন অসাধারন পড়াশুনায় ভালো ছেলে ছিল।

যখন কলেজে পড়ি তখন IX-X এ সংস্কৃত পড়াতে শুরু করলাম। এই পর্যায়েই পড়িয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি গায়ত্রী, সুষমা, মিতা (পারভিন)-দের। মিতাদের বাড়ীর ঈদের নিমন্ত্রনে খাওয়া দাওয়া ছিল ব্যাপক। মিতাদের বাড়ীতে ওর ভাই লাল্টুকে পড়াতাম। গল্প আড্ডায় মিতা-সিরী-রুনুর অতি প্রিয় হয়েছিলাম আমি। গোপালনগরে যেতাম নুপুর, খোকনদের পড়াতে। রাতের কয়লার ট্রেনে করে বনগাঁয় ফেরা আমার কাছে এক রোমাঞ্চ ছিল। ঐ সময়ই যুক্ত হলাম মনিবাবুর সঙ্গে ওর ‘পণ’ পত্রিকা সম্পাদনায়। পুজোর আগে পত্রিকার প্রকাশ আমাদের কাছে ছিল একটা উৎসব। মনিবাবুর উৎসাহেই পণ-এ প্রথম আমার লেখা বেরোলো ‘মনসা মঙ্গল’। সঞ্চিতার লেখাও বেরোলো পণ-এ।



বন্ধুদের সাথে, একেবারে ডানদিকে।

‘৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শুভনদির বিয়ে হলো চিনিদাদার



বন্ধুদের সাথে, সামনের সারিতে বামদিকে বসে।

সঙ্গে। বীনাপাণিতে শুভনদি Philosophy পড়াতো। কয়েক মাস পড়াতে পারবে না বলে ওর স্থলাভিষিক্ত হলাম আমি। '৭৯ র ডিসেম্বরে আমি বীণাপানিতে Philosophy পড়ানো শুরু করলাম। প্রথমেই XII -এর ভয়ঙ্কর সব মেয়ে নিবেদিতা, অনিতা- সবাই যেন ওত পেতে থাকতো আমাকে শিকার করবে বলে। আমার তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' অবস্থা। আমিও তখন বি.এ. পরীক্ষার্থী। তার মধ্যেই নিজেকে তৈরি করতে লাগলাম। এর পরেই শুরু হলো আমার দিগ্বিজয়। পরের ব্যাচ-বকুল, যমুনা, ঝুমা-এদের প্রচারে আমার তখন বিশাল জনপ্রিয়তা। এর পরের ব্যাচ যারা '৮৩তে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল তারা আমার অন্যতম সেরা ব্যাচ। রীতা, বৈশাখী, মানসী, স্মৃতি, সীমা, সুবল, রুদ্র এরা তখন একেকজন আমার সেনাপতি। এর আগে আমার পড়ানো ছিল বিশৃঙ্খল, logic-সর্বস্ব। বি.এড.-এ পড়ে তখন আমি সত্যিকারের শিক্ষক। Philosophy র মূল রস ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে আমি তখন নিরলস। একা থাকলেই Philosophy র বিভিন্ন পর্ব বোঝানোর জন্য নানা কথা ভাবি। পর দিন সেটাই প্রকাশ করি ছেলে মেয়েদের মধ্যে। চার্বাক দর্শন ছিল আমার অতিপ্রিয় দর্শন। মণিবাবুর সঙ্গে থেকে যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক জন সৈনিক হয়ে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রচার আমার পড়ানোর প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠলো। বাড়ীতে গিয়ে পড়াতাম লিলি, কবিতা আর তপতীকে।

'৮২তে বাড়ীতে পড়ানো শুরু করলাম মুনমুন, মৌ, দীপা, পাপিয়া, সুদীপা, অশোকদের। আমার গ্রাফও উর্দ্ধমুখী হওয়া শুরু করলো। B.A. Class-এ এদের সঙ্গে যুক্ত হলো মিহির, দীপক, শ্যামল। '৮৪তে বাড়ীতে গিয়ে পড়াতাম দীপা-দীপিকাকে।



সপরিবারে দিঘায়।

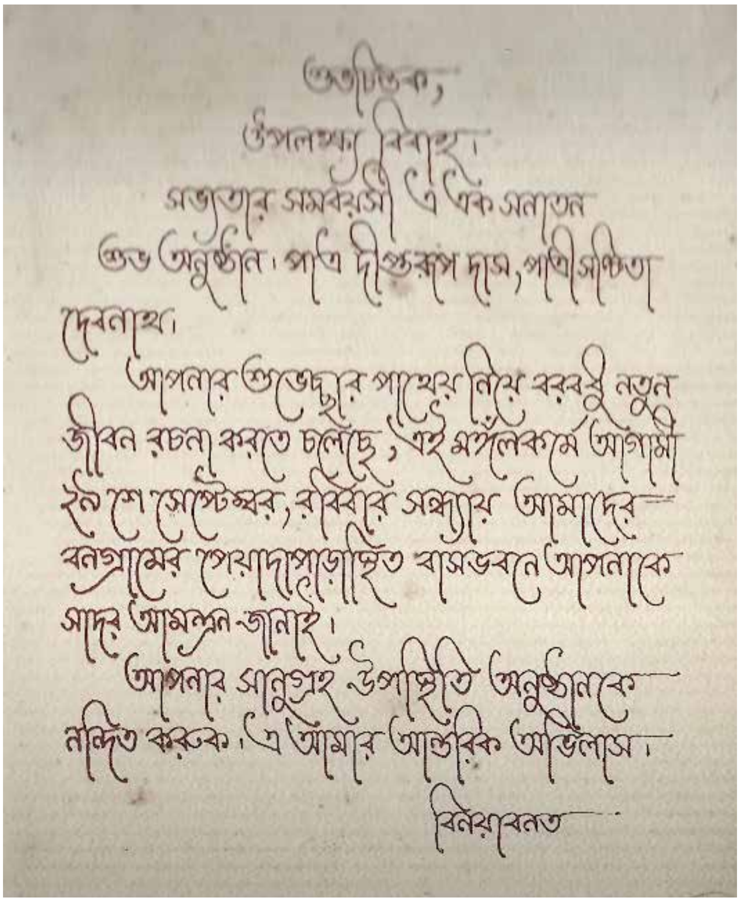


শ্যালকের মেয়ে গুনগুনের সাথে।

দীপিকা এখনও আমাদের পরিবারের বন্ধু। টাটানগরে থাকে কিন্তু এখনও যাতায়াত বা যোগাযোগ রাখায় দীপিকা অবিকল্প।

Private tuition মানেই অনেকে বোঝেন শুধু নোট দেওয়া আর নোট নেওয়া। তাদের পুরোপুরি দোষ না কারণ বেশির ভাগ শিক্ষকই বস্তাপচা নোট আর সাজেশন দিয়েই খালাস। শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্য যে মানুষ তৈরী করা তা তাদের মাথাতেই থাকে না। এখন আবার শিক্ষকতার নতুন সংজ্ঞা হয়েছে কে কত খাওয়াতে পারে। ছাত্র ছাত্রীরা আগে খোঁজ নেয় কোন টিচার বেশী খাওয়ায় আর কাকে মাইনে দিতে হয় না। না, আমি তীব্র প্রতিবাদ করি এর। আমি পড়াই মূলতঃ টাকা আয় করার জন্য আর যুক্তি, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তৈরী করবো বলে। যাঁদের কাছে পড়ানো শিখেছি, তাঁরা এই ভাবেই আমাকে শিখিয়েছেন। Mid-day-meal দিয়ে পড়ানো, মনুষ্যত্বের অপমান বলে মনে করি। এর পরে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে আমার যে স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরী হয় তা আমার bonus।

’৮৪ সালে বাইরে পড়ানোয় এতো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে টিউটোরিয়ালে অতি অল্প টাকায় আর পড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তখন বনগাঁয় Philosophy র প্রতিশব্দ আমি। অনিলদাকে অনুরোধ করলাম ৪টি নয়, ১টি ক্লাস দিতে। অনিলদা উত্তর দিল করলে ৪টিই করো নতুবা তোমাকে পড়াতে হবে না। অভিমানে আমি বীণাপাণিতে পড়ানো ছেড়ে দিলাম। বস্তুতঃ আমি বিতাড়িত হলাম। বাইরে তখন আমার বিশাল জনপ্রিয়তা। এই জনপ্রিয়তাকে বীণাপাণি ব্যবহার করতে পারতো বলে আমার মনে হয়।



শুভচিন্তক,
উপলক্ষ্য বিবাহ।
সভ্যতার সমবয়সী এ এক সনাতন
শুভ অনুষ্ঠান। পাত্র দীপ্তরূপ দাস, পাত্রী সঞ্চিতা
দেবনাথ।
আপনার শুভেচ্ছার পাথেয় নিয়ে বরবধূ নতুন
জীবন রচনা করতে চলেছে, এই মঙ্গলকর্মে আগামী
২৯ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় আমাদের
বনগ্রামের পেয়াদাপাড়াস্থিত বাসভবনে আপনাকে
সাদর আমন্ত্রণ জানাই।
আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে
নন্দিত করুক। এ আমার আন্তরিক অভিলাষ।
বিনয়াবনত

বিয়ের কার্ড।


স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে ট্রেনে।

'৮৪ সালে পেয়েছিলাম আর একটা প্রিয় ব্যাচ। মমতা, নীলা, মালা, দোলা, শ্রাবনী, ছিল সেই ব্যাচে। মাঝে মাঝে মনে হয় 'আমি যে জলসা ঘরে বেলোয়াড়ী ঝাড়/ নিশি ফুরালে কেহ চায় না আমায় জানি গো আর'। যারা পড়ার সময় এত কাছের ছিল, পরবর্তী কালে তারাই হয়ে যায় পর। যোগাযোগের বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখি না অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে। অথচ আমি তো আমার প্রিয় শিক্ষকদের সঙ্গে চিরদিনের গাঁটছড়া বেঁধেছি। রতন সাধু, মনি মন্ডল, পরিমল মুখার্জী, জ্যোতির্ময় বাবু এদের সঙ্গে আমার আজীবন সম্পর্ক। Private যাদের কাছে পড়েছি তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ অমলিন।

স্পিনোজা, চার্বাক, শংকরাচার্য, বৌদ্ধ দর্শনে নিমগ্ন আমি ছেলে মেয়েদের শুধু মার্কস তোলা নয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যতখানি সম্ভব চেষ্টা করেছি সচেতন করতে। এর জন্য ব্রাহ্মন্যবাদের বিরোধিতা, ধর্ম-কুসংস্কার-অযৌক্তিক কাজ কর্মের বিরোধিতা করে গিয়েছি সারা জীবন ধরে। সঙ্গী ছিল বনগাঁ সায়েন্স ক্লাবের সুবীর, সুকান্ত, শ্যামলরা। একবার এক ছাত্রীর মা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিল-


বেহালার ফ্ল্যাটে।



ছেলের সঙ্গে দিল্লিতে।

"আপনি ব্রাহ্মনদের নামে নিন্দা করেন, জানেন কত পুণ্য করলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়?

----আপনি ঠাকুর দেবতা না মানতে বলেন, এ কোন ধরনের শিক্ষা?

----জানেন, এখন গার্জেনরা কত সতেচন?"

আমি হাসবো না রাগ করবো বুঝে পাইনা। যতদিন guardians বিশেষ করে মায়েরা সচেতন না হন ততদিন দেশের উন্নতি সম্ভব না। যবে থেকে দেশে TV এলো তখন থেকেই অনৈতিকতা, কুশিক্ষা, অশিক্ষার হার বাড়তে লাগলো। মায়েরা ছেলে মেয়েদের না পড়িয়ে হাতে রিমোট নিয়ে বসে পড়লো সিরিয়ালের পর সিরিয়াল দেখতে। ছেলে মেয়ে চলে গেল অর্ধশিক্ষিত টিচারের হেফাজতে। টিচারও হাতে মোবাইল নিয়ে বাচ্চাকে তাবিজের গুন শেখাতে শুরু করলো। আসলে কোন দিনই আমাদের দেশে বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা দেওয়া হয়নি। Formal শিক্ষার জন্যই উচ্চশিক্ষিত ছেলে মেয়েরা ঠাকুর প্রনাম করে interview দিতে যায়। স্নাতক সুন্দরী সাধ্বী খপ্পরে পরে সাধু বাবাদের।

২০০০ সালে মাধ্যমিক পাশ করে পড়তে এসেছিল তমো, মৌসুমী, দেবলীনারা। তমো আর ওর দাদা বাপ্পাসহ ওদের পরিবার আমাদের আত্মীয় সদৃশ। যে আদর, স্নেহ, শ্রদ্ধা ওদের পরিবার, বিশেষ করে তমোর দিদিমার কাছে পেয়েছি তা ভোলার নয়। মৌসুমী আমার সর্বকালের সেরা ছাত্রী। বাংলা অনার্সে মৌসুমী Calcutta University তে 1st Class second হয়েছিল। সংস্কৃত ও দর্শনে সর্বোচ্চ মার্কস পেয়ে



পেয়াদাপাড়ার ভাড়া বাড়িতে।



বিয়ের পর সস্ত্রীক পেয়াদাপাড়ার বাড়ির সামনে।

মৌসুমী আমাকে গর্বিত করেছে। মৌসুমীর পড়ার প্রতি, জানার প্রতি আগ্রহ আমাকে চমৎকৃত করে।

আসলে student দের দোষ দেব কেন? শতেক প্রলোভন এদের সামনে। সিরিয়াল, নায়ক-নায়িকা, মোবাইল, ফেসবুক, বিউটি পার্লারের মোহ কাটিয়ে ভাবনার অবকাশ কোথায়? জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায় বই পড়া। সেই বই পড়ার অবকাশই বা কোথায়, ইচ্ছাই বা কোথায়? সারা জীবন ধরেই বাবা- মার হাত ধরে নোট সর্বস্ব পড়াশোনা করে জীবনে সফল বা বিফল হচ্ছে। সেখানে সুনীল-বুদ্ধদেব- নারায়ণ সান্যালদের স্থান কোথায়? জীবনে একটি বই কিংবা ফুল না কিনে কাটিয়ে দেওয়া যায় তা এই প্রজন্মই দেখালো।

আমার আমি

আমার জন্ম হয়েছিল ১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর। বিকেল ৪টেয়। বাবার সিনেমাহল হীরা মহলে চলছিল 'মায়ামৃগ'। রোজ হাউসফুল। মুখার্জী গিন্নী মাকে বলেছিল 'কি সন্তান জন্ম দেসেন দিদি। সিনেমাহল তো ভেঙ্গে পরসে'। বাবা যেন সিনেমা হলের মালিক। আসলে বাবা তো ঐ হলের ম্যানেজার। ছোট্ট খুপরি দেশলাই বাক্সের মতো সিনেমাহল, তার আবার ম্যানেজার! মালিক ছিলেন সুশীল বাবু, বড় বাবু হলেন সুশীলবাবুরই দাদা বাদল বাবু। যদিও আমরা সবাই যেন একই পরিবারের। এই জন্যই হীরামহল বা নন্দিতা টকিজ ছিল 'আমাদেরই হল'। আমি মার অষ্টমগর্ভের সন্তান।



বনগাঁর বৈঠকখানায় সস্ত্রীক।



২৫ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে বন্ধু দম্পতির সাথে।

আমার আগে ছয় ভাই-বোন। একটি বোধ হয় মৃত জন্মেছিল। বড়দি, দিদি, দাদা, চিনি দাদা, ছোড়দা, ভাইদার পরে আমি। নিত্য অনটনের মধ্যে আমার জন্ম। কোনো মতে দাদাদের জামা-প্যান্ট পড়ে আমার বড় হওয়া। মনে আছে একবার পয়লা বৈশাখে বাবা কোলকাতা থেকে আমার আর ভাইদার জন্য প্যান্ট এনে দিল। সস্তার সেই প্যান্ট পড়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে প্যান্ট থেকে সমস্ত রং উঠে একসা কান্ড। আমাকে ঘিরে নদীতে একটা রঙিন বলয়। বাবা রোজ এক টাকার বাজার করতো। রোজ একশো গ্রাম সর্ষের তেল আসতো। আমার অন্নপূর্ণা মা তাই দিয়েই রান্না বান্না করতো। সকাল থেকে রাত। তার থেকেই জমিয়ে জমিয়ে মাসের শেষে মায়ের ভান্ডার থেকে বেরোতো চাল, ডাল, তেল। চড়কের দিন, রথের দিন বাবার কাছ থেকে পাওয়া সিকিটা ছিল দুর্মূল্য। সিনেমা-লগ্নে জন্ম আমার। তাই সিনেমা আমার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কত যে সিনেমা দেখেছি তার কোন ইয়ত্তা নেই। দারা সিং এর সিনেমা আর ঠাকুর দেবতার সিনেমা আমাদের বরাদ্দ ছিল। আমাদের মানে আমার আর ভাইদার। তাছাড়াও স্কুল থেকে এসে চটি সারানোর নাম করে হীরা মহলে গিয়ে বসে পড়তাম প্রায় রোজই। অনেকদিনই ধরা পড়ে মারও খেতাম বেদম। সিনেমা দেখতে দেখতেই আমার কাছে রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও মহাকাব্য হয়ে উঠলো ‘শোলে’, ‘মেরা নাম জোকার’ আর ‘টাইটানিক’। আমার নিজস্ব ধারনা



বনগাঁর বাড়ির খাবার টেবিলে।



চিন্তামগ্ন দীপ্তরূপ।

শোলে যে ভারতের সর্বকালের সেরা হিট সিনেমা তার কারন ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের নব রস। শোলে সিনেমার পরিচালক রমেশ সিপ্পী নয়টি রসকে সমান ভাগে ভাগ করে পরিবেশন করেছিলেন। রাজ কাপুর আমার প্রিয় পরিচালক। ওঁর 'মেরা নাম জোকার' আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার মধ্যে রাজুর একটি মোক্ষম উক্তি 'কুমার সাব, সওয়াল ইয়ে নেহি কে ম্যায় মিনাকো মুহব্বত করতা হুঁ ইয়া নেহি। নেহি কুমার সাব, সওয়াল ইয়ে ইয়েহি কে ম্যায় মুহব্বত করতা হুঁ ক্যা? হাঁ কুমার সাব, ম্যায় মুহব্বত করতা হুঁ। পরে মিমি চ্যাটার্জী জানার অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে আসতো জিজ্ঞাসার পাহাড় নিয়ে। আমিও চেষ্টা করতাম ওর আগ্রহকে পুষ্ট করতে।

শিক্ষক যে পিতার আরেক রূপ তা প্রথম আস্বাদ পেলাম ২০০১ এ সৌমি, অদিতা, তুলিকা, উমা, তন্ময়, অনির্বান, ঝুমাকে পড়াতে গিয়ে। বাবা আর শিক্ষককে একাকার করে আমাকে আপ্লুত করেছিল ওরা। এর পরের বছরেই পেলাম এক ঝাঁক ছেলে মেয়ে একসঙ্গে। লুবলু, জহিরুল, রুশা, মারুফা, মাসুমা এদের রেজাল্ট দিয়ে আমাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ওদের আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক। সংস্কৃত আমার প্রাণের ভাষা। ভাষার প্রয়োগে, বানান বিধিতে, আচরণে সংস্কৃতানুগ হতে চেয়েছি সারা জীবন। আর শিশুরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ছোটদের সঙ্গে কথা বলেই আমি মনের আরাম পাই। সেই জন্যই ২০০৩-২০০৪ সালে বাচ্চাদের সংস্কৃত পড়াতে উদ্যোগী হই। বিনা পয়সায় টুবলুদের ব্যাচের ২৩ জনকে সংস্কৃত পড়াতাম। অসাধারন সুখ পেয়েছিলাম ওদের পড়িয়ে। অনিরুদ্ধ, সৌরভ, দেবার্ঘ্য, টুবলু এরা ছিল উজ্জ্বল। অনিরুদ্ধর খাতায় আমি কোন দিন একটা লাল দাগ দিতে পারিনি। অমিতাভ ধর, পরমেশ্বর দাসের পর অনিরুদ্ধই সেই ছেলে যে আমার সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলতে পারতো।



দোলের আনন্দে বন্ধুদের সঙ্গে, একেবারে বামদিকে।



বনগাঁয় ছেলের বৌভাতে, পুত্রবধূ সৌমির জন্মদিনের কেক খাবার মুহূর্তে।

বছর দশেক আগে একটি ছাত্রী আমাকে বলে ফেলেছিল 'স্যার আপনার নাম শুনে আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় ইয়ং ছেলে।' অশনি সংকেত তখনই পেয়ে গেলাম। চারি দিকে আসলে যৌবনের জয়জয়কার। যে আমি '৮৮ সালে সপ্তাহে ৩৭১ জনকে পড়িয়েছি, সেই আমি এখন অর্ধেক স্টুডেন্টও পাই না। বোধহয় আমিই নিজেকে পাল্টাতে পারিনি যুগের সঙ্গে। হাতে বালা, গলায় হার, মাথায় টুপি ছেলেদের কোন দিনই সহ্য করতে পারি না। তেমন মেয়েদের খাটো প্যান্ট, টপ ইত্যাদি। সর্বোপরি মোবাইল। আমার পড়ার ক্লাসে মোবাইল নিষিদ্ধ। কিন্তু কে শোনে কার কথা? যতই ভালো পড়াই না কেন, খিটখিটে বুড়োকে কে সহ্য করে? তাই চলো 'অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'। নেভিল কার্ডাসের একটা কথা আছে-'সে ক্রিকেটের কিছুই জানে না, যে শুধু ক্রিকেটটাই জানে'। আমি একটু ঘুরিয়ে বলি Philosophy-র সে কিছুই জানে না যে শুধু Philosophy-টাই জানে। শুধু Philosophy নয়, কোন বিষয়েই গভীর জ্ঞান ছাড়াই, পারিপার্শ্বিক জীবন,



স্ত্রী সঞ্চিতার সাথে।

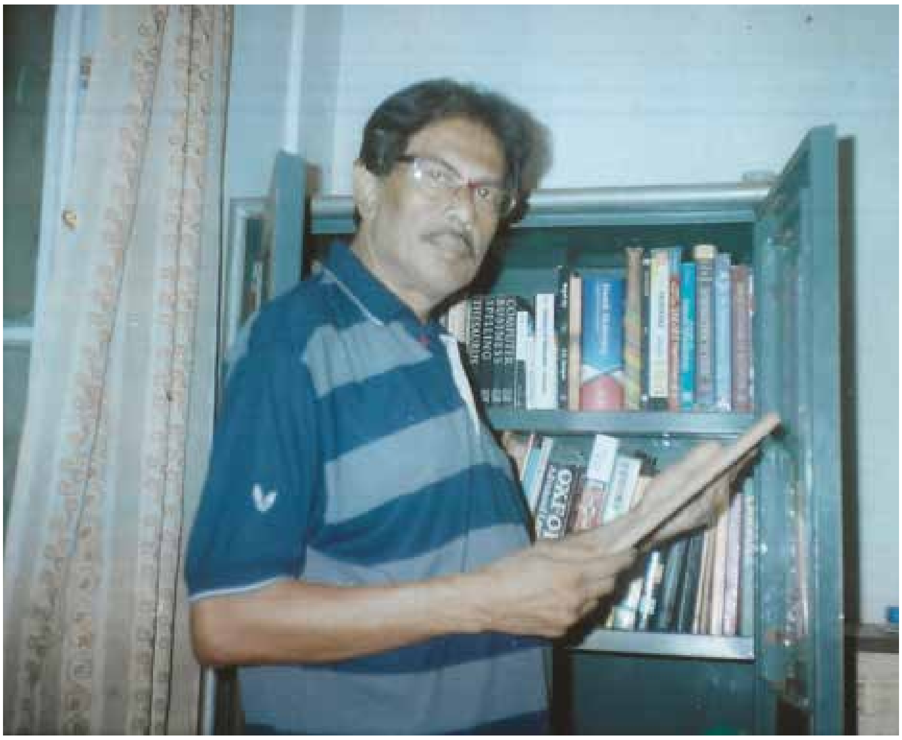
জগৎ, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি কিছুই না জেনে পড়িয়ে যাচ্ছে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন। ট্রেনের হেড লাইট শুধু তো লাইনের উপরে পড়ে। তাতেই কাজ চলে যাচ্ছে। তার বাইরে আলো ফেলার দরকার কি?



কোনো এক অনুষ্ঠান বাড়িতে।

টুবলুদের ব্যাচের নঈম। আমার সর্বকালের সেরা সফল ছাত্র। যাদবপুর ইউনিভারসিটির 1st Class First নঈম এখন আশুতোষ কলেজের Philosophy র অধ্যাপক। নঈম আমার গর্ব। মানে মাঝে দুই একজন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ঝলক দেখতে পাই এখনও। এরা বোঝার চেষ্টা করে, জানার চেষ্টা করে, ভালো কিছুকে অনুসরন করার চেষ্টা করে। ৪২ বছর পড়াচ্ছি। এখনও একজনও ছাত্র-ছাত্রী পাইনি যে ধর্ম-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। তবু এদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষন করেছে দিতি, রিয়া, রিম্পি, শ্রমন যারা ‘ঝড়’ সিনেমা দেখে আবেগে কেঁদে ফেলে।

‘কুমার সাব, ম্যায় মুহব্বত করতা হুঁ। ফুলো সে, পত্থরোঁ সে, বুড়হা সে, বচ্চো সে, মর্দ সে, ঔরত সে ম্যায় মুহব্বত করতা হুঁ।’ হ্যাঁ, আমিও ভালোবাসি। শুধু ভালোবাসার জন্য হাজার মাইল হাঁটতে পারি। মনে আছে, বীনাপানিতে সরস্বতী পুজোর আগের রাতে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পরেছিল আমার আর নিখিলদার উপর। অপূর্ব সুন্দর হয়েছিল সেবার সরস্বতীর মূর্তি। আমি সারা রাত জেগে তাকিয়ে ছিলাম মূর্তির দিকে। আসলে সেই প্রতিমার প্রেমে পড়েছিলাম আমি। রোমান্টিক সিনেমা দেখেছিলাম ‘পলকোঁ কি ছাও মে’, ‘সবেরে বালী গাড়ি’, কমিউনিষ্ট আদর্শের উপর সিনেমা ‘সমাজ কো বদল ডালো’, ‘মিট জন ডো’র অনুসরনে টিনু আনন্দের ‘ম্যায় আজাদ হুঁ’। অসাধারন অ্যান্টি রোমান্টিক সিনেমা দেখেছিলাম দয়াল নিহালনির ‘অন্ধাযুগ’। গীতিময় সিনেমা ‘অমরগীতি’, ‘সুর সঙ্গীত’ এবং সর্বোপরি ‘গুগা বাবা’, ‘হীরক রাজার দেশে’। ‘পাকিজা’, ‘রাজিয়া সুলতানা’, ‘নিকাহ’,



বেহালার ফ্ল্যাটে বই পড়তে পড়তে।



দোলের আনন্দে বন্ধুদের সঙ্গে বাগুইহাটিতে, ডানদিক থেকে দ্বিতীয়।

'আনন্দ', 'কিনারা', 'পরিচয়', 'নমক হারাম', 'খুশবু', 'সত্যকাম', 'রাম তেরি গঙ্গা মইলি', 'প্রেম রোগ', 'তাল', 'লগান', 'থ্রি-ইডিয়টস্'। বাংলায় 'স্বাতী', 'কোনি', 'অগ্রদানী', 'একটি জীবন', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'গণশত্রু', 'বালিকা বধূ', 'গণদেবতা', 'সাগিনা মাহাতো' আমার all time favourite। বাংলায় তপন সিংহের সিনেমা আমাকে মুগ্ধ করতো। সোজা সরল ভাষায় তপন বাবুর narrative সিনেমা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। আশ্চর্য, তপন সিংহ নিজেকে কখনো repeat করেননি। তাছাড়া তপনবাবু সিনেমার মধ্যে যে optimisn বা হার না মানা যুদ্ধ তা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। যে সব টেলিফিল্ম আমি করেছি, অবশ্যই বালখিল্যতা, তা তপন সিংহকে অনুসরণ করেই করেছি।

বাবা-মার বিয়ে হয়েছিল ১৩৪১ সালের ২৮শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় দিন পর। আশ্চর্যের কথা, বিয়ে বাড়ীতে শোকের কারনে কোন নিয়ন্ত্রিত লোক আসে নি। মায়ের বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর Sub-Division এ। বাবার বাড়ী ছিল লস্করদি গ্রামে। ঠাকুরদা ছিলেন প্রসন্ন কুমার দাস। ঠাকুমা সারদা দেবী। এদের অবশ্য আমি দেখিইনি। বরঞ্চ দাদু জ্ঞান বোসকে দেখেছি আমাদের বাড়ীতেই কিছু দিন ছিলেন বলে। কাজ করতেন বনগাঁ পোষ্ট অফিসে। দিদিমা ছিলেন ইন্দুলেখা বোস, আমার প্রথম প্রেমিকা। বস্তুতঃ দুমুনির থেকে সুন্দরী আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। শ্বেতাম্বর ধরা, শ্বেতগন্ধানুলেপনা দুমুনি এখনও আমার চোখে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। বাবা ছিলেন নয় ভাই এক বোন। কাকা আর পিসিমা ছাড়া কারও সঙ্গেই আমার সাক্ষাত হয়নি। অথচ আমার ছয় মামার সঙ্গেই ছিল আমাদের যাতায়াত, হৃদ্যতা। আসলে



ছোটবেলায়।



কর্মক্ষেত্র বনগাঁর টাউন লাইব্রেরিতে।

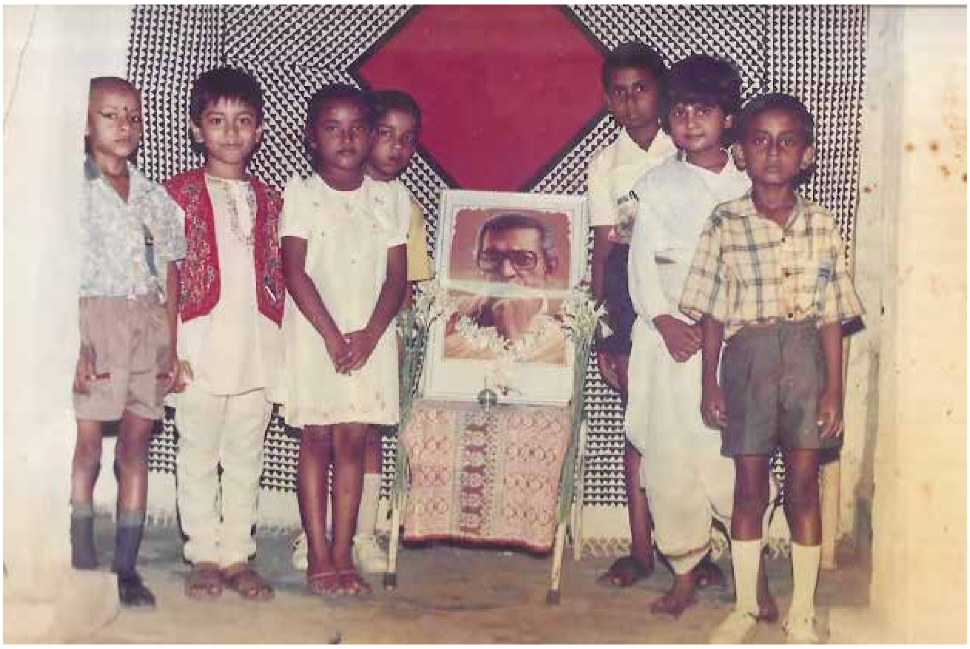
আমাদের নারীপ্রধান সমাজে মামাবাড়ীর সঙ্গেই বেশিরভাগ লোকের সখ্য। হ্যাঁ, সচেতন ভাবেই একথা বললাম। তার প্রধান প্রমাণ তো প্রত্যেক ঘরে ঘরে। সীতা, দ্রৌপদী থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুদ্ধেই নারীদের হাতেই থাকে আসল সুইচ। মায়েদের উচ্চাকাঙ্খাতেই ইংরাজী স্কুলে-স্কুলে ভরে যাচ্ছে গিনিপিগেরা। চাণক্যের থেকে বলি 'উন্মত্ত সন্তান হয় জননীর দোষে'। সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খল, অবিনীত, দুষ্কৃতীর ভিড় তার পিছনে মায়েদের কি অবদান নেই? সিরিয়াল সর্বস্ব মায়েরাই বাচ্চাদের ঠেলে দিচ্ছে স্বাধীনতার অন্ধকারে।

সেজ মামার বদান্যতায় দাদার চাকরী হলো রেলে। আমাদের সংসারেও একটু শ্রী ফিরলো। ক্রমে ক্রমে চিনি দাদা চাকরী পেল কোলকাতার Oberoi Group-এ। ছোড়দা চাকরী পেল রনঘাট অঞ্চল হাই স্কুলে। দাদা বৌদির মেয়ে আমাদের আদরের তুপুল, চিনিদাদা সুভনদির ছেলে ঋক, ছোড়দা স্বপ্নার ছেলে মনুয়া। এরা আমাদের বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আশায় বুক বাঁধি। মনুয়া ইতোমধে film directer হিসাবে দেশে বিদেশে প্রসংশিত। ঋক M.C.A. করে কোলকাতায় চাকরীতে থিতু। আমাদের ভাড়া বাড়ী থেকে ক্রমে ক্রমে দাদা সপরিবারে চলে গেল বালিগঞ্জের শ্বশুর বাড়ীতে। চিনিদাদা চলে গেল বাগুইহাটিতে সপরিবারে। ছোড়দা সপরিবারে থাকে বনগাঁরই মুস্তাফিপাড়ায়। মহালয়ার দিন আসলেই আমার চোখে জল আসে। ভোরবেলায় বাবা কলিং বেল বাজিয়ে ডেকে দিত আমাদের। আর আমরা পাঁচ ভাই, বাবা মা বসে বসে চন্ডীপাঠ শুনতাম।



তিন প্রজন্ম একসাথে- মাখনলাল, চার্বাক ও দীপ্তরূপ।

মাঝে বাবার আনা লেড়ো বিস্কুট আর ভাঙা বিস্কুট সহযোগে চা খাওয়া আমাদের সুখরাজ্যের উপকরণ ছিল। আর আজ বাবা নেই, মা নেই, দাদা নেই, চিনিদাদা নেই। সব ভাইরাই আলাদা থাকি। চন্ডীপাঠ শুনি শুধু আমি আর ভাইদা। '৮৫-র ৪১ আগষ্ট থেকে শুধু বাবা, মা, ভাইদা আর আমি।



অপুর সংসার আয়োজিত সত্যজিৎ জন্ম জয়ন্তীতে ছোটরা।

৮৫-র ২৭শে সেপ্টেম্বর বিয়ে করলাম সঞ্চিতাকে। ওর বাবা চন্দ্রকান্ত দেবনাথ, মা মঞ্জু দেবনাথ। দেবনাথবাবু ছিলেন তাত্ত্বিক কমিউনিষ্ট নেতা। ছিলেন রাজ্য-সরকারী কর্মচারী। মার্কসবাদ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানী এই লোকটিও আমার অন্যতম প্রিয়। আমৃত্যু আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা নিয়ে। বিয়ে করলাম মানে অধর্মীয় রেজিস্ট্রী ম্যারেজ। ধর্ম কোন দিনই মানিনি। সমালোচনা প্রতিকূলতা নিয়েই সঞ্চিতাকে ঘরে তুললাম। সমাজ মানি কিন্তু ধর্মীয় আচার মানি না। তাই সমস্ত রকম অনুষ্ঠান করেই শুরু হলো আমাদের যৌথ পথচলা। আমাদের পাঁচজনের তখন সুখের সংসার। এই সময় মায়ের একটা কথা আমাকে আপ্লুত করেছিল। মা বলেছিল জীবনে এত সুখ কখনো পাইনি। জীবনে যা কিছু করেছি, পেয়েছি সবই মনে হয় মা-বাবার আশীর্বাদে। মার মৃত্যুর আগে একদিন অফিস যাচ্ছি। মা আমার হাত ধরে বলেছিল- তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিস। তুই না থাকলে আমার ভালো লাগে না। আমি অভিভূত।



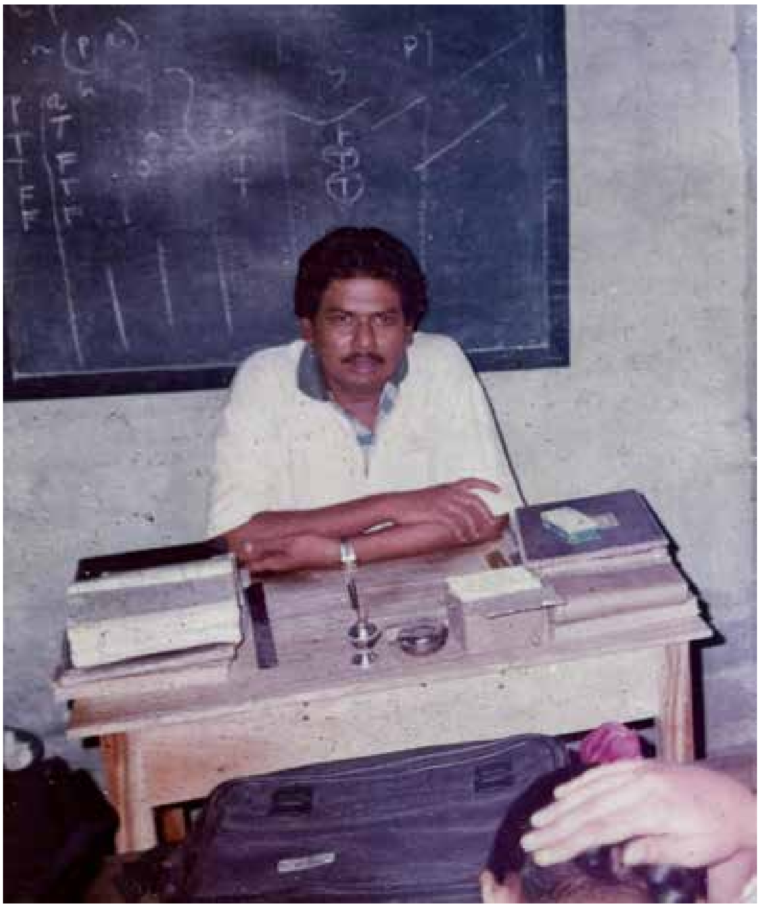
বাবা মাখনলালের সঙ্গে।

বিয়ের সময় আমি চাকরী পাইনি। কিছুটা রিস্ক নিয়েই টিউশনির উপর নির্ভর করেই বিয়ে করেছিলাম। অবশ্য সেই সময়ই আয় করতাম ৩৫০০-৪০০০ টাকা। খুব কম নয়। বিয়ের ঠিক এক বছর পর চাকরী পেলাম 'ঘোজাডাঙ্গা সাধারণ পাঠাগারে'। ১৯৮৬ সালে ২০শে অক্টোবর। অবশ্য চাকরী নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম ১লা

অক্টোবর, আমার জন্মদিন। বাবা বলেছিল ‘ক্ষণজন্মা’। ছয় মাসের মধ্যেই transfer হয়ে আসলাম ‘চারঘাট যোগেশ পাঠাগারে’। শিশির ভাদুড়ীর সহশিল্পী যোগেশ চৌধুরী স্মৃতিধন্য চারঘাটে তাঁর বসত বাড়ীর কাছেই লাইব্রেরি। আমার সময়ে প্রথমে সম্পাদক ছিলেন নিমাই চন্দ্র মন্ডল। তারপর পঙ্কা, সোমপ্রকাশ চ্যাটার্জী। তারপার বাকা, গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। শেষে রামু, প্রবীর চ্যাটার্জী। এরা সবাই ছোট হলেও এদের সঙ্গে, কৈলাশ, প্রণব, বাবু, কালু, ললিতদের সঙ্গে আমার ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। আর বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ছিলেন রামুর বাবা গণেশ চ্যাটার্জী। চারঘাটেই পেয়েছিলাম আমার অনুজপ্রতিম দুই বন্ধুকে। সামিরুল হক এবং কানাই মন্ডল। মেধাবী, সংস্কারহীন মানসিকতার এদের সবার সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব আজও অমলিন। চারঘাটের বারোয়ারী মন্ডপ আমাকে এখনও টানে।



ছুটিতে গ্যাংটকের পথে।



যৌবরাজ্যে পড়ানোর ফাঁকে।

Honeymoon -এ গেছিলাম শ্যামল, রত্না, প্রদীপ সহ আমরা দুই জন দীঘাতে। বাঙালীর ‘দীপুদা’র মধ্যে প্রথম সারলাম দীঘা। তার পরের বছর আমি আর শ্যামল সপরিবার গেলাম ‘দার্জিলিং’ এ। মিরিক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ঘুম সব মিলিয়ে সে এক স্বপ্নের সফর। চাকরী পেলাম ঘোজাডাঙ্গায়। ‘৮৬ সালের ১২ই মার্চ ইন্টারভিউ দিলাম D.S.E.O. অফিসে। প্রথমেতো কর্তৃপক্ষ বিশ্বাসই করতে চায়নি যে আমি এখনও চাকরী পাইনি। শেষমেশ অক্টোবরে Join করলাম। ঘোজাডাঙ্গা বর্ডারের পাশেই ছিল লাইব্রেরি। Secretary ছিল ঠাকুর দাস সরকার। Assistant ছিল নিয়ত আলি গাজী। কোলকাতা পার্ক স্ট্রীট এ ছিল ঠাকুর দাসের অফিস। সেখানে গিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে আসতে হতো।

বর্ডার দিয়ে দেখতাম কত লোকের আনাগোনা। তার মধ্যে আবার B.S.F. এর টহলদারী। এর মধ্যেই কেটে গেল ৬-৭ মাস।

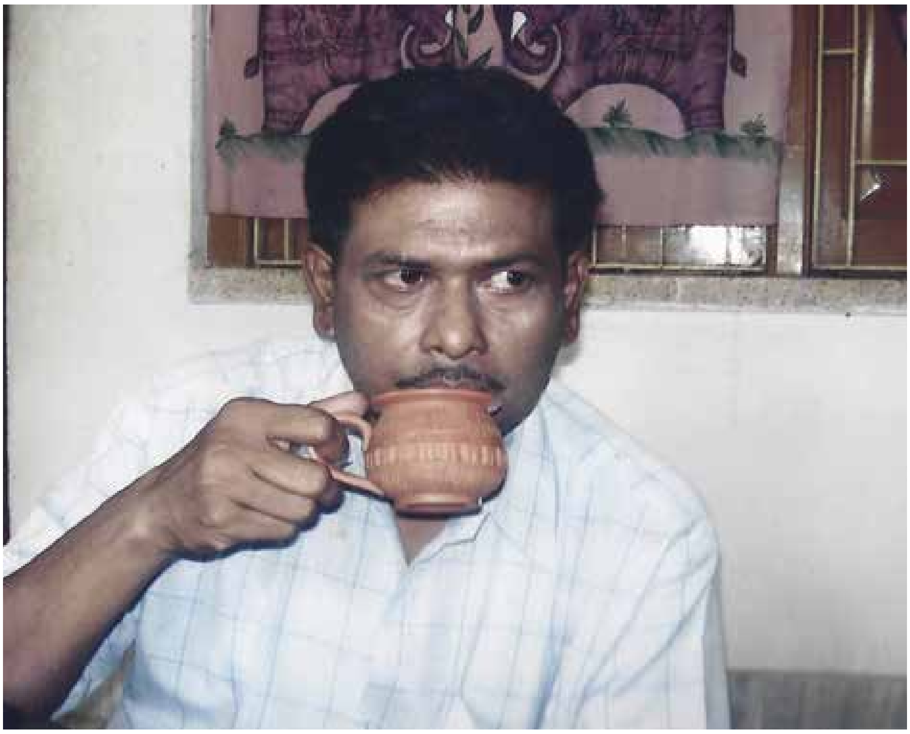


স্ত্রীয়ের সাথে রাজারহাটের ফ্ল্যাটে।

৮৭-র পুজোয় আমি, ভাইদা আর সঞ্চিতা গেলাম বেনারস বেড়াতে বুক্কি মামার বাড়িতে। বুক্কি ছিল ওখানকার cinema হলের operater। খুব মজায় এদিক ওদিক ঘুরে কাটালাম পুজোর দিন গুলো।

৮৮র ২৩শে আগষ্ট। আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য বছর। আমি বাবা হলাম। বনগাঁ হাসপাতালের কেবিনে ভোর ৪টায় সঞ্চিতা জন্ম দিল লুবলু, আমার পুথুনকে। বাবা-মার আনন্দ আর ধরে না। বাবা তার স্বল্পতম পুঁজি থেকে আমাকে টাকা দিয়ে বললো ছেলের জন্য রুপোর বালা আনতে। হাসপাতাল থেকে নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে বাচ্চার ছবি তুলে সঞ্চিতাকে বাচ্চা সহ দিয়ে আসলাম ওর বাপের বাড়ী বিড়াতে।

২রা অক্টোবর। ভারতের টিভির ইতিহাসে একটা যুগ শুরু হলো। B.R. Chopra-র মহাভারত শুরু হলো। প্রায় বছর দেড়েক সেই সিরিয়াল চলেছিল। আশ্চর্যের যে, রবিবার ৯টা থেকে ১০টা সারা ভারত স্তব্ধ হয়ে থাকতো। এর আগে রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’ ও সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু মহাভারত সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। আমাদের বাড়ীতেও পুথুনের জন্ম উপলক্ষে Colour T.V. আনা হয়েছিল। মহাভারতের শুরুর দিনই পুথুন আমাদের বাড়ীতে ঢুকলো।



বৈঠকি মেজাজে।



বনগাঁর লেখক শিল্পী সংঘের সদস্যদের সাথে।

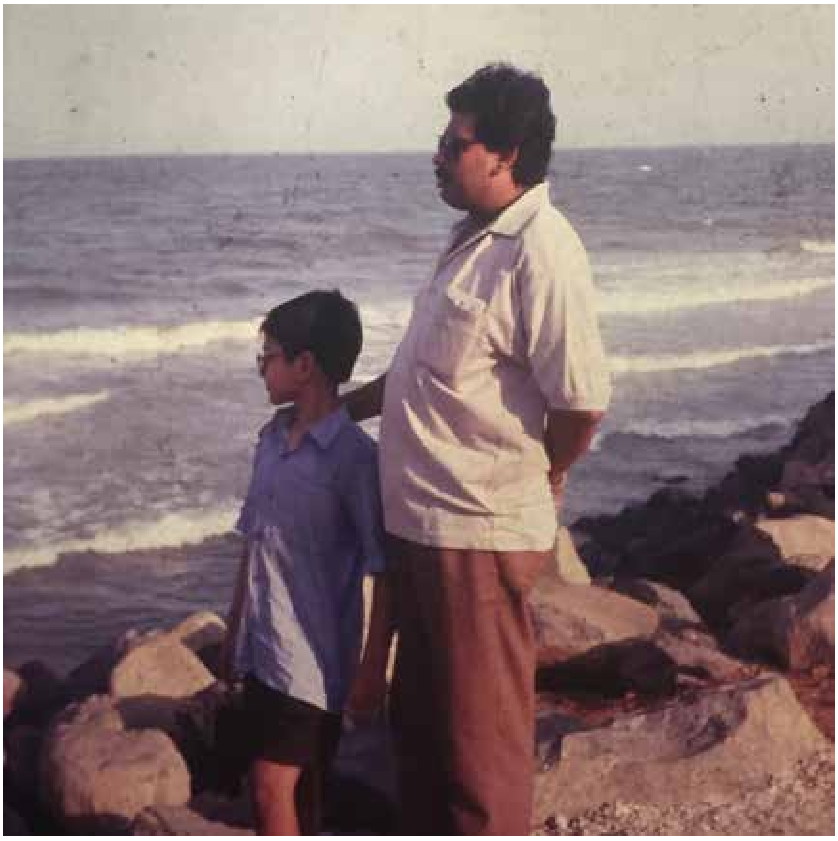
প্রথমে পুথুন এর নাম দেওয়া হয়েছিল মনোরম। মনোরম দাস। কিন্তু সঞ্চিতাই প্রস্তাব দেয় পদবী হোক দীপ্ত। সেই মতো পুথুনের birth certificate করা হলো চার্বাক দীপ্ত। আমার প্রিয়তম দর্শন চার্বাক এর নাম আনুসারে। আমার এক বৌদি আপত্তি করে বলেছিল ‘চার্বাক নাম দিয়েছো? ওটাতো একটা শ্লেচ্ছ দর্শন’। আমি প্রশ্ন করাতে তার উত্তর ‘চার্বাকরা তো শুধু ভোগের কথা বলে’। বোঝ কান্ড! উনি নিজেই ভোগের মাঝে থাকেন। অথচ চার্বাকদের নিন্দা করেন। অলৌকিকতা, ব্রাহ্মণ্য বাদ এর বিরোধিতায়, কুসংস্কারের বিরোধিতায় মার্কস, হিউম, কান্টের বহু আগে ভারতবর্ষে ধর্মের বিরুদ্ধে ধ্বজা তুলে ধরে ছিলেন চার্বাকরা। মনিবাবু আপত্তি করেছিলেন কারন চার্বাকরা খুব অপমান সহ্য করেছিলেন বলে। কিন্তু হাজার হাজার বছর পরেও চার্বাক দর্শন এখনও প্রতিধ্বনিত হয় এও কি কম কথা?



পড়ানোর ঘরের মুখে যৌবরাজ্যের ব্যানার।

সঞ্চিতা শুধু আমার স্ত্রী নয়, আমার সহধর্মিনী। এমন কোন আদর্শগত দিক নেই যা নিয়ে আমরা একমত হইনি। তাই পরের বছর ১লা বৈশাখ পুথুনের অন্নপ্রাশন হলো কোন

রকম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছাড়াই। মায়ের প্রসাদ খেয়ে পুথুনের ভাত খাওয়া শুরু। এর মধ্যেই '৮৯ সালের ৭ই জানুয়ায়ী বাবা আমাদের ছেড়ে মহানির্বানে গেলেন। বাবার লেখা ডাইরীতে পুথুনের জন্মের কথা লেখা আমাদের এখনও রোমাঞ্চিত করে। কপর্দকহীন অবস্থায় বাবা মারা গেলেন। ভাবতে অবাক লাগে কোন ভিত্তিতে বাবা-মা কোন রকম সম্পত্তি ছাড়াই শুধুমাত্র ছেলেদের কর্তব্যের, ভালোবাসার উপর ভরসা করেছিল। আশাকরি আমরাও সে ভরসার যোগ্য মর্যদা দিয়েছিলাম।



ছেলে চার্বাকের সাথে পন্ডিচেরিতে।

পুথুনের অন্নপ্রাশনে খুব কম লোক নিমন্ত্রিত ছিল। মাত্র ১০০ জন। কিন্তু খুব জাঁকজমক করে অনুষ্ঠান হয়েছিল। কোলকাতা থেকে বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম এনে প্যান্ডেল সাজানো হয়েছিল। বনগাঁয় প্রথম ক্যাটারিং সার্ভিস শুরু হয়েছিল পুথুনের অন্নপ্রাশন দিয়েই। প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম পুথুনের উপর কিছু experiment করব। তখন বামফ্রন্টের ঘোষিত নীতি ছিল 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। তাই ক্লাস V এর আগে ইংরাজী পড়ানো ছিল স্কুলে নিষিদ্ধ। যদিও উচ্চাকাঙ্খী বাবা-মারা এমন স্কুলেই ছেলে মেয়েদের ভর্তি করতো যেখানে ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরাজী পড়ানো হতো। না, কোন দিনই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইনি। তাই পুথুনকে ক্লাস ফোর-এর ছয় মাসের আগে ইংরাজী বর্ণও শেখানো হয়নি। যখন শিখলো তখন মাত্র এক সপ্তাহেই ইংরাজী শিখেছে। মনে আছে ট্রেনে যেতে যেতে ওর ইংরাজী শিক্ষা হয়েছিল। শুধু Maslandpur ছাড়া আর সব স্টেশনেরই নাম পড়তে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, হাই স্কুলে ইংরাজী শিক্ষকরাও



সত্যজিৎ রায়ের ক্লাসফ্রেন্ড গল্পের শুটিংয়ে পরিচালকের ভূমিকায়।



বনগাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় সস্ত্রীক।

বলেছিল ওর চেয়ে ভালো ইংরাজীর ছাত্র ওরা পায়নি।

’৮৯ সালে বাবা মারা যাওয়ার পরই আমি আর ভাইদা ঠিক করেছিলাম যে করে হোক মাকে নিজের বাড়ী দেখাতেই হবে। সেইমতো আমলা পাড়ার মিয়া বাগানে আড়াই কাঠা জমি কেনা হলো। ’৯০ সালের ২১শে জানুযায়ী বাড়ীর কাজ শুরু হলো। শেষ হলো মে মাসে। খুবই ছোট্ট বাড়ী। তবু ‘নিজ বাড়ি খাসা’। ‘৯০ সালের ৩রা জুন মা’র জন্ম দিনে বাড়ীর গৃহপ্রবেশ করা হলো।



হালকা মেজাজে।

এর মধ্যে ভাইদার বিয়ে হয়েছে মমতাদির সঙ্গে ‘৯০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। বাড়ীতে তখন মাকে নিয়ে আমি, সঞ্চিতা, পুথুন, ভাইদা, মমতার জমাটি সংসার। ‘৯০ সালের ৫ই ডিসেম্বর মমতার ছেলে হলো টুবলু। টুবলু এখন Jadavpur University থেকে Hons, M.A., B.Ed., MPhil করে PhD-র জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।



ছাত্র ছাত্রীদের সাথে পেছনের সারিতে একেবারে বামদিকে।

ভাইদারা আর আমরা একসঙ্গে বহু জায়গায় বেড়াতে গেছি। পুরী, বেনারস, দিল্লী, আগ্রা, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরি, দীঘা, আসাম, রাউরকেল্লা এদিকে মায়াপুর, শান্তিনিকেতনে আমাদের ইচ্ছামত বেড়ানো হয়েছে। '৯৭ সালে দুটো বিপদ হলো এক, পুথুনের চোখ খারাপ ধরা পড়লো, দেখা গেল একটা চোখে দেখে না। ডঃ মনোজ হালদারের এডভাইসে পুথুনের চোখে occlusion করা হলো অর্থাৎ ডান চোখটা ঢেকে দেওয়া হলো। কিছু দিনের মধ্যে ঠিক না হওয়াতে আমরা অধৈর্য হয়ে ওকে নিয়ে গেলাম চেন্নাই। ওখানে ওর occlusion খুলে দিতে বললো। মনোজ হালদারকে এসে বলাতে ডাক্তারব পরিষ্কার বললেন - stupid proposal। সেই থেকে ছ'মাস চললো চোখ ঢেকে রাখা। পরে পুথুনকে টেষ্ট করে চশমা দেওয়া হলো minus 7.5 power এর।

'৯৭ এর নভেম্বরে হঠাৎ করে অসুস্থ হলাম। পৃথিবীতে যেন অক্সিজেনের অভাব পড়ে গেল। নাসিংহোমে ভর্তি ছিলাম তিন দিন। তার মধ্যেই আমার ছাত্র নন্দ গিয়ে আমার অক্সিজেনের মাস্ক, স্যালাইন শোভিত ছবি তুলে রাখলো। '৯৭-তেই দুটো ভালো ঘটনা ঘটলো আমাদের। মার্চ মাসে বাড়ীতে ল্যান্ড-ফোন এলো। নম্বর ছিল ০৩২১৫-৫৬১৬৪। পয়লা মে আমাদের পড়ানোর বাড়ী উদ্বোধন করা হলো। এতো দিনে আমাদের নিজস্ব পড়ানোর বাড়ী তৈরী হলো। আমাদের সাধের 'যৌবরাজ্য'।

চেন্নাইতে গিয়েছিলাম বটে পুথুনের চোখ দেখাতে। বেড়ানোও কম হয়নি। ঘুরে বেড়ালাম কলামন্ডলম্, মেরিনা বিচ এবং মাদ্রাজ



ছুটিতে গ্যাংটকের রাস্তায় সস্ত্রীক।



পরিচালিত ‘উনিশ বিষ’ ছবির একটি মুহূর্ত।

ইউনিভার্সিটি। শেষে গেলাম পন্ডিচেরি। ওখানকার পরিবেশ, সমুদ্র দেখে মোহিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে সমুদ্রের উপর থাকা রেস্তোরাতে প্রণ বিরিয়ানীতে আমরা ফিদা।

২০০০ সালে পর পর বিপর্যয়। প্রথমে মে মাসে সঞ্চিতার কাকা মারা গেল। জুন মাসে মারা গেল ক্যাসন। ক্যাসন আমার মাসি। প্রায়ান্ধ ক্যাসন ছিল আমার অত্যন্ত গুনগ্রাহী। ছোট বেলায় ক্যাসনের বলা গল্প ‘একটা ভাম আসিল’ আমাকে মুগ্ধ করে রাখতো। সে ক্যাসনের চোখ operation করে ভালো হয়ে গেল। আমরাও ক্যাসনকে দেখতে যাব বলে স্থির। চোখ ভালো হয়ে যাওয়ার আনন্দে heart attack হয়ে ক্যাসন মারা গেল। ক্যাসনের অন্তরঙ্গ আমার মাও তখন মৃত্যু শয্যায়। এর মধ্যেই ২০০০ এর বন্যা। বনগাঁ ভেসে গেল। পূজোর সমস্ত আনন্দ মাটি। আমরা রাত জেগে জেগে পাড়ায় পাহারা দিতাম। পুথুনকে নিয়ে বারাসতে গান শেখাতে গিয়ে সঞ্চিতা গেল আটকে। বিড়ায় থেকে গেল পূজোর সময়। যোগাযোগহীন বনগাঁয় সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর অবিরাম সাহায্যে বনগাঁর দুর্গতরা খেয়ে পরে বাঁচলো। বন্যার পর ভাইফোঁটার পর দিন সঞ্চিতার বাবা চন্দ্রকান্তবাবুর সেরিব্রাল অ্যাটাক হলো। ১০ই নভেম্বর তিনি মারা গেলেন। সত্যিকারের রাজনৈতিক সন্ন্যাসী ছিলেন দেবনাথবাবু। মরার আগে চোখ এবং



পরিচালিত ‘উনিশ বিষ’ ছবির কলাকুশলীরা।

দেহ দান করে গিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে। আমি শ্রদ্ধায় আনত। ঐ বছরেই ২০শে ডিসেম্বর মা মারা গেল। ৮২ বছর বয়সে। বাবা-মা বেঁচে থাকতে যথা সম্ভব সেবা যত্ন করেছিলাম আমরা। তাই মৃত্যুর পর ধরা চূড়ো পরে যান্ত্রিক শ্রাদ্ধ করবার প্রয়োজন বোধ করিনি। তা ছাড়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করিনি। তাই প্রথাগত শ্রাদ্ধের অংশিদার হইনি দাদা, ভাইদা আর আমি।



'উনিশ বিষ' ছবিতে পরিচালকের ভূমিকায়।

পরের বছর আর এক বিপত্তি। পুথুনের Class-VIII এর half-yearly তে জঘন্য result হয়। Science group এ বোধহয় পাশও করেনি। ভূগোলেও তথৈবচ। খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। তাহলে কি আমার পরবরিশে ভুল আছে? আসলে আমি ওকে নিয়ে অনেক experiment করেছি। তাই বয়ঃসন্ধির সময় ওরে একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখতে চেয়ে ছিলাম ও নিজে নিজে কত দূর কি করে। কিন্তু যে কোন কারনেই হোক, অন্যমনষ্কতা, অস্থিরতা ওকে গ্রাস করেছিল। যদিও গানে, ছবি আঁকা সবই ভালোভাবেই চলছে। বারাসতে শঙ্কর ঘোষালের কাছে গানেও যথেষ্ট প্রশংসা পায়। এবার আমি ওকে পড়াশোনায় আগ্রহী করার চেষ্টা করলাম। দিনের পর দিন ওকে নিয়ে পড়াশোনার খেলায় মেতে উঠলাম। বিশ্বাস করি 'ছেলে মেয়েদের কাছে বাবা-মার সবচেয়ে বড় উপহার হলো সময়'-তাই আমি আর সঞ্চিতাও ওকে সেই সময়টাই দিলাম। তার ফলও ফললো final-এ। Half-yearly র তিন গুন মার্কস পেয়ে VIII পাশ করলো। তার পর পুথুন কে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাধ্যমিকে ৮০.২৫% (২০০৪), মাধ্যমিকে ৮১% (২০০৬), অনার্স এ ৭২% (J.U.), M.A. তে ৫৭% (J.U.) নিয়ে পাশ করলো পুথুন। এম.এ. পাশ করবার পর পুথুন এবার কি



বাসভবনের সামনের মাঠ ও পড়ানোর বাড়ি- যৌবরাজ্য।



সহকর্মী ও বন্ধু ভরত ও গোপালের সঙ্গে।

পড়বে তাই নিয়ে ধন্দে পরেগিয়েছিলাম আমরা। বি.এড না এম. ফিল? এদিকে ২০১১ সালে বামফ্রন্ট হটিয়ে বাংলায় তখন একচ্ছত্র রানী মমতা ব্যানার্জী। বাংলায় শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিল্প নেই এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা আমরা। যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বাংলায় শিল্প আনার চেষ্টা করেছিলেন তাঁকেই বাংলার মানুষ সিঙ্গুর আন্দোলনের অছিলায় পরাজিত করলো। আপাদমস্তক ভদ্রলোক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যর অসম্ভব গুনমুগ্ধ আমি আর সঞ্চিতা। ব্যক্তিগত ভাবে তাই মনে করি জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালিন রাজ্যকে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে যে পিছিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবু তাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ছিলেন। জ্যোতি বাবুর অকমিউনিস্ট সুলভ জীবন এবং আচরন রাজ্য তথা পার্টির ভিত শিথিল করে দিয়েছিল। বুদ্ধদেববাবু সেই স্থবির রাজ্যে টাটাদের দিয়ে শিল্পস্থাপন করিয়ে বাংলার যুবক যুবতীদের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জী ধ্বংসাত্মক আন্দোলন তা হতে দিল না। বাংলার মানুষ একটা সাইকেল, বেকার ভাতা, জুতো, মোজা আর ক্লাবে ক্লাবে এক লাখ-দু'লাখ টাকার নেশাভাতা পাওয়ার লোভে বামফ্রন্টকে ভিটে ছাড়া করে ছাড়লো।

অবাক হই, যা আমাদের লজ্জার, তাই দিয়েই মমতা ব্যানার্জীর কন্যাশ্রী এখন বিশ্বশ্রী। কটা টাকা ছড়িয়ে স্কুলে নিয়ে আসা, মিড-ডে-মিল দিয়ে স্কুলে নিয়ে আসা এসব তো দেশের লজ্জা। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর ছেলে মেয়েদের খাওয়ার লোভ দেখিয়ে স্কুলে আনতে হচ্ছে। হায়



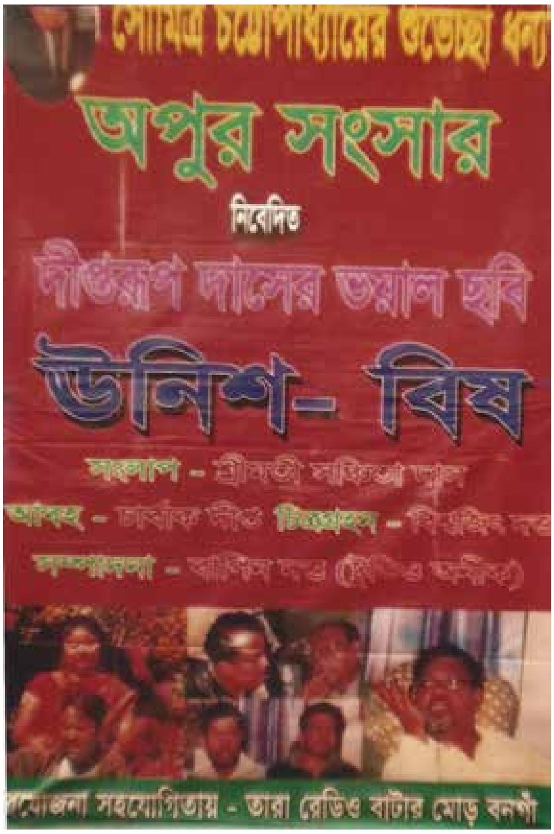
বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে।



পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তে।

রে 'দেশটা ভারতবর্ষ'! ভারতবর্ষের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অযোধ্যার মন্দিরটি মন্দির না মসজিদ? তাই নিয়েই দেশে ভোট নিয়ন্ত্রন, হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় এখন মৌলবাদি সরকার। একদিকে কেন্দ্রে আর একদিকে রাজ্যে একনায়কতন্ত্রের এক একক প্রদর্শনী। চারিদিকে ভয়ের পরিবেশ। কখন কার চাকরী যায়, কখন কার বদলি হয়! এমন আগ্রাসী দল বোধহয় ইন্দিরা গান্ধীও কল্পনা করতে পারেন নি। হিটলারের ক্লোন এই দুই দাদা-দিদি দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাবে ভাবতেও পারি না।

শেষ পর্যন্ত পুথুন বি.এড.-এই ভর্তি হলো আমাদের কথায়। এই একবারই পুথুনকে আমরা চাপ দিয়ে বি.এড. এ ভর্তি করলাম। কারন ওর ভবিষ্যত নিয়ে আমরা খুবই ভাবিত ছিলাম। বিজ্ঞান নিয়ে পড়েনি। কাজেই technical line এ যাওয়ার আশা নেই, তাই M.A., B.Ed. করা থাকলে শিক্ষকতার আশাটা থেকে যায়। অবশ্য এর মধ্যেই পুথুন Tara Muzic এ চাকরী এবং perform করেছে। Time of India-তে, ভারত দর্পন-এ cartoonist এর কাজ করেছে, ঊষা গাঙ্গুলীর টিম 'রঙ্গকর্মী' তে join করেছে। বিভিন্ন টেলিফিল্মে অভিনয় করেছে, মডেলিং করেছে। কিন্তু শিক্ষকতা ওর জন্য নয়। ভায়রা ভাই মলয় বলতো- 'ওর নাম চার্বাক না হয়ে নির্বাক হলে ভালো হত'। B.Ed. এর ক্লাস টিচিং করতে করতে পুথুন চলে গেল দিল্লীতে Henu Studio-তে কাজ নিয়ে। এতদিনে ও নিজের পছন্দের কাজ খুঁজে পেল। আমারও যেমন নেশা আর পেশা এক, পুথুনেরও তেমনি নেশা আর পেশা একই হলো। এখন পুথুন দিল্লীর এগারো জন শিল্পীর মধ্যে একজন। ওর ছবি Flipkart এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিক্রী হয়। দিল্লী-বম্বে-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ওর আঁকা ছবি বেরোয়। বাংলা ইংরেজি খবরের কাগজে ওর সাক্ষাৎকার বেড়োয়। এক কথায় পুথুন একজন সফল শিল্পী। দেশ-বিদেশের Film & Comic Con-এ ওর ছবির প্রদর্শনী ও বিক্রী হয়।



'উনিশ বিষ' ছবির পোস্টার।



রেজিস্ট্রির আগে সঞ্চিতার সাথে।

আমি আর সঞ্চিতাও ওর এই সাফল্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি।

আমাদের বাড়ীতে জন্মদিন পালনের একটা রেওয়াজ ছিল। বাবার জন্মদিন ১৪ই ভাদ্র, মা-র জন্মদিন ১৯শে জৈষ্ঠ্য, দাদার জন্মদিন ২৮শে ভাদ্র, চিনি দাদার জন্মদিন ২৯শে জানুয়ারী, ছোড়দার জন্মদিন ৫ই ভাদ্র, ভাইদার জন্মদিন ৭ই পৌষ, আমার জন্মদিন ১৪ই আশ্বিণ বা ১লা অক্টোবর। আবার পুথুনের জন্মদিন ২৩শে আগস্ট, মনুয়ার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ঋকের ২৪শে মার্চ, টুবলুর জন্মদিন ৫ই ডিসেম্বর। মমতার জন্মদিন দোল পূর্ণিমা, সঞ্চিতার জন্মদিন ২৪শে জুলাই। অসংখ্য জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিয়ের তারিখ আমার মুখস্থ। তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে special পুথুনের জন্মদিন ২৩শে আগষ্ট। বরাবরই ঐ দিনটি আমাদের বাড়ীতে পালন করা হয়। মানে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একটা get-together। বিশেষ করে যেবার পুথুন মাধ্যমিক পাশ করলো সেবার ঘটা করে জন্মদিন পালন করা হলো। ছাদে candle light dinner। সে এক এলাহি ব্যবস্থা। সে বছরই আমি 'আর্থিক ভাবে স্বাধীন' পুথুনকে panasonic এর video camera কিনে দিলাম। আবার যেবারে ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলো সে বছর গুরু পূর্ণিমার দিন পুথুনের সমস্ত শিক্ষককে নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। সবার আশীর্বাদেই তো পুথুন আজকের চার্বাক দীপ্ত। আমাদের কোলকাতার ফ্ল্যাটেও ওর জন্মদিন পালন করা হয়েছিল কয়েকবার। আত্মীয় স্বজন মুখরিত আমাদের ফ্ল্যাট সেদিন গুলো ছিল চাঁদের বাড়ী। এমনকি '১৩ সালে যখন পুথুন দিল্লীতে সে বছরও আমরা পালন করলাম আমাদের বাবা-মা হওয়ার ২৫ বছর পূর্তি। ২৫ জনকে নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। অবাক বিস্ময়ে বন্ধুরা খুব মজা পেয়েছিল উৎসবে যোগ দিয়ে।



রেজিস্ট্রির মুহূর্তে।

বরাবরই আমাদের বাড়ী উৎসবের বাড়ী। বাবা স্বল্প আয়ের মধ্যেও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ করতে ভালবাসতো। এই রকম পরিবেশে বড় হয়ে



প্রিয় শিক্ষক মনি মণ্ডলের সাথে।

আমরাও অনুষ্ঠানে পিছপা হইনি। সে জন্মদিন হোক, মুখেভাত হোক, লক্ষ্মী পুজো হোক আর সরস্বতী পুজোই হোক। সরস্বতী পুজোয় অবশ্য আমরা বেশী ব্যস্ত থাকতাম বীণাপানি টিউটোরিয়ালে। সেখানকার পুজোয় অভ্যস্ত হয়েই আমাদের যৌবরাজ্যে শুরু হলো সারস্বত উৎসব। পূজা বা ধর্ম কোন কিছুই মানি না। কিন্তু উৎসবকে গুরুত্ব দিই। এই উৎসবের মাধ্যমেই নবীন-প্রবীনের মধ্যে চলে ভাব বিনিময়। ঐ দিন পুরোনো-নতুন সব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজেকে ভিড়িয়ে দিয়ে সতেজতা অনুভব করি। আসলে আমার মনে হয় আর্যরা প্রথম সভ্যতার যুগে জীবনের প্রয়োজনে যা কিছু লাগে, প্রকৃতির সেই সব কটিকেই দেবতার রূপ দিয়েছিল। জল, বাতাস, আগুন, বিদ্যা, ধন, যুদ্ধ, বাণিজ্য, স্থাপত্য, পোষ্য, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এমনকি নদ-নদী, গাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা সব কিছুকেই দেবতার রূপ দিয়েছিল এবং নিজেদের রূপে অনুরূপ দেবতাদের রূপধারণ করতে বাধ্য করেছিল। প্রকৃতিকে পুজো করাই আসলে ভিন্ন রূপে দেবতার পূজা। কালিকে আমার অনার্য দেবতা বলেই মনে হয়, যদিও যে কোন কারনেই হোক কালি আর্য দেবতার মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছে। আজ যখন শিক্ষিত মননশীল লোককেও দেবতার সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করতে দেখি তখন অবাক হয়ে ভাবি এদেশেরই সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শঙ্করাচার্য বলে গেছেন 'পূজা-উপাসনা' ইত্যাদি মূর্খের কাজ, কারন ব্রহ্ম প্রকৃতি এক এবং অদ্বিতীয়। সমস্ত সভা এক ব্রহ্ম বা প্রকৃতির প্রতিরূপ। আসলে ভারতবর্ষ হলো ধর্মের দেশ। বেদ-পুরান-গীতায় আচ্ছন্ন ভাগ্য বিড়ম্বিত তৃতীয় বিশ্বের দেশে মানুষ আশ্রয় করে দেবতাকে। তাই কুসংস্কার, গোঁড়ামি, আত্মার জন্মান্তর, জ্যোতিষ এদেশে গেড়ে বসেছে। সেই সুযোগ নিয়েই ধর্মের কান্ডারীরা, সাধুবাবার জ্যোতিষীরা ধনী থেকে ধনীতর হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত। ভাগ্যবশতঃ আমাদের যাবতীয় গতিবিধি এবং তা নিয়ন্ত্রন করছে জাতকের জন্মরাশি, লগ্ন। আমার সহজ প্রশ্ন ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ যখন রবীন্দ্রনাথ জন্মান তখন নিশ্চিত ডাবেই এই কলকাতাতেই আরও কয়েকজন জন্মেছিলেন। তাহলে ইং ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ নিচ্ছিলেন তখন



মা প্রতিমা দাসকে প্রণাম।



মালাবদলের মুহূর্তে।

তাঁরা কি করছিলেন? তাঁদেরও তো জন্ম সময় অনুযায়ী নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা। একথা বলাতে রবীন্দ্রভারতীর এক অধ্যাপক বলেছিলেন - 'বোকার মতো কথা বলেন কেন? Lattitude, Longitude বোঝেন না?' অর্থাৎ এখানে যে জন্মালো দুটো বাড়ী পরে জন্মালে ভাগ্য পরিবর্তিত হবে? আসলে জেনেটিক্সটাকে বাদ দিয়ে রত্ন ব্যবসায়ীরা নিজেদের মতো যুক্তি সাজিয়েছেন। এসবের বিরুদ্ধেই '৯১ সালে আমরা মানে আমি, সুবীর, সুকান্ত, সঞ্জয়, শ্যামল তৈরী করলাম 'বনগাঁ সায়েন্স ক্লাব', ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি শাখা। বিভিন্ন জায়গায় আমরা 'অলৌকিক নয় লৌকিক' অনুষ্ঠান করতাম। একবার চার ঘাটেও ওদের নিয়ে গেছিলাম। তার পরেই চারঘাটে অন্ততঃ কিছু ছেলেকে যুক্তিবাদের সৈনিক তৈরী করতে পেরেছিলাম।

যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসবে নতুন-পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের বিমল আনন্দে মুখরিত হতো উৎসবের আঙ্গিনা। সন্ধ্যা বেলায় হতো সঞ্চিতার গানের স্কুল 'ঘরাণা'র উৎসব। সঞ্চিতা Calcutta University থেকে Hons. প্রেসিডেন্সি থেকে এম.এ., বি.এড. পাশ। চাকরী পাওয়া বোধহয় সেই সময় খুব কঠিন হতো না। এমনকি একবার বেলুড় স্কুলে চাকরী প্রায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি চাইনি ও চাকরী করুক। বস্তুতঃ আমি দুজন চাকরী করার বিপক্ষেই। ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এক দিকে দু'জন চাকরী অন্যদিকে চাকরীহীন হাজার হাজার পরিবার এক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ তখন এস.এস.সি. চালু হয়নি। তখন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও অন্য আরও কিছু যোগ্যতা থাকতে হতো। আমি চাইনি, যখন আমি একটি চাকরী করছি তখন আমারই স্ত্রীকে স্কুলে অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত সম্পাদক ধরে চাকরী পাওয়াতে, যেখানে পাশের পরিবারেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দুজনেই বেকার। ভুল করেছি কিনা জানি না আমরা। তবু আজও পর্যন্ত একই চিন্তা ভাবনা আমাদের। সঞ্চিতা অবশ্য বেকার নয়, রীতিমত গানের দিদিমনি। 'ঘরাণা' ওর গানের স্কুলের নাম। আজও দক্ষতার সঙ্গে গান শিখিয়ে চলেছে।



বিবাহের মুহূর্তে।

২০০৪ সালে পুথুনের মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে আমরা আর নিখিলদারা



সিঁদুর দানের মুহূর্তে।

গেলাম সিকিম বেড়াতে। বরফে ঘেরা নাথুলা, বাবা মন্দির, ছাঙ্গুলেক আমাদের যুগ্ধ করেছিল। আবার পুজোর সময় গেলাম 'ভারত দর্শন' ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে রাজস্থান, আগ্রা। সত্যি বলতে কি রাজস্থান আমার সবচেয়ে ভালো লাগা রাজ্য। এত কালারফুল রাজ্য মনে হয় ভারতবর্ষে আর নেই। দুর্গ দিয়ে, পাহাড় দিয়ে, মরুভূমি দিয়ে এই রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা রোমাঞ্চিত হলাম।

২০০৬ সালে আবার পুজোর সময় বেড়াতে গেলাম হায়দ্রাবাদ, ভাইজ্যাগ, আরাকু, জগদলপুর। কুন্ডু তীর্থ স্পেশালের সঙ্গে। এখানেই আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো কৃষ্ণনগরের ডাক্তারবাবু সমীর চৌধুরী আর পিয়াদের সঙ্গে। এখনও ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট।

২০০৬ সালে পুথুন প্রথমে আশুতোষ কলেজে ভূগোলে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ভূগোল ওর cup of tea না হওয়াতে পরের বছর ২০০৭ সালে প্রথমে ইংরাজী অনার্স নিয়ে South City College এ ভর্তি হলেও শেষতঃ Jadavpur University-তে Philosophy অনার্স নিয়ে ভর্তি হলো। প্রথমে হরিদেবপুরে তপন পালের বাড়ীতে paying guest থাকলেও শেষ পর্যন্ত টালিগঞ্জ সোদপুরে একটি 1BHK flat কেনা হলো। ২০০৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ঐ ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ করলাম। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে 3rd January, 2007 এ আত্মীয় স্বজন, ফ্ল্যাটবাসীদের নতুন ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রন করা হলো। ফ্ল্যাটে কয়েক বছর আমাদের জীবনের কয়েকটি সুখের বছর। মাঝে মাঝেই ফ্লাটে শুয়ে চারিদিক দেখতাম। এ শুধু আমার। পুজোর সময় কয়েক বছর কাটিয়ে ছিলাম ফ্ল্যাটে। সে এক স্বর্গ সুখ। পুজোর দিন গুলোতে বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন আসতো ফ্ল্যাটে। বিকালে বেড়িয়ে পড়তাম নাটক, সিনেমা দেখতে।
অষ্টমীতে লঞ্চে করে 'গঙ্গা জলে দুর্গা পূজা' উপভোগ করতাম। সারা দিন ঘুরে বেড়াতাম আর ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর পুকুর হোম ডেলিভারি থেকে দিয়ে যাওয়া গরম গরম খাবার!
বেড়াতে যাওয়া আর হোটেলে খাওয়ার সুখ ফ্ল্যাটে বসেই পেতাম। একাদশীর দিন সকাল বেলায় আমি আর সঞ্চিতা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম ভিডিও ক্যামেরা সহ বিভিন্ন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। সত্যি কথা বলতে কি বনগাঁর দুর্গা পুজো কখনো আমাদের টানেনি। কোলকাতার অলিতে গলিতে যেসব স্থাপত্য দেখেছি তার তুলনায় বনগাঁর পুজোগুলোকে বালখিল্য বলে



বিয়ের পর শ্বশুর শাশুড়ির সাথে শ্বশুরবাড়ি বিড়ায়।


বিয়ের পর।

মনে হতো। যে সব প্যান্ডেল দেখেছি তাদের মধ্যে অজেয় সংহতি, বড়িষা, বিবেকান্দ সংঘ, বিশেষ করে বেহালা নূতন দলের পুজা মন্ডপ আমাদের মুগ্ধ করতো। পরে অবশ্য পুথুন দিল্লী চলে যাওয়ার পর ফ্ল্যাট রনদেব ব্যানার্জী নামে এক ভদ্রলোকের কাছে বিক্রী করে দিলাম।

২০০৯ সালে আমাদের ২৫তম বিবাহ বার্ষিকীতে বনগাঁ বিনোদ কমিউনিটি হলে শ্রমিক পাঠাগারে আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'এক সন্ধ্যায় একা চার্বাক'। পুথুন রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান, সুফি গান, রাগসঙ্গীত, রাজস্থানী সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতে দর্শকদের মাতোয়ারা করে দিল। ওকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন সস্ত্রীক সুদিন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষাল এবং প্রদীপ মজুমদার। অনুষ্ঠানের মাঝখানে পুথুনের তৈরী ডকু-ফিল্ম 'Life on Spin' দেখানো হলো। লোকাল পত্রিকা 'সীমান্ত বাংলা' এবং 'বনগাঁ লোকাল'-এ ওর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল।

২০১০ সালের প্রথমেই একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। ৩রা জানুয়ারী আমাদের বিবাহের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। আমাদের দিদি-দাদা সবাই ২৫ বছর বিবাহ বার্ষিকী করেছিল। চিনি দাদা অনুষ্ঠান করেছিল Grand Hotel এ। সে এক এলাহি ব্যাপার। ছোড়দা বনগাঁতেই বিশাল করে বিবাহ বার্ষিকী করেছিল। প্রথম থেকেই আমি অন্যভাবে অনুষ্ঠান করার কথা ভেবেছিলাম। এক তো গত বছর পুথুনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এ বছর অভিনব কার্ড দিয়ে ২৫টি পরিবারকে নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। এছাড়া আমি নিজ হাতে গত ২৫ বছরের এক সালতামামি 'Journey to the Silver Candle' নামে ভিডিও ফিল্ম করেছিলাম। Projecter এর সাহায্যে সেটি এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রিত couple এর slide ফিল্ম পর্দায় দেখানো হয়েছিল। Candle light dinner সহ সেই musical night সবাইকে অভিভূত করেছিল। পিয়া তো বলেই ফেললো 'তোমরা কম করে কিছু ভাবতে পারো না'। রামপদ কোন অনুষ্ঠানে খাওয়া ছাড়া কিছু করে না, এখানে ৬টা থেকে শেষ পর্যন্ত Mozart এর সুর মূর্ছনা সহ show উপভোগ করেছিল। শঙ্কর দামও সারা বনগাঁয় অনুষ্ঠানের কথা বলে বেড়িয়েছিল।

প্রকৃতির নিয়মে বিশ্বাস করি। এই প্রকৃতির রাজ্যে চিনি খেলে মিষ্টি লাগবেই, নুন খেলে নোনতা লাগবেই। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবেই। সুপ্রিয়দার তদ্বিরে বহু বছর ধরেই বদলির চেষ্টা চলছিল কিন্তু বনগাঁ ইউনিয়নের কর্তারা সুপ্রিয়দার সঙ্গে বিরোধ


বৌভাত অনুষ্ঠানে।



বৌভাত অনুষ্ঠানে।

হেতু কিছুতেই আমাকে বনগাঁয় আসতে দিচ্ছিল না। একজনতে বলেই ছিল - দীপ্তরূপ আমার লাইব্রেরীতে আসলে আমি সুইসাইড করবো। আসলে কাগজপত্রে তার একটু অসুবিধা ছিল। একদিন এক ভদ্রলোক যিনি মূলতঃ আমার আসার বিরোধিতা করতেন তিনি আসলেন ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে পড়াতে। কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর আমাকে মাইনে জিজ্ঞাসা করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় গান্ধীজি ভর করলেন। আমি মাইনে নিতে অস্বীকার করলাম। তারপর থেকে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সম্পর্কই হলো। একদিন ট্রেনে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন বনগাঁয় আসার ইচ্ছা আছে? আমি সম্মতি জানাতে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তখন নবীন পাঠাগারে কোন librarian নেই। আমি আশায় দিন গুনছি। এর মধ্যে সুপ্রিয় চক্রবর্তী বদলি হলো নৈহাটিতে। শ্রমিক পাঠাগার ফাঁকা। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক পাঠাগারেই আমার transfer হলো। ২০১১ সালের ১৯শে জানুয়ারী জ্যোতির্ময় বাবুর হাত থেকে চাবি নিয়ে join করলাম। ২৪ বছর চাকরী করেছি চারঘাট যোগেশ পাঠাগারে। মছলন্দপুর থেকে ৭ কি.মি. ভিতরে চারঘাটের ব্রাহ্মন পাড়ায় লাইব্রেরী। একা একা চাকরী করতাম। কিছু দিন পর peon হয়ে আসলো লক্ষ্মীকান্ত মন্ডল। কৈলাশরা ওকে ডাকতো- অলক্ষ্মীদা লক্ষ্মীদা চলে যাওয়ার পর এসেছিল সুশীল মজুমদার। সত্যি কথাকি চারঘাটের ছেলেদের মত রসিক আমি আর দেখিনি। ‘গালে পাম’, ‘হেল্‌থ মিনিষ্টার’ এই সব ছিল এদের ‘ডাকনাম’। মোবাইলের প্রথমযুগে বা বলতো ‘চারঘাটে মোবাইল কিনলে মই ফ্রি’। চেহারার অনুসঙ্গে সম্বিত আমাকে ডাকতো ‘আয়ু-উ-ব বলে।

বই আগেও পড়তাম কিন্তু চারঘাটের লাইব্রেরী যেন আমাকে জানলা দরজা খুলে দিল বই এর রাজপ্রাসাদের। ট্রেনের সহযাত্রী সজল চক্রবর্তী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নারায়ণ সান্যালের বই-এর সঙ্গে। প্রথম পড়লাম ‘পয়োমুখম’। পড়ে তো আমি হতবাক। তার পরে একে একে পড়লাম ‘সত্যকাম’, ‘প্যারাবোলা স্যার ’, ‘লাডলি বেগম’, ‘পাষন্ড পন্ডিত’, ‘গজমুক্তা’, ‘পঞ্চাশোর্ধে’- কত নাম বলবো! সত্যজিৎ রায়, সুনীল গাঙ্গুলী, বুদ্ধদেব গুহ, প্রবীর ঘোষ এদের লেখা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছি লাইব্রেরীতে বসে বসে। নারায়ণ সান্যালের নিরপেক্ষতা, সুনীল গাঙ্গুলীর রোমান্টিকতা-ধর্মহীনতা, বুদ্ধদেব গুহর



বৌভাত অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সাথে।



ফুলশয্যায়।

ঋজুতা, সমরেশ মজুমদারের সহজ মনঃসমীক্ষা, প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদ, শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে গল্পে মজে থাকতাম তখন। মহাভারত চিরকালই আমার প্রিয়তম গ্রন্থ। ছোট বেলায় পড়েছি সুবোধ চন্দ্র মজুমদারের ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত। পরে পড়লাম বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর রামায়ণ মহাভারত। এক অদ্ভুত আধুনিক রামায়ণ-মহাভারত মন ভালো করে দিত। নারায়ণ সান্যালের 'হংসেশ্বরী' আর সুনীল গাঙ্গুলীর 'রাধা-কৃষ্ণ' আমাকে বিমোহিত করেছিল এদের রোমান্টিক আবেদনে। কতজনকে যে এই বই দুটো উপহার দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

শ্রমিক পাঠাগারে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ। সম্পাদক 'গণশক্তি'র অলোক বিশ্বাস। আমি join করার কিছু দিনের মধ্যে assistant হিসাবে join করলো অরুনদার ছেলে কুন্তল। কিছুটা অস্থির হলেও কুন্তল আমার খুবই অনুগত। মমতা ব্যানার্জীর ঢক্কানিনাদে মোহিত হয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ আরও একবার '১৬ সালে মমতা ব্যানার্জীকেই নির্বাচিত করলো। বামফ্রন্ট প্রকৃত অর্থেই ধুলিসাৎ হয়েগেল। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিল্প নেই অথচ বিজ্ঞাপন সর্বস্ব এই সরকার উন্নয়নের জয়গান গেয়েই চলেছে। বৈকোলার রবীন্দ্র পাঠাগারের একমাত্র সলতে কুমুদদা retire করার পর আমাকে deputation-এ পাঠানো হলো সেখানে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাল অত্যন্ত সুভদ্র এই ছেলেটি সাদরে আমাকে গ্রহণ করলো। ওরই আন্তরিক সদিচ্ছায় লাইব্রেরীটি বিশালকায় হয়েছে। পড়ুয়া কমিটিই লাইব্রেরী চালায়। আমি শুধু দুই দিন গিয়ে ক্যাশবুক আর ষ্টক বুক সামলাই।

সারস্বত উৎসবে আমাদের যৌবরাজ্য থেকে 'নিশ্চিন্দিপুর' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ২৫ বছর পর '১৭ সালে আমার সম্পাদনায় আর সুশোভনের চেষ্টায় 'বাছাই নিশ্চিন্দিপুর' বের করা হলো। এর সমস্ত কৃতিত্ব তরুন কবি সুশোভনের। পুথুনের তোলা ছবি Cover করে অসাধারন কিছু লেখায় সমৃদ্ধ এই বইটি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল মুখোপাধ্যায়, সুদিন চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত দেবনাথ, দীপক বিহারী বোসের লেখাগুলো অত্যন্ত প্রশংসিত হলো।



ফুলশয্যায়।

পুনশ্চ



সস্ত্রীক কোনো এক অনুষ্ঠানে।

পুথুন দিল্লী যাওয়ার পরে আমাদের আর একটা ঘর দিল্লী। দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কে পুথুন থাকে। ওখানে যাওয়ার পরেই '১৩ সালের ৬ই মে আমরা দিল্লী গেলাম দুরন্ত এক্সপ্রেসে। এই প্রথম আমাদের এ.সি. গাড়িতে চড়া। তার পর থেকে প্রতিবছরই প্রায় দু'বার করে দিল্লী যেতে হয় আমাদের। এর মধ্যে চারবার প্লেনে করে গিয়েছি। প্লেনে করে যাওয়া আমার কাছে রোমাঞ্চকর। সত্যিকথা কি, দায়ে পড়ে বড়লোক হয়েছি আমরা। পুথুনের অসুস্থতার কারনে দু'বারই তাড়াহুড়ো করে প্লেন ধরেছি। সেই জন্য প্লেনের যাত্রা সেভাবে উপভোগ করতে পারিনি। বরঞ্চ দুরন্ত বা রাজধানীতে যাওয়া আসায় আমি বেশী স্বচ্ছন্দ। চিত্তরঞ্জন পার্কও আমার কাছে খুবই প্রিয়। চারদিকে বাংলায় কথা, বাংলা গান, বাংলা বই, বাংলার মিষ্টিতে বাংলার সৌরভ মিশে রয়েছে। মনেই হয় না বাংলার বাইরে রয়েছি।

দিল্লী আর বন্ধুদের সাহচর্যে আমার দিন যাপন এখন বড়ই সুখের। শ্যামল - শ্যামলেন্দু - সৌরেনদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক আড্ডা, সপ্তাহে দু'দিন দিলীপদা - নিখিলদা - সুকুমারদা - প্রণবদার সঙ্গে তাসখেলা করে আর রামপ্রসাদদা এবং বংশীদার সঙ্গে সরস আলাপে আনন্দেই দিন কাটে। বন্ধুদের কথা বলায় যাদের কথা না বললেই নয় তারা হলেন সনৎ বাবু আর শেলী বৌদি, দেবগড় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। ওদের ছেলে মেয়ে সপ্তক আর গজান দু'জনেই আমার ছাত্র-ছাত্রী। গজান তো আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। ওদের পরিবারটাই এত সংস্কৃতি সম্পন্ন, রুচিশীল এবং অতিথি বৎসল যে, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এখন ওরা দুর্গানগরে থাকে। খুব মিস করি আমরা ওদের।



দাদার বিয়েতে।



দাদার বিয়েতে।

আলাপ করিয়ে দিই

বাবা - মাখন লাল দাস, ১৯৮৯ সালে প্রয়াত হন।

মা - প্রতিমা দাস, ২০০০ সালে প্রয়াত হন।

বড়দি - শ্রীমতী আবৃতি দত্ত, স্বামী রমেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত।

দিদি - শ্রীমতী সুকৃতি দাস, স্বামী সুনীল দাস।

দাদা - তড়িৎ কুমার দাস ২০০৫ সালে প্রয়াত হন।

বৌদি - লাবলি দাস এখন বালিগঞ্জে থাকে, মেয়ে-জামাই-নাতনী নিয়ে সুখে আছে।

ডাবলু - আমার ভাগ্নে বৌ-ছেলে নিয়ে চন্ডীগড়ে থাকে।

চিনি দাদা- সরিৎ কুমার দাস ২০১৬ সালে প্রয়াত হন।

সুভনদি-মেজ বৌদি, কুমুদিনী স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা। ছেলে-বৌ নিয়ে বিরাটী থাকে।

ছোড়দা - বিদুৎ কুমার দাস, রনঘাট স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক।

স্বপ্না - ছোড়দার বৌ।

ভাইদা - প্রদ্যুৎ কুমার দাস, ইংরাজীর শিক্ষক।

মমতা - ভাইদার বৌ, বাংলার শিক্ষক।

নিখিলদা - নিখিলেন্দু বিশ্বাস, বনগাঁ হাই স্কুলের শিক্ষক।



দাদার বিয়েতে এক বন্ধুর সাথে।



দাদার বিয়েতে ছেলে, মা ও স্ত্রীয়ের সাথে।

দিলীপদা - দিলীপ ঘোষ, বনগাঁ হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক।

সুকুমারদা - সুকুমার সাহা, ঘোষ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক।

প্রণবদা - প্রণব মিত্র, বনগাঁ হাই স্কুলের শিক্ষক।

বংশীদা - বংশী বদন কর্মকার, পুরাতন বনগাঁ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

শ্যামল - শ্যামল বিশ্বাস, রেলকর্মচারী, বাগুইহাটীতে বৌ রত্নাকে নিয়ে সুখে আছে।

শ্যামলেন্দু- শ্যামলেন্দু সিনহা, ব্যাঙ্ক কর্মী, বাগুইহাটিতে বৌ বন্দনাকে নিয়ে সুখে আছে।

সৌরেন- সৌরেন্দ্র মুখার্জী, P&T কর্মী, রিষড়ায় বৌ কৃষ্ণাকে নিয়ে সুখে আছে।

রামপ্রসাদদা- রামপ্রসাদ দেবনাথ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বই প্রেমী।

পুলক- পুলক পাল, বই ব্যবসায়ি এবং নাট্যপ্রেমী।

টপু- দেবাশিস দাস, নাট্যপ্রেমী।

এন্টনী- সন্দীপ রায়, ব্যবহারজীবি এবং নাট্যপ্রেমী।

পাপাই- সঞ্জয় বোস, সংস্কৃতিপ্রেমী। এখন বারাসাত থাকে।

মনুয়া- নীলাজ দাস। আমার ভাইপো এখন চিত্র পরিচালক।

ঋক- শ্বেতাজ দাস। আমার ভাইপো।

গুলু - বিহঙ্গ দূত। আমার ভাইপো। অনার্স, এম.এ. বি.এড. এম.ফিল.।



ছুটিতে রৌরকেলায় পরিবার ও আত্মীয়দের সাথে।



ছুটিতে রৌরকেলায় পরিবার ও আত্মীয়দের সাথে।

অপুর সংসার

ছোটবেলা থেকে নাটক-আবৃত্তি করলেও একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিল ফিল্ম পরিচালনা করার। ’৯১ সালে আমার ভাগ্নে ডাবলু একদিন বললো ‘তুমি তো নাটক করো, সেইটাকেই ভিডিও ফিল্মে তুলে রাখতে পারো’। আমার মনে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠলো। শুরু হলো আমার নবতম নেশা। দেশ পত্রিকায় বেরিয়ে ছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘সুন্দর’ নাটকটা। আমার খুব পছন্দের নাটক ওটা। এক অফিস ভর্তি সব কুৎসিত লোক। সেখানে একটি মেয়ে গিয়ে পাত্তাই পাচ্ছিল না। চাকুরীপ্রার্থী সে। এই সময় একটি ছেলে, সৌরভ সেখানে উপস্থিত। মেয়েটিকে সে বুদ্ধি দিল সবাইকে সুন্দর বলতে। এতে মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে তাই করলো। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এখন অভিনয় করবে কে? আমি, মিহির তো আছিই। আর এক রূপের কাঁঠাল পুলকের সঙ্গে কথা হলো। পুলকও রাজি। আমি ঠিকই করে রেখেছিলাম, কোনও রিয়াল নায়ক নায়িকাকে নেব। ঠিক করা হলো সঞ্জীব রাহা আর স্বপ্না হোড়কে। দুই একদিন শুটিং হলো। কিন্তু সঞ্জীব-স্বপ্নার বায়নাক্কায় শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত দেওয়া হলো। আবার গাড্ডায় পড়া গেল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বজিৎ-ডালিয়াকে বাছা হলো। দিন পাঁচ-ছয় ধরে শুটিং করা হলো। ক্যামেরা ধরলো মিহিরের সহকারি জয়দেব। ডাবিং করার দরকার ছিল। মিহিরদের বাড়ীতে বসে ডাবিং করা হলো। ফিল্ম হলো বটে, কিন্তু প্রতিবন্ধী। শট বিভাজন ভালো না, মুখের সঙ্গে কথা মিলছে না। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। সে ছবি আমার মোটেই মনঃপুত হয়নি, সেটিকে সংরক্ষনও করা হয়নি। কোথায় আছে তাও আর খেয়াল নেই আজ।

’৯২ সাল ফেলুদার ২৫ বছর পূর্তি। আগের বছর সত্যজিৎ রায় মারা গেছেন। আমাদের সবার প্রিয় ফেলুদা। ঠিক হলো ফেলুদার গল্প নিয়ে ফিল্ম হবে। ফেলুদা ঠিক করা হলো রুদ্রকে, জটায়ু পুলক, তোপসে হবে রাজা আর



বনগাঁর বাড়িতে সপরিবারে।



পেয়াদাপাড়ার বাড়িতে।

আছি আমি, সুকুমারদা, শঙ্কর দাম, শ্যামল বোস, সুশোভন প্রামাণিক, বংশীদা, এন্টনি, পাপাই, দাসু এবং বৈশাখী। বৈশাখীর কথা লিখতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে যাচ্ছে। নাটক নিয়ে এম.এ. পাশ বৈশাখী বনগাঁর নাট্য জগতে এক বিশেষ নাম ছিল। ২০১২ সালের ৬ই মে বৈশাখী এক গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট এ মারা যায়। অনেক ঝাড়াই বাছাই করে গল্প ঠিক হলো গোঁসাইপুর সরগরম। গোঁসাইপুরে গিয়ে এক ভন্ড সাধুবাবার কারসাজি ধরে ফেলে ফেলুদা। অত্যাশ্চর্য মেক-আপে সুকুমারদা ভণ্ড সাধুর অভিনয় করেছিল। মনে আছে যে দিন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর আমাদের শুটিং শুরু হয়। সন্ধ্যাবেলায় শুটিং শেষে সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা শুনলাম।

শুটিং হয়েছিল আমাদের বাড়ী, রাজাদের বাড়ী, ছয়ঘরিয়ার ভাঙা মন্দিরে। দ্বিতীয়দিনই বিপত্তি। পুলক গেছে পুরীতে। অগত্যা সুকুমারদাকে মাথায় উইগ পরিয়ে অন্ধকারে জটায়ুর অভিনয় করিয়ে নেওয়া গেল। যে সব জায়গায় ছবি তোলা হয়েছিল তার কিছুই এখন আর সেরকম নেই। বড় বড় বিল্ডিং উঠে গেছে, মায় একটা পুকুর পর্যন্ত উবে গেছে। এডিটিং হলো মিহিরের বাড়ী। মিউজিক হলো নতুন কেনা কি-বোর্ডে। সবাই নতুন। এডিটিং অত্যন্ত খারাপ হলো। Dialogue এর আগে পিছে start আর cut ধ্বনিমাধুর্যে ফিল্মের আমেজটাই গেল নষ্ট হয়ে। পরের বছর সরস্বতী পুজার দিন আমাদের যৌবরাজ্যে প্রদর্শিত হলো। এক রাশ সমালোচনা দিয়ে শুরু হলো আমাদের প্রথম পথ চলা।

১৪০০ সালের পয়লা বৈশাখ আমার আর পুলকের উদ্যোগে তৈরী হলো 'অপুর সংসার'। আমরা যারা বনগাঁয় বিশ্ববরেণ্য অভিনেতা, কবি, পরিচালক, আবৃত্তিকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের গুনমুগ্ধ তাদের সংগঠন এই 'অপুর সংসার'। আমাদের প্রথম নাটক প্রয়োজনা হলো মনোজ মিত্রের লেখা নাটক মহাবিদ্যা। অভিনয় করলো পুলক, সুকুমারদা, এন্টনি, রুদ্র এবং পাপাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হলো বনগাঁ হাই স্কুলের হল ঘরে। হল ভর্তি দর্শকের কাছে সমাদৃত হয়েছিল নাটকটা। নতুন আঙ্গিকে পুলকের পরিচালনা দর্শকদের সমীহ আদায় করে নিল অপুর সংসার। এই বছরই অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে ফিল্ম হল 'ভুডো'। যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা প্রবীর ঘোষের লেখা গল্পের চিত্রনাট্য



কোনারকের সূর্য মন্দিরে সপরিবারে।



ছুটির মেজাজে।

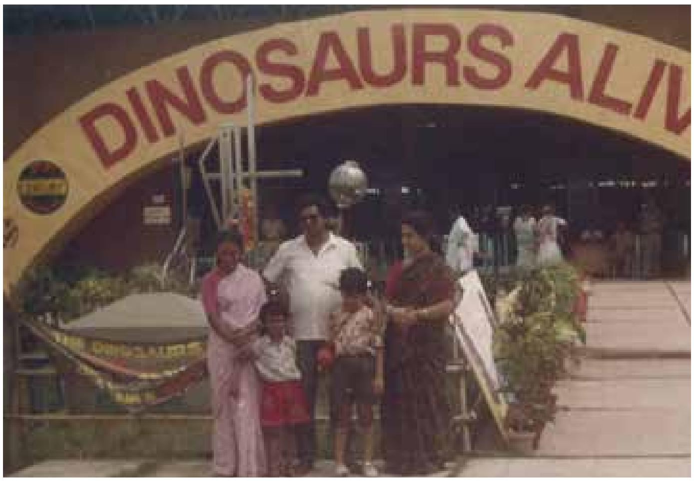
তৈরী করে দিল সঞ্চিতা। নায়ক পিনাকী কিভাবে এক ডাইনি সম্রাজ্ঞীর জালিয়াতী ফাঁস করে দিল তাই নিয়ে এই গল্প। অভিনয় করলাম আমি সঞ্চিতা, এন্টনি, রুদ্র, বৈশাখী, ধৃতিমান, নিমাই বিশ্বাসরা।

১০ই ডিসেম্বর আমার জীবনের একটা বিশেষ দিন। ঐ দিন সৌমিত্র বাবু প্রতাপগড় মাঠে এসেছিলে একটা One Wall থিয়েটার করতে। আমি আর পুলক গিয়ে দেখা করলাম ওনার সঙ্গে। সাথে নিয়ে গেলাম 'বলরাজ সাহানির' একটি জীবনী। আমাদের আশীর্বাদ করে উনি লিখে দিলেন একটি শুভেচ্ছাপত্র। ব্যাস, ঐ শুরু। তার পর থেকে ওনার সঙ্গে আমার নিরন্তর সখ্য। '১৩ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর ১৯শে জানুযারী, ওঁর জন্মদিনে আমি হাজির হতাম ওঁর গল্ফগ্রিনের বাড়ীতে। সঙ্গে থাকতো ফুল, বই আর বনগাঁর সন্দেশ। এত বড় মাপের অথচ এত সুভদ্র মানুষ আর কাউকে দেখিনি। প্রতিবছর জন্মদিনে উনি আমাকে উপহার দিতেন নিজে হাতে লিখে একটি কবিতা। সেইটি ছাপা হতো সারস্বত উৎসবে প্রকাশিত আমাদের পত্রিকায়। যেখানে বনগাঁর কোন মাষ্টার মহায়ের বাড়ীতে গেলেও চলে আসার সময় 'যাচ্ছি' বললে সিরিয়াল দেখতে দেখতে বলেন 'আচ্ছা যাও'। সেখানে সৌমিত্র বাবু প্রত্যেকবার নিজে দরজা খোলেন এবং আসবার সময় যতক্ষন না বেরিয়ে আসছি ততক্ষন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। একবার শুধু বললেন 'আমার একটা শ্যুটিং এর তাড়া আছে, আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি'। বোঝ কান্ড। সৌমিত্র বাবু আমার কাছে অনুমতি চাইছেন! এও এক শিক্ষনীয় বিষয়। একটা মানুষ শুধু শুধু বড় হন না। শুনেছি সত্যজিৎ রায় ও নাকি এইভাবেই দরজা নিজে খুলতেন। তাড়া থাকাতে সৌমিত্র বাবু একবার আমাকে আর রুদ্রকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে কবিতাটি লিখে দিলেন। বাড়ীতে স্ত্রী অসুস্থ থাকলেও উনি নিজে চা করে এনে আমাদের খাওয়াতেন। আমরা তো মনে মনে কৃতার্থ হতাম। বিভিন্ন সময়ে আমার সঙ্গে যেত পুলক, শান্তনু, পাপাই, এন্টনি, রাজু, রাজন, বাপ্পা, সুরঞ্জন।

আর এক বিশ্ববরেণ্য লোকের বাড়ী গিয়ে ধন্য হয়েছিলাম। বিশপ লেফ্রয় রোডে। সত্যজিৎ রায় জন্মজয়ন্তীতে নিমন্ত্রণ করতে যেতাম শ্রীমতী বিজয়া রায়, সন্দীপ রায়কে। প্রত্যেক বারই সন্দীপ বাবু না হয় বিজয়া দেবী আমাদের শুভেচ্ছাবাণী



ছুটির মেজাজে সপরিবারে।



কলকাতার সাইন্স সিটিতে।

দিতেন। অবাক বিস্ময়ে দেখতাম আমাদের কাছে সুকুমার রায়ের ছবি, কিন্তু সন্দীপ রায়ের কাছে দাদুর ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। সারা ভারতের লোকেরা যা দেখতে পারলে ধন্য সেই অস্কার পুরস্কারটা আমরা মানে আমি, ভাইদা, পাপাই হাতে নিয়েছি। বিজয়া দেবীকে বললাম 'কাকিমা, সমস্ত পুরস্কারগুলো কি বাড়ীতে আছে?' উনি উত্তর দিলেন 'সবগুলোই ব্যাঙ্কের ভল্টে আছে। শুধু অস্কারটা বাড়ীতে'। আমরা দেখতে চাইলে উনি আমাদের বসতে বলে পাশের ঘরে গেছেন। আমি, বেলজ্জর হদ্দ, সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত। উনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন 'ও ঘরে গিয়ে বস, আমি নিয়ে আসছি'। আমার তো 'ধরনী দ্বিধা হও' অবস্থা। উনি হাতে করে নিয়ে এলেন অস্কারটি। আমরা হাতে নিয়ে দেখলাম সেই অমূল্য মূর্তিটি। তখন ভারতবর্ষে ঐ একটিই অস্কার। ছবি তোল, ছবি তোল। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে তখন ক্যামেরার সব ফিল্মই শেষ। একেই বলে poetic justice। আমাদের হাতে অস্কার থাকা মানায় না। তাই যা হওয়ার তাই হলো। অবশ্য তার আগে বিজয়া দেবীর সঙ্গে যথেচ্ছ ছবি তোলা হয়ে গেছে।

যে কোন মহাপুরুষের স্ত্রীদের আমি অধিকতর শ্রদ্ধা করি। বস্তুতঃ স্ত্রীদের সাহায্য, সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ছাড়া কোন মহত্তম সৃষ্টি হয় না। যদি বিজয়া দেবী নিজের গহণাগুলি স্বামীর হাতে তুলে না দিতেন তাহলে পথের পাঁচালীও হত না, সত্যজিৎ রায়ও হতেন না। পদে পদে বাধা অতিক্রম করে সৃষ্টি করে যাওয়া 'মুশকিল হি নেহি, নামুমকিন'। তাই বিদ্যাসাগরের স্ত্রী, ডিরোজিওর মা-বোন, দাদা ঠাকুরের স্ত্রী, নজরুলের স্ত্রী, উৎপল দত্ত, মৃনাল সেন, তপন সিনহা, সুনীল-শক্তি-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এদের স্ত্রীরা আমার নমস্য।



আগ্রার ফতেপুর সিক্রিতে সপরিবারে।

আর এক মন্দিরে গিয়ে প্রণত হয়েছিলাম আমার সাক্ষাৎ দেবতার সামনে। নারায়ণ সান্যাল। যুক্তিবাদী, ভুয়োদর্শী, সর্ববিদ্যাপারঙ্গম , নিরপেক্ষ এই বিকর্ণ আমার চিরপূজ্য। প্রনাম করবার পর বললেন 'শুভমস্তু'। আমার কানে এখনও এ কথা বাজে। ইচ্ছা ছিল ওঁর 'অ-আ-ক-খুনের কাঁটা' ফিল্ম করার। অনুমতি চাইলে উনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।



আগ্রার ফতেপুর সিক্রিতে সপরিবারে, সুদূরে দৃশ্যমান তাজমহল।

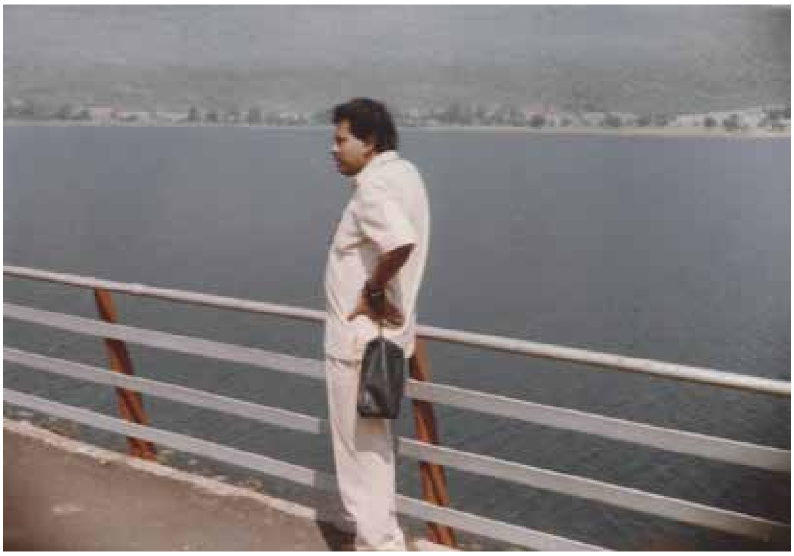
আগেই ওগুলোর স্বত্ব অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বললেন। এই জ্ঞানপয়োধি অভিমানি আনন্দ বর্জিত মহাপুরুষকে আমার প্রনাম জানাই।

দীপশিখার ভগ্নীপতি বম্বের অসংখ্য সফল চিত্রনাট্যের চিন্তনাট্যকার সুজিত সেন বনগাঁয় এসেছিলেন। ওঁকে আমাদের ভিডিও ফিল্ম 'প্রধানমন্ত্রী' দেখিয়েছিলাম। অবাক বিস্ময়ে উনি আমাকে ফিল্ম করবার প্রস্তাব দেন। আমিও সানন্দে রাজি ছিলাম। কিন্তু তার পরে উনি মারা যান। প্রস্তাব সন্দীপ রায়ও দিয়েছিলেন তার 'বাক্স রহস্য' টেলিফিল্মের Asst. Director হওয়ার জন্য। কিন্তু চাকরী এবং টিউশনি ফেলে দিনের পর দিন সিমলায় যাওয়া আমার সম্ভব হয়নি। ভয় ছিল 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হলো তার এঁড়ে গরু কিনে'।

'৯৪ সালে এক নতুন আঙ্গিকে photography র কাজ করলাম। অসমঞ্জবাবুর কুকুর সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য এই গল্পটিকে 'ছবিতে গল্প' হিসাবে ব্যবহার করলাম।



সত্যজিৎ রায়ের ক্লাসফ্রেন্ড গল্পের ফোটোকমিক্স-এর শুটিং-এ।



ছুটির মেজাজে।

বনগাঁ Photography Exibision এ চিত্রনাট্যটি প্রদর্শিত এবং প্রসংশিত হয়েছিল। স্বয়ং সন্দীপ রায় বলেছিলেন ‘ভারতে রকম কাজ আমি দেখিনি’।

’৯৪ সালেই করেছিলাম ‘বনগাঁর কোথায় কি’? পুলক আর আমি বহু খাটনি করে তৈরী করেছিলাম বনগাঁর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা। সম্পাদনা করলাম আমি। বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্যামল বসু বইটির অকুন্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

’৯৫ সালে টেলিফিল্ম করলাম ‘দলবদলের আগে’। কোলকাতার ময়দানে ফুটবলের দলবদলের আগে যে কুৎসিত ঘোড়া কেনা বেচা হয় তার রংদার কাহিনী লিখেছিলেন মতি নন্দী। আমরাও খুব মজা করে ফিল্মটি শেষ করলাম। ফাটাফাটি অভিনয় করেছিল দীপশিখা, পারভেজ রহমান, পাপাই, নূপুর। তাছাড়াও আমি, সঞ্চিতা, পুলক, দিলীপদা, সমরদা, কার্তিকদা, মানস- দীনবন্ধু, শ্যাম, টপু, কে না? রোমাঞ্চকর দৃশ্য তুলেছিলাম পারভেজদের দোতলা থেকে ‘নাকু’র শাড়ি বেয়ে নিচে নামা, সঙ্গে ছিল জাকির হোসেনের তবলা। ছবি তুলেছিল গৌতম রায়। ফুটবল কোনদিনই আমার পছন্দ না। কিন্তু ‘কানু’র মুখে একটি উক্তি - ‘ফুটবলের কর্মকর্তাদের নাম শুনেই বোঝা যায় কোন ক্লাসের লোক এরা। বটা, পচা, ঘুনু।’ এই লাইনটাই আমার কাছে খুব ক্যাচি মনে হয়েছিল। পারভেজ, দীপশিখা আর পুলকের অভিনয় ফিল্মটিকে একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। চিত্রনাট্য করেছিল সঞ্চিতা। শেষ দৃশ্যে মমতার গলা ব্যবহার করা হয়েছিল। এডিটিং করেছিলায় সোদপুরে গিয়ে। মনে আছে এডিটিং করতে গিয়ে ‘ঠাট্টা’ শব্দটি কেটে গিয়ে হয়ে গেল ‘আট্টা’। বুঝলাম আমরা ‘ঠা’ একবারে বলিনা। ঠ আর আ আলাদা উচ্চারন করি। বাড়ী ফিরতাম রাত ১২টায়।

‘৯৬ এর প্রথমেই ১৯শে জানুয়ারী থেকে এক সপ্তাহ আমাদের সংস্থার প্রাণপুরুষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের Retro-spective চালানো হয়েছিল বনগাঁ



চেন্নাইয়ের বীচে সস্ত্রীক।



তাজমহলে সপরিবারে।

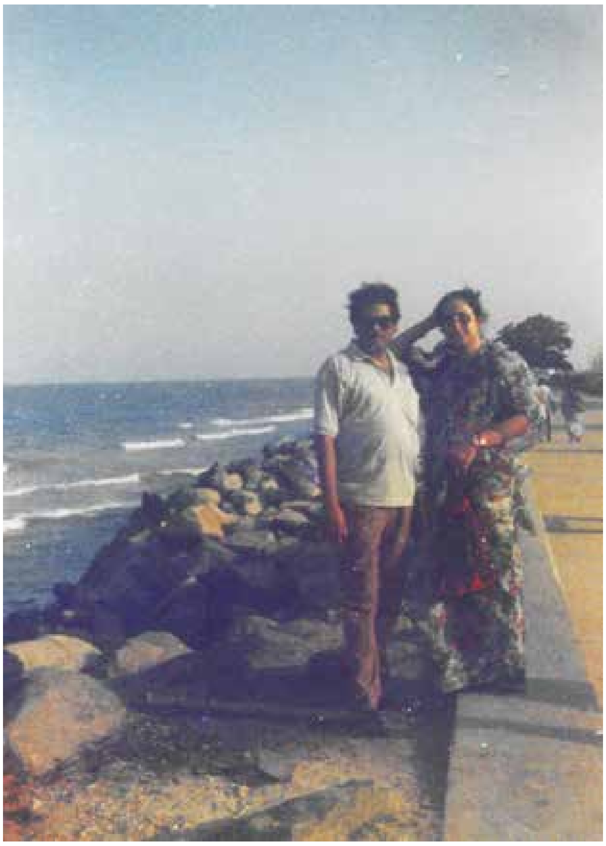
লোকাল টি.ভি.-তে। অনেক দুর্লভ, অপ্রচারিত ফিল্ম দেখানো হয়েছিল। জনসাধারনের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলাম এটি করে। মে মাসে উজ্জ্বল সংঘ ভবনে সত্যিজিৎ রায় জন্মজয়ন্তী ছাড়াও অক্টোবর মাসে অপুর সংসারের উদ্যোগে টাউনহলে করা হলো নাট্যোৎসব। আমাদের প্রযোজনায় অভিনীত হলো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটক 'আর একটি দিন'। পুলকের পরিচালনায় বিভাস, নূপুর, বাবুসোনার অনবদ্য অভিনয়ে দর্শকের মন ভরে গিয়েছিল। এছাড়াও গোবরডাঙ্গার 'শিল্পায়ন' অভিনয় করেছিল 'সম্প্রীতি বিলাস'।

সাধারনত আমরা শ্যুটিং করতাম নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। Weather-ও থাকতো খুব মনোরম। ছুটিছাটার জন্য কাজও করা যেত সহজে। বিশেষতঃ ভিডিও ক্যামেরাও সহজে পাওয়া যেত। এবার ঠিক করা হলো আর.এল. স্টিভেনসন-এর লেখা ডঃ জেকিল এন্ড মিঃ হাইড এর গল্প। চিরদিনই এই গল্পটা আমাকে খুব আকর্ষণ করতো। ছবিতে কিছু photographical trick এর দরকার ছিল। মিহিরের ক্যামেরায় সেই সুযোগ থাকাতে সুবিধাই হলো। গল্পটার বঙ্গীকরণ তথা চিত্রনাট্য করলাম আমিই। সহযোগিতা করেছিল চারঘাটের একটি মেয়ে-দীপিকা দাস। ফিল্মের নাম দেওয়া হলো 'সাদা কালো'। বিজ্ঞানী সিতাংশু রায় ওষুধের প্রভাবে মারকুটে কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত হয়ে যেত মাঝে মাঝেই। শেষ পর্যন্ত তাকে পুলিশের গুলিতেই মরতে হয়। অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছিল রুদ্র আর পুলক। তাছাও ছিল সুকুমারদা, কাকলি, টপু, তপনদা, নন্দ, নুপুর, মানস, দীনবন্ধু, গৌতম, পারভেজ, রাজা। স্বপন মুখার্জী, জ্যোতি ঘোষ ছাড়াও লুবলু-টুবলু সহ একগাদা বাচ্চা অভিনয় করেছিল। খুবই দর্শক



দিদির মেয়ে ও জামাইয়ের সাথে।

প্রশংসিত হয়েছিল ফিল্মটা। ক্যামেরায় ছিল মিহির আর মিউজিক করেছিল পাপাই। এডিটিং করেছিলাম মাণিক সাহার বাড়ীতে রাত দশটা, এগারোটা পর্যন্ত। পুলক আর আমার কি টেনশন! যেন কোন শব্দ বাদ না পড়ে। সুকুমারদার নতুন চটি গেল কুকুরে নিয়ে। যা হোক এডিটিং কিন্তু খাসা হয়েছিল।



পন্ডিচেরির সমুদ্র সৈকতে।

'৬৮ সাল কালিংপঙ গিয়ে জামাই বাবুর এক বন্ধু প্রশান্ত বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম। ওখানেই দেখেছিলাম Slide Film Show। দেওয়ালে প্রজেক্টার থেকে ছবি ফেলে দেখানো হয়েছিল আমাদের। আমরাও হীরামহল সিনেমা থেকে সেলুলয়েডের ফিল্ম নিয়ে এসে বাক্সে আলো লাগিয়ে পর্দায় ফেলে দেখতাম। সে ছিল অপটু, অস্পষ্ট ছবি। কিন্তু প্রশান্তবাবুদের ছবি ছিল একেবারে জীবন্ত। খুবই ভালো লেগেছিল আমার। বিস্মিতও হয়েছিলাম। সেই প্রোজেক্টর মেশিন কিনলাম '৯৭ সালে। একেবারে নিজের। এবার Slide Film বা Chrome Film বা Positive Film যাই নাম হোক না কেন তাই দিয়ে কবিতার চিত্রনাট্য করলাম। এবার রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি'। চিরন্তন প্রেমের এক অদ্ভূত পূর্ব চিত্ররূপ বাঁশি কবিতাটি। সরস্বতী পুজোর দিন প্রথম শো-এ উপস্থাপনা করেছিল কাকলি বিশ্বাস। পরে ক্যাসেটে উপস্থাপনা করে তমসী। অভিনয় করেছিল নন্দ, পায়েল দত্ত, প্রদীপ সাহা এবং লুবলু-টুবলু। ছবি তুলেছিল টুকাই। হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশির আবহে তাপসের আবৃত্তিতে দর্শক মন বিমোহিত হয়ে পড়তো। এই কাজটি করেছিলাম '৯৭ সালে। খুব সুখ পেয়েছিলাম এই ফিল্মটা করে।



বনগাঁর বাড়িতে দাদার সঙ্গে।

'৯৮ সালে আবার করলাম ছবিতে গল্প সত্যজিৎ রায়ের অমর গল্প ক্লাসফ্রেন্ড। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চাকুরে মোহিতের সঙ্গে দুঃস্থ ছোটবেলার বন্ধু এক অসম কৃষ্ণ-সুদামার গল্প এটি। বনগাঁর ব্যস্ত শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ব্যাঙ্কার সবাইকে নিয়েই আমাদের অপুর সংসার। ক্লাসফ্রেন্ডে অভিনয় করেছিল দিলীপদা, সমরদা এবং মিন্টু গোস্বামী। অসমঞ্জবাবুর



ছেলের সঙ্গে দিল্লিতে।

কুকুর আর ক্লাসফ্রেন্ড এই দুটিই এখন বই আকারে আমার বইয়ের তাকে শোভা পাচ্ছে।

'৯৯ এর মে মাসে সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তী হয়েছিল কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে। নাটক হয়েছিল স্বপন হালদারের পরিচালনায়। এটি অবশ্য ওদের প্রযোজনায়। আমাদের প্রযোজনায় হয়েছিল মিতা ঘোষের পরিচালনায় 'জয়তু সত্যজিৎ'। আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায়। ঐ বছরই ফিল্মের গল্প ঠিক করেছিলাম রমানাথ রায়ের লেখা 'কোটিপতির কাছে প্রার্থনা'। অনেকদিন আগে 'দেশ'-এ গল্পটা পড়েছিলাম। কিন্তু এবছর লাইব্রেরিতে কিছুতেই সেই সংখ্যাটা খুঁজে পাওয়া গেল না। মুশকিল আসান করলো প্রসূন চ্যাটার্জী। অত্যন্ত সুদক্ষ হাতে ওর সংরক্ষন থেকে বের করে দিল আমার ইপ্সিত সংখ্যাটি। আমার চিত্রনাট্যে গল্পের নাম হয়ে গেল 'প্রধানমন্ত্রী'। কেরানী হরিপদ হঠাৎ করেই তার কোটিপতি মালিকের কাছ থেকে একটা বর পেল। যা খুশি! আনন্দের চোটে হরিপদ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীতে আসতেই খুলে পড়লো মা, দাদা, বৌদি, বোনের মুখোশ। সমাজ-দেশ-পরিবার-অফিসের রাজনীতি। সাম্প্রতিক দাম বৃদ্ধি সবই ধরা পড়েছিল আমার চিত্রনাট্যে। সেই সঙ্গে চুটিয়ে অভিনয় করেছিল পিন্টু, রুদ্র, কাকলি, নূপুর, এন্টনি, বৈশাখী, J.G. এবং কল্পনা বৌদি।



শ্বশুরবাড়ির সবার সাথে বনগাঁয়।

দক্ষ অভিনেত্রী কল্পনা বৌদি পাঠ মুখস্ত না করতে পারলেও অভিনয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের। ছোট্ট অভিনয় করেছিল আমাদের লুবলু-টুবলু। এছাড়াও ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিল বংশীদা, দীনবন্ধু, শিব্রাম, কৌশিক, তন্ময়, ছোট নূপুর, পাপাই, গৌতম। খুব মজা করে এই স্যাটায়ার ধর্মী গল্পটার শুটিং শেষ করেছিলাম আমরা। শেষে হরিপদর চাকরীটাই থাকে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। সুজিত সেন ফিল্মটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বাজেট শুনে। সুজিত বাবুর ভাষায় 'লার্টরী' ধর্মী ফিল্ম দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন উনি।



সপরিবারে।

২০০০ সালে আমাদের প্রযোজনায় বনগাঁ টাউনহলে অভিনীত হলো জর্জ বার্নার্ড শ' র 'Arms and the Man'। বার্নার্ড শ' আমার জীবনের ধ্রুবতারা। যুদ্ধ ও ভালোবাসার অসারতা নিয়ে এই নাটকে সৈনিক ব্লাঙ্কলি যুদ্ধক্ষেত্রে চকলেট নিয়ে যায়। আর ধনী অভিজাত সেনাপতি পেটকফের স্ত্রী ও মেয়ে রাইনা যুদ্ধ ও নর-নারীর ভালোবাসা নিয়ে এক কল্পনার রাজ্যে বসবাস করে। সেখানে ব্লাঙ্কলি ঢুকে রায়নার কল্পনাকে ভেঙ্গে চুরে দেয়। আমার মনের মতো এই নাটক পরিচালনা করলো দেবাশিস (টপু)। অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিল এন্টনি, জয়িতা, রীতা দাস (পরে সঞ্চিতা)। আমার এক ছাত্র, আর্মির নিত্যানন্দ নাটক দেখে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। Arms and the Man পরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করেছিলাম।



মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময়।



ছুটির মেজাজে স্ত্রী সঞ্চিতার সঙ্গে।

মনি মন্ডলের লেখার প্রতি চিরকালই আমার শ্রদ্ধা ছিল। ওর লেখা 'মুরমু'র প্রথম পাঠক ছিলাম আমি। উনি একপাতা করে লিখতেন আর আমাকে দেখতে দিতেন। মুরমু ছাড়াও লিখেছিলেন বরিশালের লোক মুখে প্রচলিত ধাঁধার এক গবেষণা ধর্মী সংকলন। আর লিখেছিলেন গল্প সংকলন 'দেশটা ভারতবর্ষ'। সমাজ সচেতন একগুচ্ছ গল্প ছিল তাতে। তারই একটা অভিনয় যোগ্য গল্প ছিল ভারতবাবু। আধুনিক মনস্কতার এক অসামান্য দলিল। এবার Slide Film এ গল্পটি করতে মনস্থ করলাম। ২০০১ সালে কিছুটা পাল্টাপাল্টি করে গল্পটি প্রাসঙ্গিক করে তুলাম। ভারত বাবু একজন Retired Person। সরকার বদল হওয়ার পর একদিন বাজার থেকে মাছ সজি কিনে এনে দাঁড়ি পাল্লায় মেপে দেখেন জিনিস বেশি দিচ্ছে। পাল্লা ডান দিকে ঝুঁকছে। ভারতবাবুর উপলব্ধি বাম নয় ডান নয়, এখন দরকার একটা সততার পাল্লা। কণ্ঠ ছাড়াও চমৎকার অভিনয় করেছিলেন আমার বৃদ্ধ বন্ধু তরুন পালিত, অঞ্জনী বৌদি আর রনিতা পাল।

২০০২ সালে চারঘাটের লাইব্রেরিতে বসে পড়েছিলাম সুনীল গাঙ্গুলির লেখা বই 'আকাশ পাতাল'। সুনীল গাঙ্গুলি এমনিতেই আমার প্রিয় লেখক। এই গল্পগুলোতে ওঁকে অন্য রকম ভাবে আবিষ্কার করলাম। মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলতে ওঁর কোন বিকল্প নেই। এই গল্প গুলোর মধ্যে আলাদা করে একটি গল্প আমার নজর কাড়লো। কতকগুলো বখাটে ছেলে পার্কে গিয়ে সামনা সামনি হলো একগুচ্ছ যুবক-যুবতীর যারা ওখানে বসে গান বাজনা, আবৃত্তি করছিল। প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও ভালো লেগে গেল একটি ছেলের। ফেরার সময় সবাই হল্লোড় করলেও সে বলে উঠলো 'নাঃ, আজ আর কিছু ভালো নাগছে না, বাড়ী যাই'। এই উত্তরণটাই আমার কাছে গল্পের চাবি মনে



দাদা প্রদ্যুতের সঙ্গে।



সপরিবারে।

হয়েছিল। কতটা এই মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি আমি তা নিয়ে আমারই সন্দেহ আছে। শ্যুটিং করে ছিলাম অশোকনগরের সংহতি পার্কে। সারা দিন পিকনিক করতে করতেই শ্যুটিং সেরেছিলাম। অভিনয় করেছিল এক ঝাঁক Young ছেলে মেয়ে-পারভেজ, শ্যামল বোস, সবুজ, উজ্জ্বল, তমো, ঝুম্পা, জয়িতা এরা। অসম্ভব ভালো গান গেয়েছিল তমো-'উজ্জ্বল এক ঝাক পায়রা' আর 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'। পার্থ আবৃত্তি করেছিল- 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। দর্শকদের কেমন লেগেছিল তা জানি না। তবে এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন ঐ পার্কে গিয়ে ওরা যা করেছে, তাই তুলেছ তো তোমরা? এত ভালো অভিনয় করেছিল ওরা যে দর্শক বুঝতেই পারেনি যে ওটা রিহার্সাল দেওয়া অভিনয়। নাম দিয়েছিলাম 'আজ বসন্ত'। গল্পটা এত ছোট যে আর একটা গল্প তার সঙ্গে যোগ করলাম। সত্যজিৎ রায়ের 'ক্লাস ফ্রেন্ড' আমার অন্যতম প্রিয় গল্প। সেটাকেই জুড়ে দিলাম আজ বসন্তের সঙ্গে। অভিনয় করলো



শখের ক্যাসেট সংগ্রহ।



বেনারসে স্ত্রীর সঙ্গে।

রুদ্র, কটাদা, দেবাশিস, দীনবন্ধু, মুনমুন। কটাদা তখন বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এর মধ্যেই সময় করে কটাদা যে আমাদের সময় দিয়েছিলেন তা সত্যিই ধন্যবাদার্হ। আসলে কটাদা নিজেই নাটক অন্ত প্রাণ। চোখ ধাঁধানো অভিনয় করেছিল কটাদা। এই ছবিতেই প্রথম পুথুন গানসহ অভিনয় করলো আর তন্ময় তবলা বাজানোর অভিনয় করলো। আসল তবলাটা বাজিয়ে ছিল মুক্তিদা। পুলকও ব্যস্ততার মধ্যে নৌকার দৃশ্যে 'চাঁদ কহে চামেলি গো' গানটি করলো। ক্যামেরায় ছিল আমাদের মিন্টু।

২০০৪ সালে আবার ফেলুদা। 'ডাঃ মুনশীর ডায়েরী' গল্পটা আমাদের পছন্দ হলো। আসলে বনগাঁয় অভিনয় যোগ্য হতে হবে গল্পটাকে। এরার সম্পূর্ন নতুন গ্রুপের ফেলুদা করা হলো। ফেলুদা হয়ে শশাঙ্ক, তোপসে হলো কৌশিক আর জটায়ু হলো টপু। টপু তো অভিনয়ের জন্য মাথা ন্যাড়া করে নিল। আসলে টপু নাটকটাকে ভীষনই ভালোবাসতো। এছাড়াও ছিলাম আমি, বৈশাখী, স্বপন মুখার্জী, দীনবন্ধু তপন পাল, নিমাই বিশ্বাস এবং J.G.। কংগ্রেস এবং সি.পি.এম. এই দুজনকে একঘাটে জল খাওয়াতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়েছিলাম। J.G.-কে নাকি পার্টি অফিসে এজন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। উৎপল দত্ত সারাজীবন শুধু বামপন্থীদের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন এমন কথা কিন্তু শুনিনি। যে কোন কারনেই হোক গল্পটা কিন্তু দর্শকরা তেমন গ্রহণ করেনি। সেই জন্যই বোধ হয় এই ক্যাসেটটি সংরক্ষনও' করা হয়নি।



দার্জিলিঙে সস্ত্রীক।



দাদা প্রদ্যুতের সঙ্গে।

ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে আমার নিজস্ব একটি ভাবনা আছে। নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানবাসী এবং ভারতবাসীর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। আমরা চাই পরস্পরের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু আমাদের দুই দেশের সরকার একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব জিইয়ে রাখে জাতীয়তাবাদের আড়ালে গদি দখলের জন্য। আমেরিকাও সুযোগ বুঝে উভয় দেশকেই তাতায় এবং অস্ত্র বিক্রী করে। এই ভাবনা নিয়েই আমার একটি গল্প আছে- নিছক দুটি পরিবারের গল্প। ২০০৫ সালে ঐ গল্পটাকেই স্লাইড ফিল্মে রূপান্তরিত করলাম। চিত্রনাট্য করে দিল সঞ্চিতা। কন্ঠ সহ অভিনয় করলো সুরঞ্জন, এন্টনি, রুদ্র, শংকর দাম, বংশীদা, সুকুমারদা এবং পুলক। প্রথমে আমার একটা গৌরচন্দ্রিকা ছিল বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত প্রায় সব দর্শকই এটাকে নেহাতই দুটি পরিবারের মধ্যে লড়াই বলে মনে করলো। সম্পূর্ন রূপক ধর্মী এই গল্পটা সাধারনকে স্পর্শ করতে পারেনি বলে আমার নিজেই একটা আফশোস আছে। আসলে 'পাগলু-টু সমৃদ্ধ বাঙালীর মস্তিষ্ক চেতনারই লোপ পেয়েছে বহু আগে।

তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় বেড়িয়েছিল চন্দন সেনের লেখা ব্রেখট্ অবলম্বনে ভীষ্মলোচনের কল্প বিচার নাটকটি। এই নাটকটি এখনও অসম্ভব প্রাসঙ্গিক। মূলত হিটলারে রাজত্বকাল নিয়ে স্যাটায়ার ধর্মী এই নাটক। ভীষ্মলোচন মারা গিয়েছে। স্বর্গে গিয়ে ভীষ্মলোচন ফিরিস্তি দিচ্ছে সে ক'টা রাস্তা বানিয়েছে, সৌধ বানিয়েছে, রাস্তায় আলো দিয়েছে, নগরের প্রবেশদ্বার বানিয়েছে কিন্তু খোঁজ নেওয়া হয়নি সাধারন মানুষ কি খাচ্ছে, কি পড়ছে। বেকারী বেড়েছে, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই। ২০০৬ সালে



দাদা প্রদ্যুতের সঙ্গে।



স্ত্রী সঞ্চিতার সঙ্গে।

কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্র ও রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অপুর সংসারের প্রযোজনায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হলো। টপুর পরিচালনায় নাটকটিতে অভিনয় করল ফেলুদা, ভাইদা, শান্তনু, সুকুমারদা, আমি, রিনী পাল। অসাধারন অভিনয়ে দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিল টপু এবং পিন্টু। J.G. বলেছিলেন ‘মনে হচ্ছে যেন গণনাট্যর কোন নাটক দেখছি’। এও আমাদের এক পরম পাওয়া। ভীষ্মলোচনের চরিত্রে টপুর মেকাপ এবং কষ্টিউম ছিল তাক লাগানো।

২০০৭ সালে আবার একটি স্লাইড ফিল্ম করলাম। জয় গোস্বামীর নিজ কণ্ঠে মালতী বালা বালিক বিদ্যালয় শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বহু দিন কবিতাটা মনের মধ্যে নাড়া চাড়া করতে করতে অবশেষে বাস্তবায়িত করলাম। এই প্রথম, ছবি করলেও Casting আমার মনের মতন হয়নি। অভিনয় করেছিল ঝুমা রায়, ঝুয়া হালদার, অসীমা, পার্থ, স্বাতী আর অলিও। কবিতাটা আবৃত্তি করলো নন্দিনী। উপস্থাপনা করলো পাপাই।

২০০৯ সালে আমি নতুন Sony Camera কিনলাম। নতুন উদ্যোগে শুরু হলো গল্প খোঁজা। তথ্য কেন্দ্রে বেরিয়েছিল সমরেশ মজুমদারের নাটক ‘বিরহিনী’। সেটিকে ঘষামাজা করে আমি চিত্রনাট্য তৈরী করলায়। এক ৮০ বছরের বিধবাকে লেখক নিজের বাড়ী কোলকাতায় নিয়ে আসেন। খানিকটা nostalgic হয়ে চেষ্টা করেন সেই বৃদ্ধাকে নিজের পরিবারে ফিরিয়ে দিতে। শেষে এক বৃদ্ধ, যিনি ছিলেন ঐ বৃদ্ধারই কিশোর বয়সের প্রেমিক, তিনি দেখতে আসেন কিন্তু বৃদ্ধা তাকে চিনতে অস্বীকার করেন। ফেরার পথে বৃদ্ধের মারাত্মক হার্ট এ্যাটাক হয়। চরিত্র চিত্রণে ছিল শান্তনু, নন্দিনী, নারায়ণ বিশ্বাস এবং কল্পনা বৌদি। অভিনয় যেন কে কাকে ছাপিয়ে যাবে তারই পরীক্ষা চলেছিল। বহু দর্শককে দেখেছি ফিল্ম দেখতে দেখতে চোখ মুছতে। এখানেই আমার ফিল্ম করার সার্থকতা। প্রভূত প্রশংসা পেয়েছিল ছবিটা। এতেই প্রথম মিউজিক দেয় পুথুন। ক্যামেরা ধরেছিল রাজু। শেলী বৌদি একটি চমৎকার review লিখেছিল এই ফিল্মের।



স্ত্রী ও বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিঙে।

রহস্য রোমাঞ্চ গল্পে অনীশ দেব আমার কাছে অদ্বিতীয়। ওঁরই



স্ত্রী ও এক ছাত্রীর সাথে।

লেখা 'উনিশ-বিষ' গল্পটা চির কালই আমাকে টেনেছে। সেটারই চিত্রনাট্য করে দিল সঞ্চিতা। ২০১০ সালে এই গল্পটারই চিত্ররূপ দিলাম আমি। শিকারী কিভাবে নিজেই শিকার হলো তাই নিয়েই এই গল্প। অভিনয় করেছিল পুলক, নন্দিনী, সুমন্ত, টপু, পুথুন এবং শঙ্কর দাম। খলনায়কের চরিত্রে শঙ্কর দাম এবং পুলকের আর্তচিৎকার ছবিতে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। ক্যামেরার কাজেও রাজু অত্যন্ত দক্ষতা দেখিয়েছিল এবং সর্বোপরি মিউজিক। পুথুনের করা মিউজিক ছবিটিকে অন্য সীমানায় পৌছে দিয়েছিল। গা ছমছমে এই গল্পটি দর্শকদের বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। চমৎকার edit করেছিল বাপিন।

নবপত্রিকার পুজা সংখ্যায় গল্পটা বেরিয়েছিল। আবুল বাশারের লেখা গল্প 'চিরকুট'। একেবারেই আবুল বাশারোচিত নয় গল্পটা। তবু আমার এই গল্পটাই পছন্দ হয়েছিল। মিষ্টি একটা প্রেমের গল্প। বেকারত্ব যে দাম্পত্য জীবনেও ছাপ ফেলতে পারে এবং শেষে একটা চাকরী সব সমস্যার সমাধান করতে পারে তা এই দুর্মর সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল আমার। ২০১১ সালেই পুথুনের রবীন্দ্র সঙ্গীতের C.D. release করেছিল এবং একটি গানের দৃশ্যায়ন করা হয়েছিল। সেই দৃশ্যটি ছবিতে ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারিনি। ছবিতে অভিনয় করেছিল মিমি, রাহুল, পুথুন, তমো, সৌমি আর টপু। অন্য গল্প দুটোর মতো এটাকেও সম্পাদনা করেছিল বাপিন ওর নিপুন হাতে।



বেহালার ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক।

ব্যস, আমর গল্প ফুরালো। আমার যতটুকু করার আমি করেছি। কী পেয়েছি না পেয়েছি তার নাই বা হিসাব করলাম। এবার পরবর্তী প্রজন্মের পালা। আশা করি আমার পরবর্তী প্রজন্ম আমার কাজকে পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে যাবে। অনেক কিছু সৃষ্টি করেছি আমি। তার কিছু আমার মনের মতো হয়েছে, কিছু হয়তো নয়। তবে দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি আমার সেরা সৃষ্টি হলো চার্বাক দীপ্ত, আমার পুথুন।

নানা বছরে যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসব
























JADEJA
দেওয়ালি






ভুখা মানুষ ধর বই
ওটা হাতিয়ার















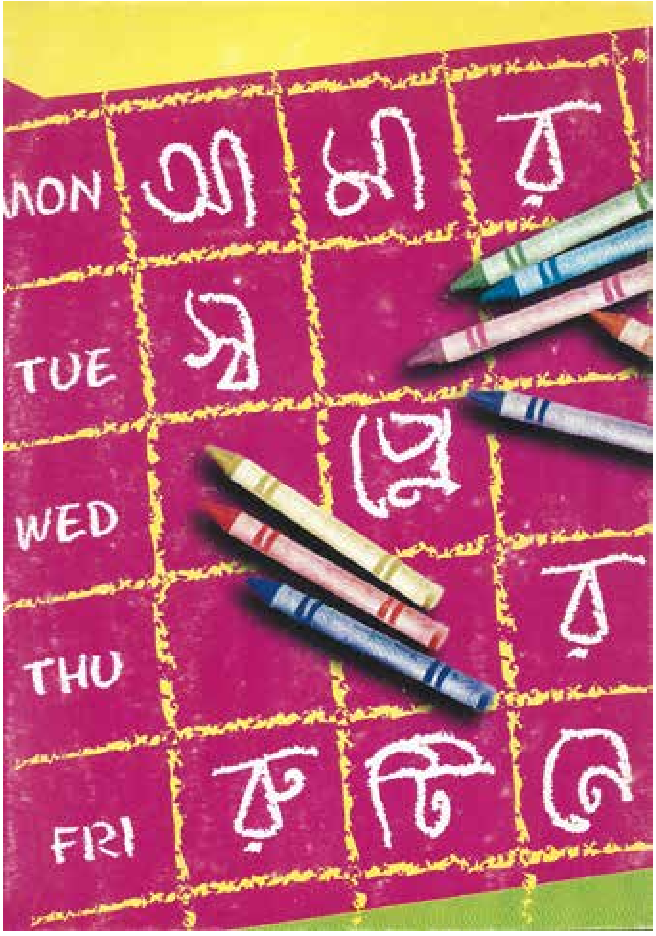


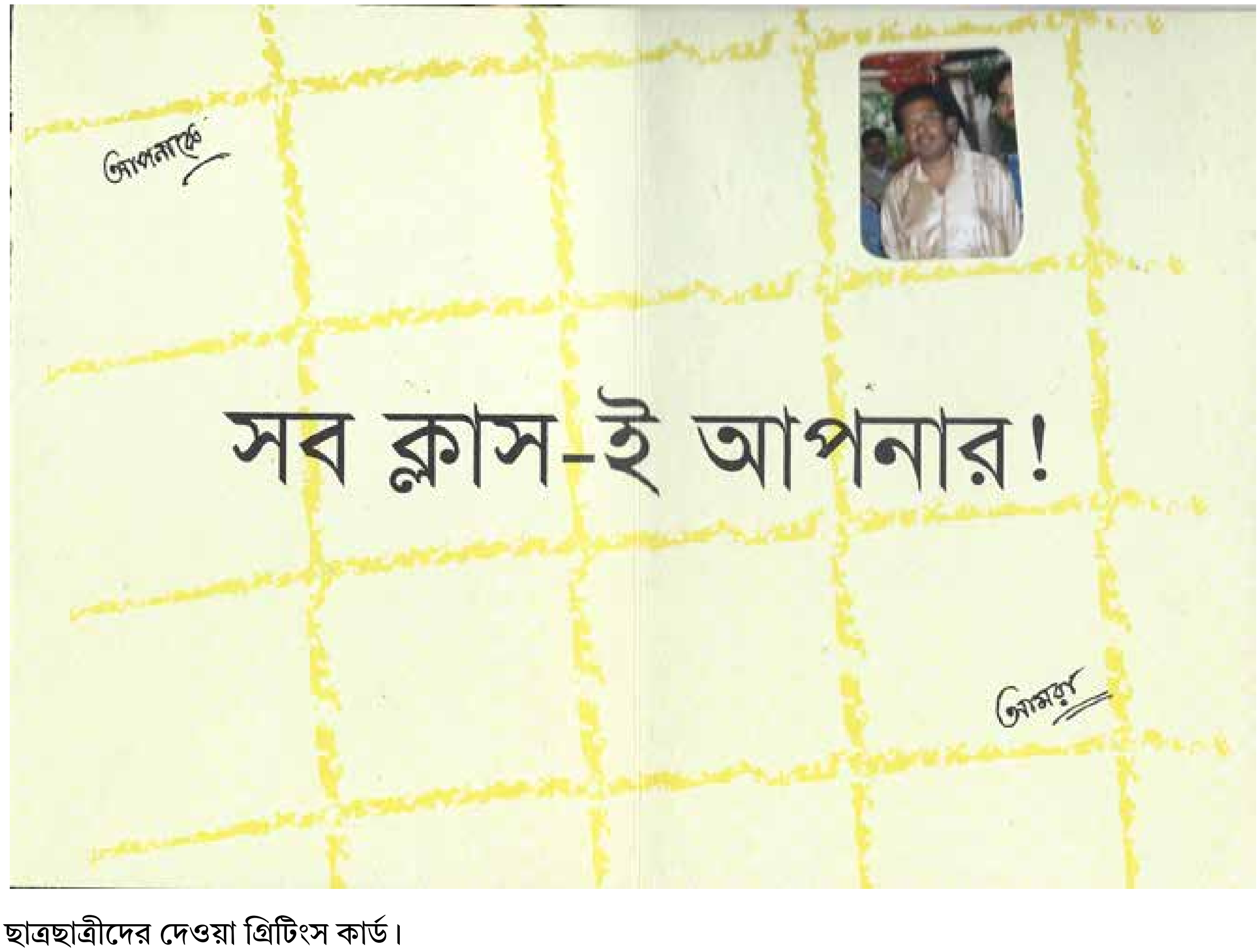












ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া গ্রিটিংস কার্ড।











বনগাঁয় দীপ্তরূপ দাস পরিচালিত নাটক- জর্জ বার্নার্ড শ-এর Arms and the Man-এর মঞ্চায়নে।
মুখ্য ভূমিকায় স্ত্রী সঞ্চিতা।



পরিচালিত ফিল্ম 'প্রধানমন্ত্রী'-র একটি দৃশ্য।



'হীরক রাজার দেশে' নাটকের মঞ্চায়নে।





ভীষ্মলোচনের কল্পবিচার নাটকের মুহূর্ত।





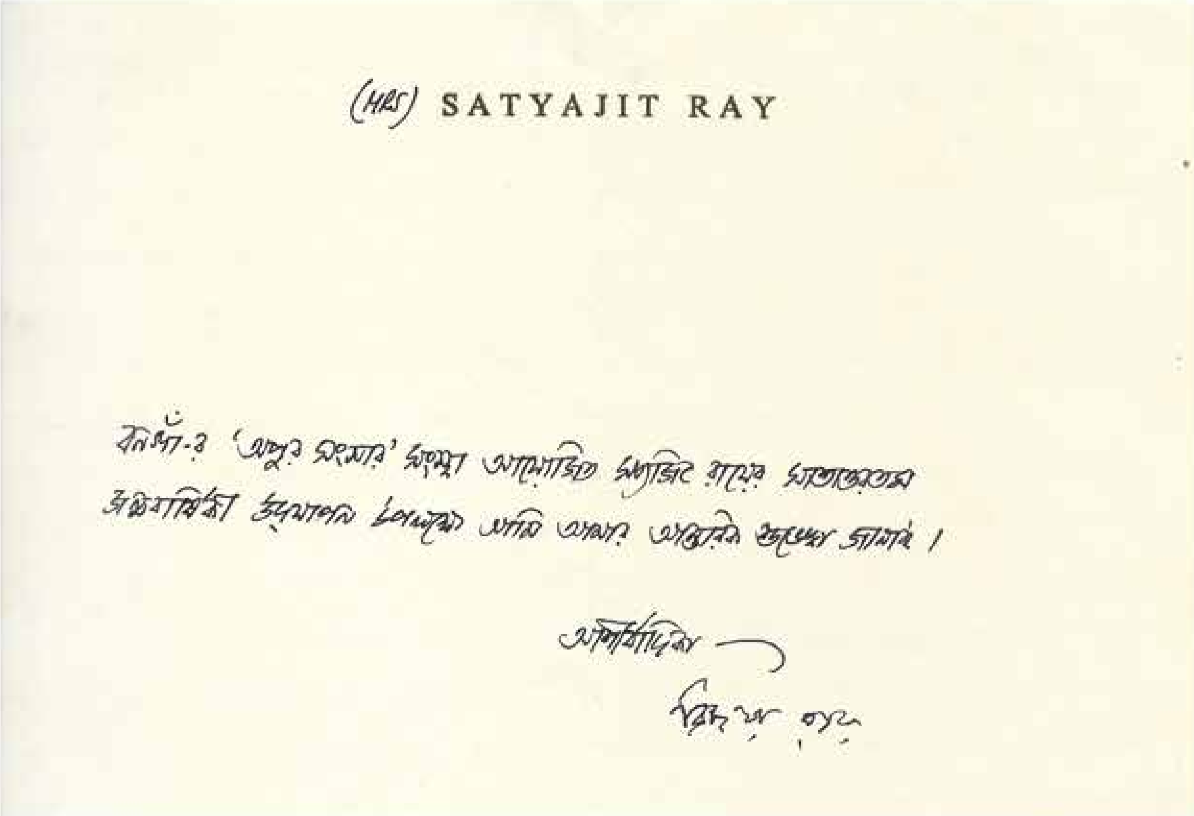
সারস্বত উৎসবে স্ত্রী সঞ্চিতার সংগীত সংস্থা 'ঘরানা'-র অনুষ্ঠানে।



অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রী সুদিন চট্টোপাধ্যায়।



যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসব।

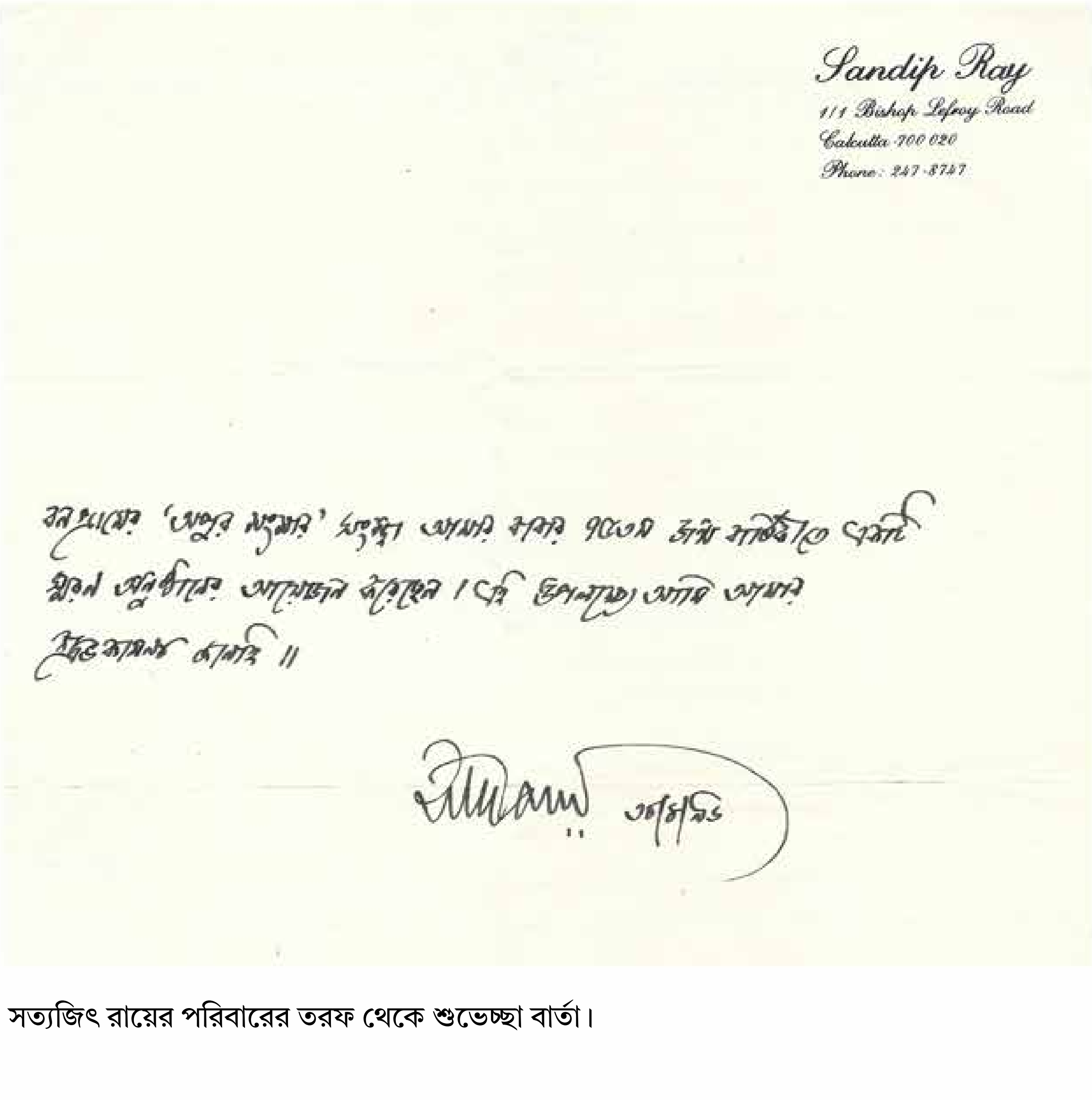


(MRS) SATYAJIT RAY

বনগাঁ-র 'অপুর সংসার' সংস্থা আয়োজিত সত্যজিৎ রায়ের সাতাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আশীর্বাদিকা —

বিজয়া রায়

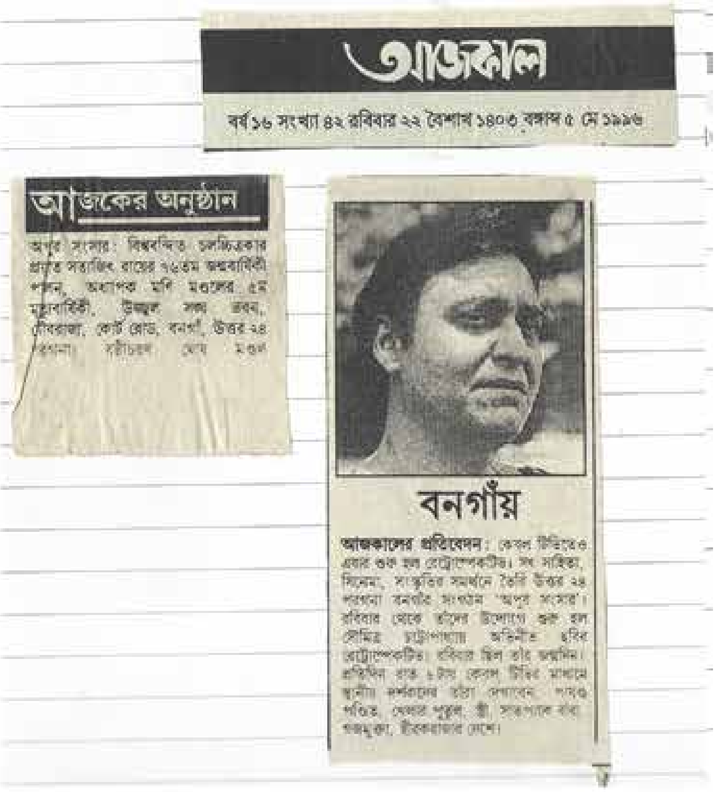


Sandip Ray
1/1 Bishop Lefroy Road
Calcutta 700 020
Phone: 247-8747

বনগাঁয়ের 'অপুর সংসার' সংস্থা আমার বাবার ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সেই উপলক্ষ্যে আমি আমার শুভকামনা জানাই॥

সত্যজিৎ রায়ের পরিবারের তরফ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা।





আজকাল

বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৪২ রবিবার ২২ বৈশাখ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ৫ মে ১৯৯৬

আজকের অনুষ্ঠান

অপুর সংসার: বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী পালন, অধ্যাপক মণি মণ্ডলের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী। উজ্জ্বল সন্ধ্যা ভবন, যৌবরাজ্য, কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা। [illegible]

বনগাঁয়

আজকালের প্রতিবেদন: কেবল টিভিতেও এবার শুরু হল রেট্রোস্পেকটিভ। সৎ সাহিত্য, সিনেমা, সাংস্কৃতির সমর্থনে তৈরি উত্তর ২৪ পরগনা বনগাঁর সংগঠন 'অপুর সংসার'। রবিবার থেকে তাঁদের উদ্যোগে শুরু হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ছবির রেট্রোস্পেকটিভ। রবিবার ছিল তাঁর জন্মদিন। প্রতিদিন রাত ৯টায় কেবল টিভির মাধ্যমে স্থানীয় দর্শকদের তাঁরা দেখাবেন: [illegible] পরিচয়, খেলার পুতুল, স্ত্রী, সাতপাকে বাঁধা, গজমুক্তা, হীরকরাজার দেশে।

অপুর সংসার -এর

সাংস্কৃতিক নিবেদন

॥ ১ ॥

প্রেম অপ্রেমের ছবি

বিরহিনী

॥ ২ ॥

ভয়াল ভয়ঙ্কর ছবি

উনিশ-বিষ

॥ ৩ ॥

খেলা ভাঙার খেলার ছবি

চিরকুট

চিত্রগ্রহণ ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত

সম্পাদনা ঃ বাপিন দত্ত

আবহ ঃ চার্বাক দীপ্ত

পরিচালনা ঃ দীপ্তরূপ দাস

সঞ্চালনা ঃ সুশোভন দত্ত

সুবন্ধু,

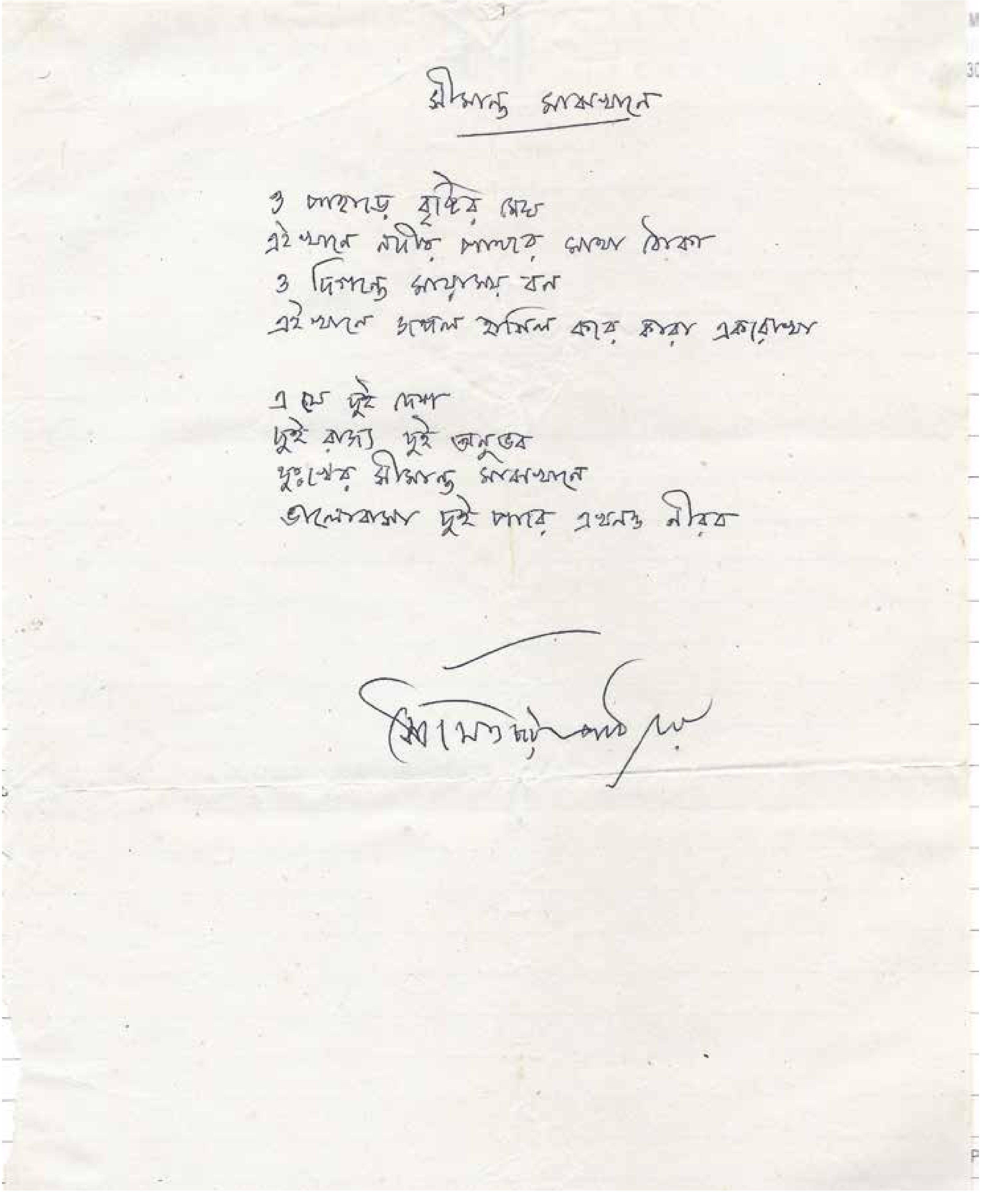
শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই আজ নেমে এসেছে ঘন তমসা। যে নারীকে পুজো করতে শিখেছি ছোটবেলায়, বড় হয়ে সেই নারী নির্যাতনে আমরা প্রথম! ক্রমশ আমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির বুলবুলদের মিথ্যার অক্টোপাসে আমরা বিহ্বল। আলোকোজ্জ্বল শহরে গরু পাচারের মহোৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের শিশুরা বড় হচ্ছে। বাঃ রে সভ্যতা!

তবু এই অমানিশাই শেষ কথা নয় আগামী শ্রীপঞ্চমীতে যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসব প্রাঙ্গণে আমাদের সমবেত গর্জন হোক—

"ক্রোধ আর কান্নার পরে স্নান সেরে শুদ্ধ ভাবে
আমি
আজ উচ্চারণ করব সেই মন্ত্র
আমাকে বাঁচতে না দিলে এই পৃথিবীও আর বাঁচবে না।"

শুভেচ্ছা সহ—
যৌবরাজ্য'র ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
২৬ জানুয়ারি ২০১৩

সারস্বত উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র।



'নিশ্চিন্দিপুর' ম্যাগাজিনের জন্য শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া কবিতা।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ডব্লিউ থ্রি টি সি - নাইন, ফেজ সিক্স
গল্‌ফ গ্রিন আর্বান কমপ্লেক্স
কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫
দূরভাষ ঃ ৪৭৩ - ৭৮০৪

এ বছর ২রা মে সত্যজিৎ রায়ের ৮০তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনটিতে প্রতিবছরের মত এবারও 'অপুর সংসার' সংস্থা সত্যজিৎ রায়কে স্মরণ করবে তাদের 'সুকুমারে'।

কারণ জীবিকা যতই তাই আমার কাছে সেখানে যোগাযোগ সম্ভব হবেনা। 'অপুর সংসার' সংস্থার সাথে আমার যোগাযোগ এর প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। আমি জানি বাংলার সংস্কৃতির প্রতি এঁদের কতখানি আগ্রহ। তাঁদের এই সত্যজিৎ জন্মদিন পালনে যে সংস্কৃতি চর্চা থাকে তা আমি বুঝতে পারি। তাঁদের অভিনন্দন জানাই। এই শুভেচ্ছার সঙ্গেই যেন তাঁদের এই বাঙালীর সংস্কৃতির প্রীতি আরও বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

25/4/2000

অপুর সংসার পরিচালিত সত্যজিৎ জন্ম জয়ন্তীতে শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা।

SOUMITRA CHATTERJEE

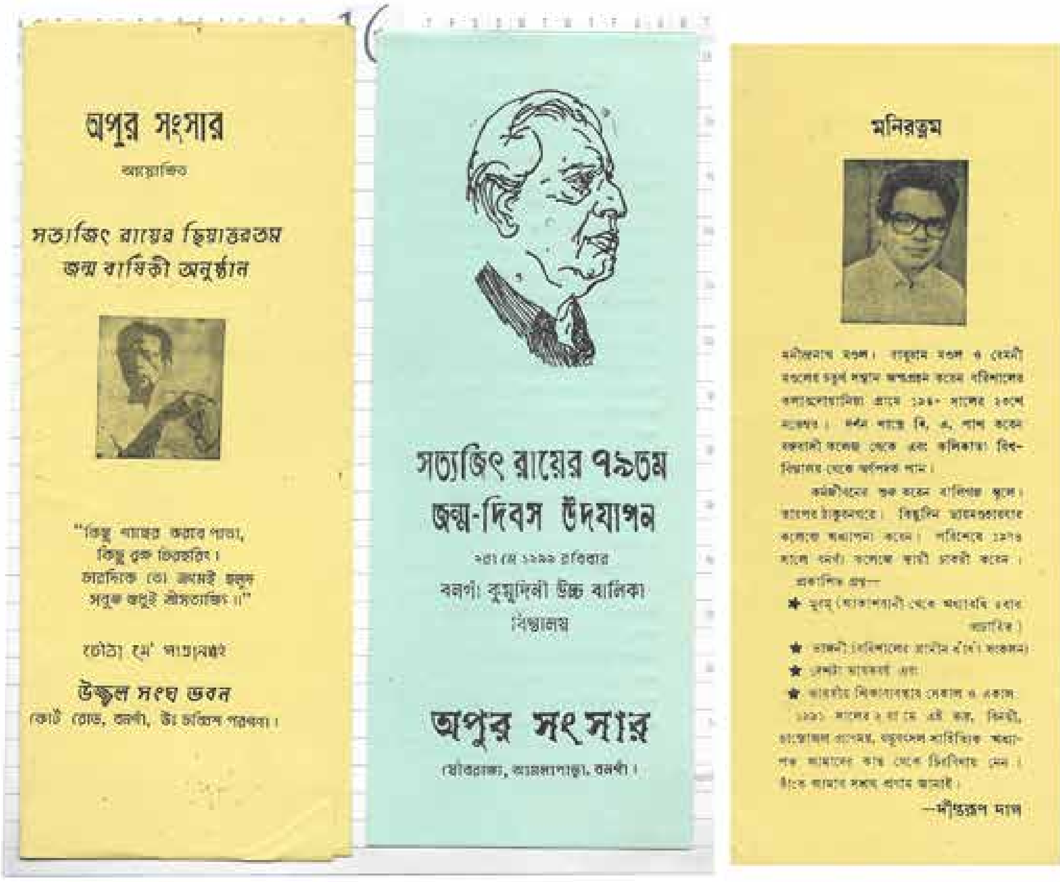
বনগাঁর 'অপুর সংসার' সংস্থার সঙ্গে আমার যোগ তো এক প্রথমাবস্থা থেকেই। আপনারা সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় নিজেদের প্রশংসার দাবী করতে পারেন। আগামী ২৭শে অক্টোবর '০৬ তারিখে যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন তার সাফল্য কামনা করছি। আশা করি সুরুচির সংস্কৃতির চর্চায় এই উৎসব একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারবে। অভিনন্দন সহ —

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

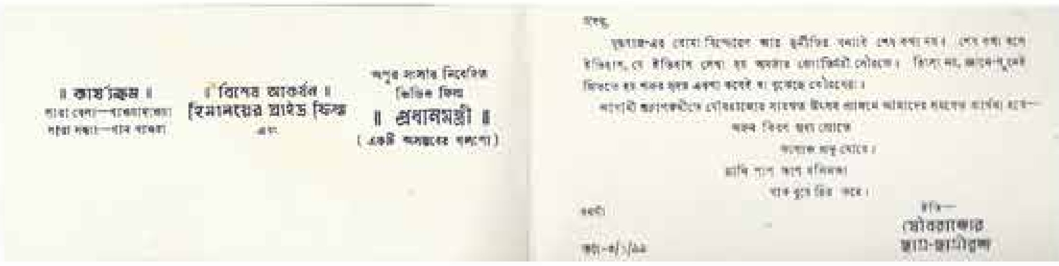
২৬/১০/০৬

WBTC-9 PHASE-VI GOLF GREEN URBAN COMPLEX CALCUTTA-700 045

অপুর সংসার পরিচালিত সত্যজিৎ জন্ম জয়ন্তীতে শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা।



নানা বছরের সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তীর লিফলেট।





মাননীয়,

সারস্বত উৎসব ২০১২

যৌবরাজ্য
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

শুভচিন্তক,

মৃত্যুর বছর পেরিয়ে এলাম। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু
করে স্বক্ষেত্রে স্বরাট বহু মানুষকে হারিয়েছি আমরা।
পরিবর্তনের স্রোতে আলো গিয়েছে অন্ধকারে মিশে।
ডাঙার অন্বেষণে লাল-সবুজ-গেরুয়া সবাই দিকভ্রান্ত।
তবু অমলকান্তির মতো রোদ্দুর হতে চাই আমরা।
আগামি শ্রীপঞ্চমীতে যৌবরাজ্যে সারস্বত উৎসব প্রাঙ্গনে
আমাদের প্রার্থনা হোক —

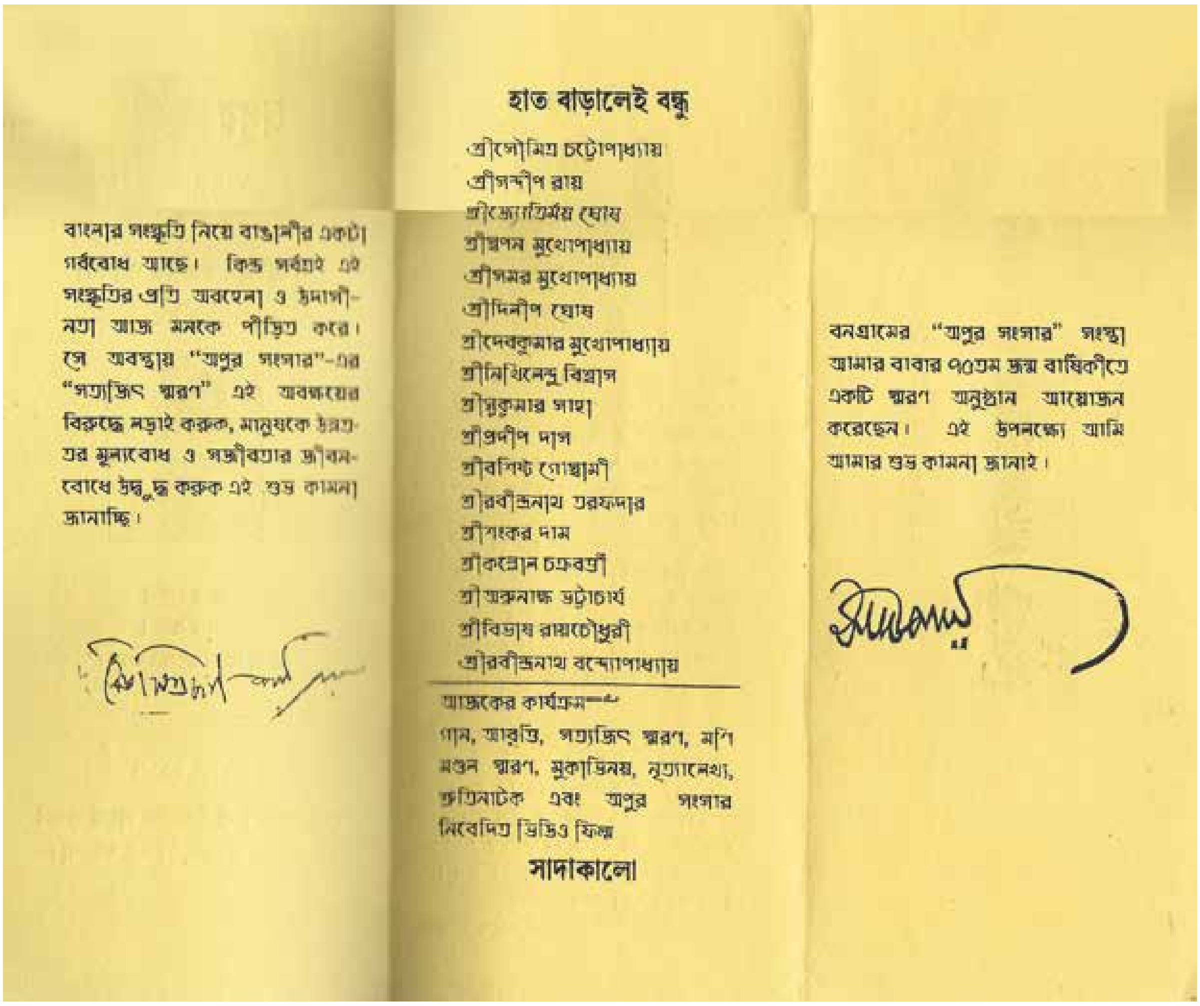
"দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্য অপার
হৃদস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার।
নির্মম মুহূর্তে ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা সয়ে সয়ে
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন সমারোহে।"

নববর্ষের শুভেচ্ছা সহ—

যৌবরাজ্যের
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

৫ জানুয়ারি ২০১২

সারস্বত উৎসবের আমন্ত্রণপত্র।



বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালীর একটা গর্ববোধ আছে। কিন্তু সর্বত্রই এই সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা আজ মনকে পীড়িত করে। সে অবস্থায় "অপুর সংসার"-এর "সত্যজিৎ স্মরণ" এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করুক, মানুষকে উন্নততর মূল্যবোধ ও সম্প্রীতির জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করুক এই শুভ কামনা জানাচ্ছি।

হাত বাড়ালেই বন্ধু

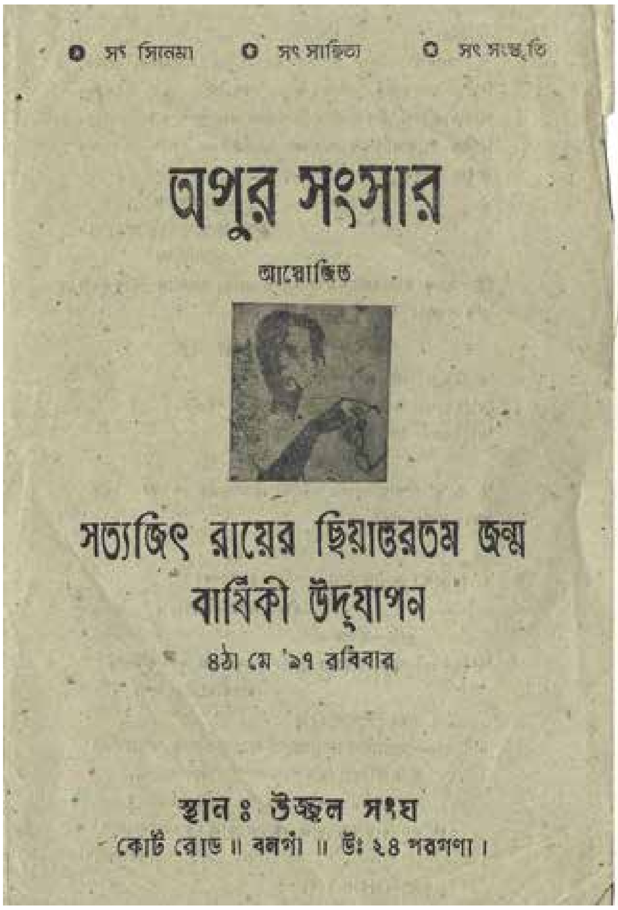
শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসন্দীপ রায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীস্বপন মুখোপাধ্যায়
শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপ ঘোষ
শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীনিখিলেন্দু বিশ্বাস
শ্রীসুকুমার সাহা
শ্রীপ্রদীপ দাস
শ্রীবশিষ্ট গোস্বামী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ তরফদার
শ্রীশংকর দাস
শ্রীকল্লোল চক্রবর্ত্তী
শ্রীঅরুনাক্ষ ভট্টাচার্য
শ্রীবিভাষ রায়চৌধুরী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের কার্যক্রম—

গান, আবৃত্তি, সত্যজিৎ স্মরণ, মণি মণ্ডল স্মরণ, মূকাভিনয়, নৃত্যালেখ্য, শ্রুতিনাটক এবং অপুর সংসার নিবেদিত ভিডিও ফিল্ম

সাদাকালো

বনগ্রামের "অপুর সংসার" সংস্থা আমার বাবার ৭৫তম জন্ম বার্ষিকীতে একটি স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আমি আমার শুভ কামনা জানাই।



● সৎ সিনেমা ● সৎ সাহিত্য ● সৎ সংস্কৃতি

অপুর সংসার

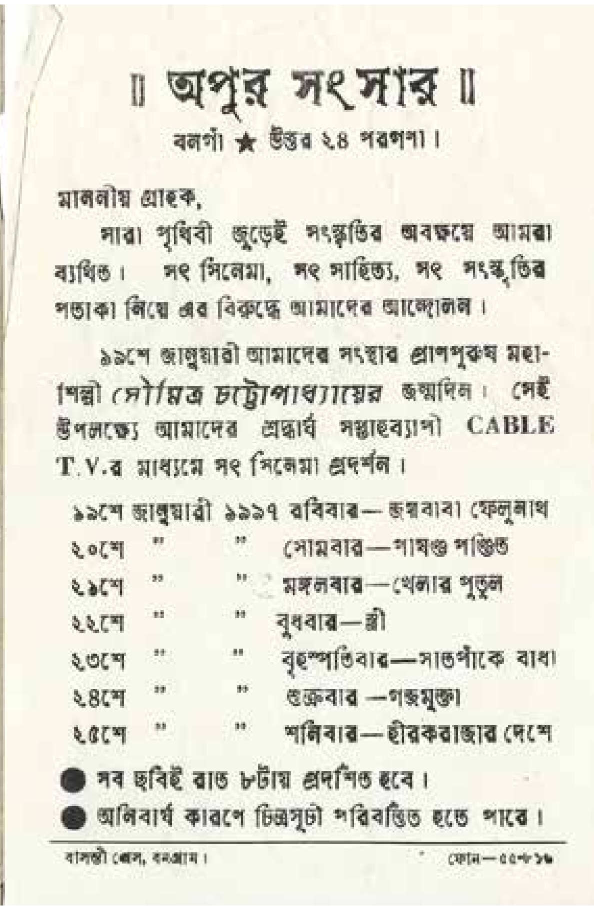
আয়োজিত

সত্যজিৎ রায়ের ছিয়াত্তরতম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

৪ঠা মে '৯৭ রবিবার

স্থান ঃ উজ্জ্বল সংঘ

কোর্ট রোড ॥ বনগাঁ ॥ উঃ ২৪ পরগণা।



॥ অপুর সংসার ॥

বনগাঁ ★ উত্তর ২৪ পরগণা।

মাননীয় গ্রাহক,

সারা পৃথিবী জুড়েই সংস্কৃতির অবক্ষয়ে আমরা ব্যথিত। সৎ সিনেমা, সৎ সাহিত্য, সৎ সংস্কৃতির পতাকা নিয়ে এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন।

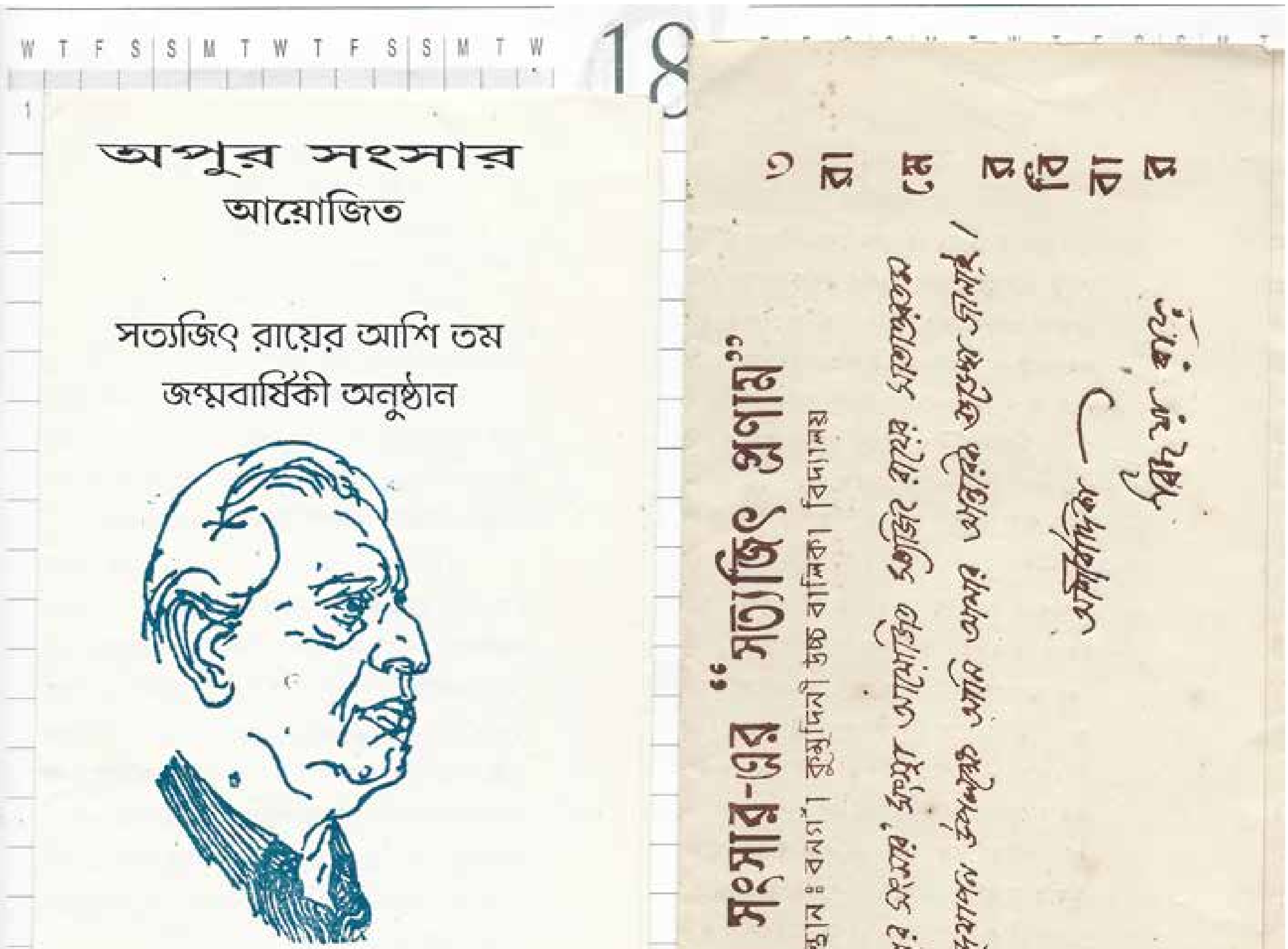
১৯শে জানুয়ারী আমাদের সংস্থার প্রাণপুরুষ মহাশিল্পী *সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের* জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ সপ্তাহব্যাপী CABLE T.V.র মাধ্যমে সৎ সিনেমা প্রদর্শন।

১৯শে জানুয়ারী ১৯৯৭ রবিবার—জয়বাবা ফেলুনাথ
২০শে " " সোমবার—পাষণ্ড পণ্ডিত
২১শে " " মঙ্গলবার—খেলার পুতুল
২২শে " " বুধবার—স্ত্রী
২৩শে " " বৃহস্পতিবার—সাতপাকে বাধা
২৪শে " " শুক্রবার—গঙ্গামুক্তা
২৫শে " " শনিবার—হীরকরাজার দেশে

● সব ছবিই রাত ৮টায় প্রদর্শিত হবে।
● অনিবার্য কারণে চিত্রসূচী পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

বাসন্তী প্রেস, বনগ্রাম। ফোন—[illegible]

নানা বছরের সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তীর লিফলেট।



নানা বছরের সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তীর লিফলেট ও আমন্ত্রণ পত্র।

ebruary Monday

সুমিত্র,

সংস্কৃতির আকাশে আজ 'অশনি সংকেত'। প্রশ্ন উঠছে সুস্থ সংস্কৃতি কি 'গণশত্রু' না 'গণদেবতা'। 'শ্যামসাহেব'দের দাপট আজ 'ঘরে বাইরে'। 'আতঙ্ক'র 'শাখাপ্রশাখা' 'নদী থেকে সাগরে' পৌঁছেছে। এই 'ক্ষুধিত পাষানে'র বিরুদ্ধে 'অভিযান' করতেই আমরা পেতেছি, 'অপুর সংসার'।

'সংসার'-এর 'প্রথম কদম ফুল' ফুটবে আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় বনগাঁ হাইস্কুলে। এই 'মাটির স্বর্গে' 'নতুন দিনের আলো' আনবার জন্য আপনিই আমাদের 'অগ্রদানী'। 'চেতনা'র 'অন্তর্ধান' থেকে 'ফেরা'-রই তো 'নাম জীবন'। সেই 'সংসার সীমান্তে' হবে 'অপরিচিতে'র সঙ্গে 'হঠাৎ দেখা'।

ইতি—

'অপুর সংসারে'র

সদস্য - সদস্যাবৃন্দ।

কার্যক্রম—গান-আবৃত্তি-শ্রুতি নাটক-'বই পড়া' শীর্ষক আলোচনা এবং একাঙ্ক নাটক।

সৎ সিনেমা　　　সৎ সাহিত্য　　　সৎ সংস্কৃতি

অপুর সংসার

মৌবরাজ্য, কোর্ট রোড, বনগাঁ।

সুমিত্র—

বিশ্বনন্দিত চিত্র পরিচালক, সাহিত্যিক, শিল্পী সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা ভারতের গর্ব। এ বছর তাঁর ৭৬তম জন্ম বার্ষিকী। আগামী ৫ই মে '৯৬ রবিবার তাঁকে কথায়, গানে স্মরণ করতে আমরা প্রয়াসী হয়েছি।

অবক্ষয়ের মাঝে এই সোনালী আয়োজনে আপনিও আমাদের শরিক হবেন এই আশা রাখি। ঐ দিন আমাদের প্রিয় অধ্যাপক মণি মণ্ডলের ৫ম মৃত্যু বার্ষিকী, তাঁকেও আমরা স্মরণ করব "উজ্জ্বল সংঘ" ভবনে আয়োজিত সান্ধ্য অনুষ্ঠানে।

তাং—১৫/৪/৯৬
বনগ্রাম।

বিনীত—
অপুর সংসারের সভ্য-সভ্যারৃন্দ

নানা বছরের সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তীর আমন্ত্রণ পত্র।

2006 Tuesday () February

* সৎ সাহিত্য * * সৎ সিনেমা * * সৎ সংস্কৃতি *

॥ অপুর সংসার ॥

যৌবরাজ্য ✪ কোর্ট রোড ✪ বনগাঁ ✪ উত্তর ২৪ পরগণা।

সুমিত্র,—

আগামী ২৭শে অক্টোবর '৯৬ রবিবার আমরা সারাদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছি বনগাঁ ললিতমোহন বাণী ভবনে।

এই আয়োজন আপনার উপস্থিতিতে রঙিন হয়ে উঠবে এই আশা রাখি।

তাং ৯/১০/৯৬

ধন্যবাদান্তে—

অপুর সংসার-এর
সভ্যবৃন্দ-সভ্যাবৃন্দ

সকাল ৯টায় : – "পাঠ-নাটিকা" প্রতিযোগিতা।
সন্ধ্যা ৬টায় : – আমন্ত্রিত নাট্যাভিনয়।
অংশগ্রহণে : – শিল্পায়ন (গোবরডাঙ্গা) ✪ নকুশা : –(গোবরডাঙ্গা) ✪ অপুর সংসার (বনগাঁ)

* সৎ সিনেমা * * সৎ সাহিত্য * * সৎ সংস্কৃতি *

অপুর সংসার

আমলাপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা।

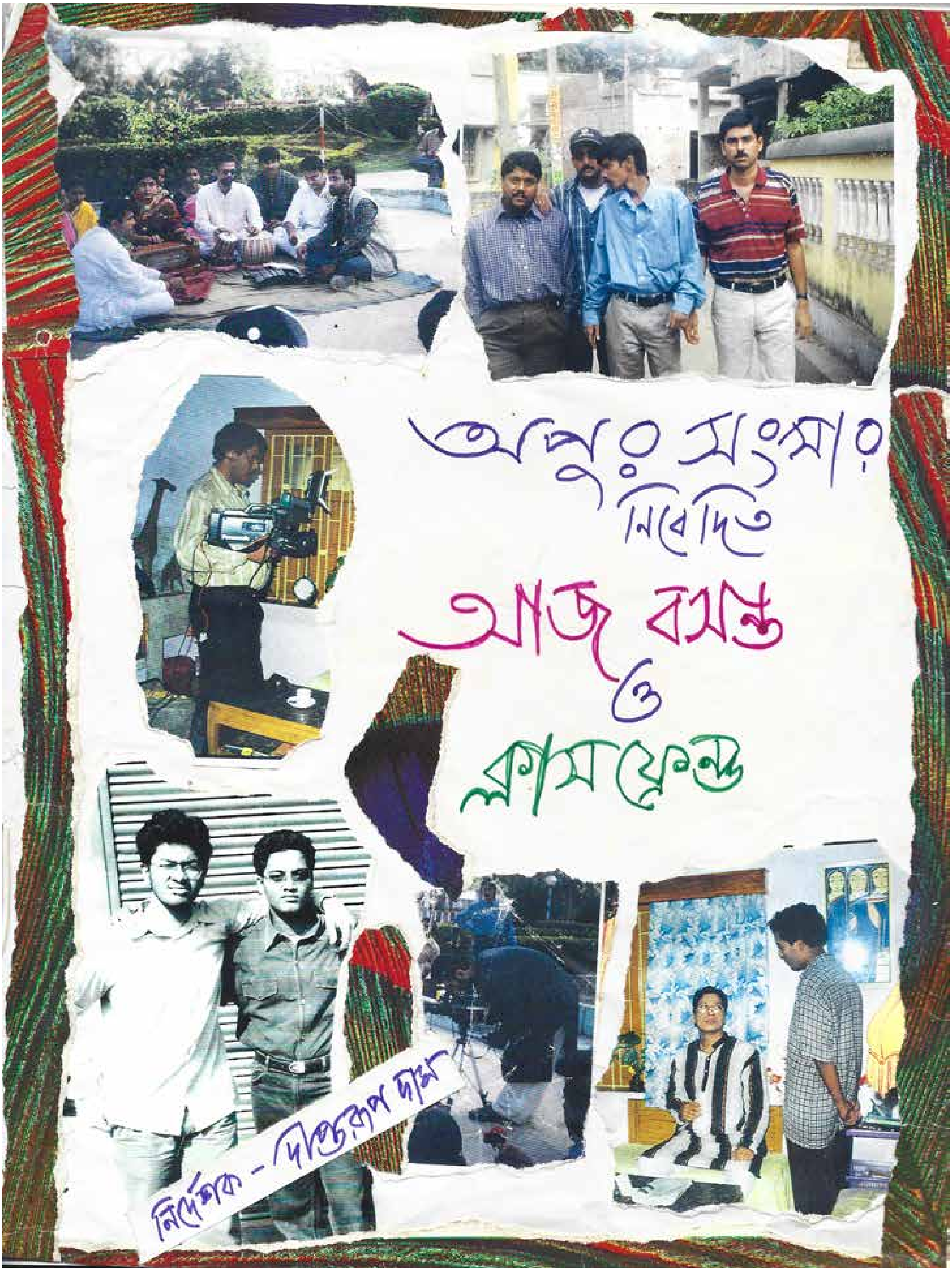
সুমিত্র,

বাংলার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আমরা আজও গর্ববোধ করি তার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভারত রত্ন সত্যজিৎ রায়। বস্তুতঃ তাঁরই হাত ধরে আমাদের সাবালকত্ব। এবছর তাঁর ছিয়াত্তর তম জন্ম বার্ষিকী। আগামী চৌঠা মে, রবিবার সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আমরা তাঁকে কথায়-গানে স্মরণ করবো বনগাঁ উজ্জ্বল সংঘ ভবনে।

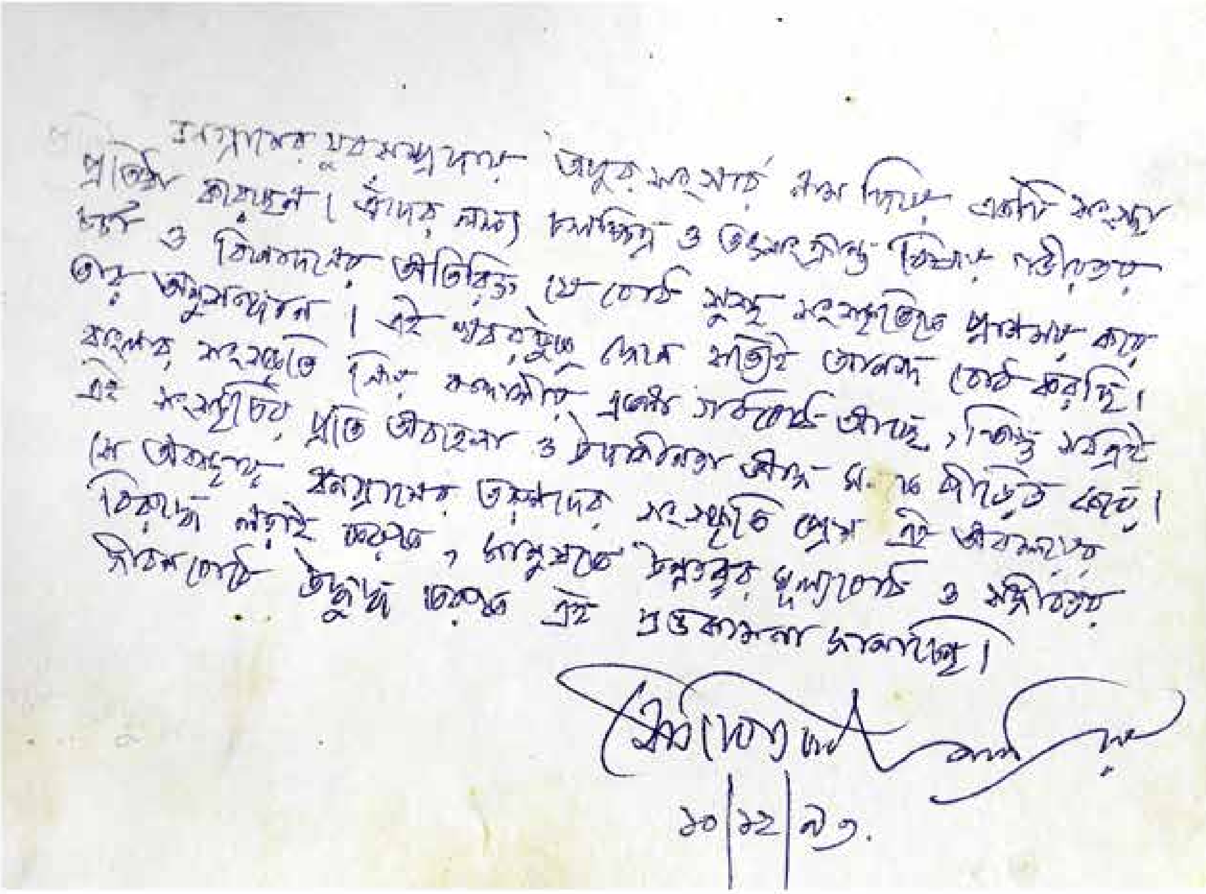
ওই একই দিনে আমরা আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ধনমনি মণ্ডলকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। এই পুণ্যাহে আপনার উপস্থিতিতে আমাদের প্রয়াস আলোকিত হোক।

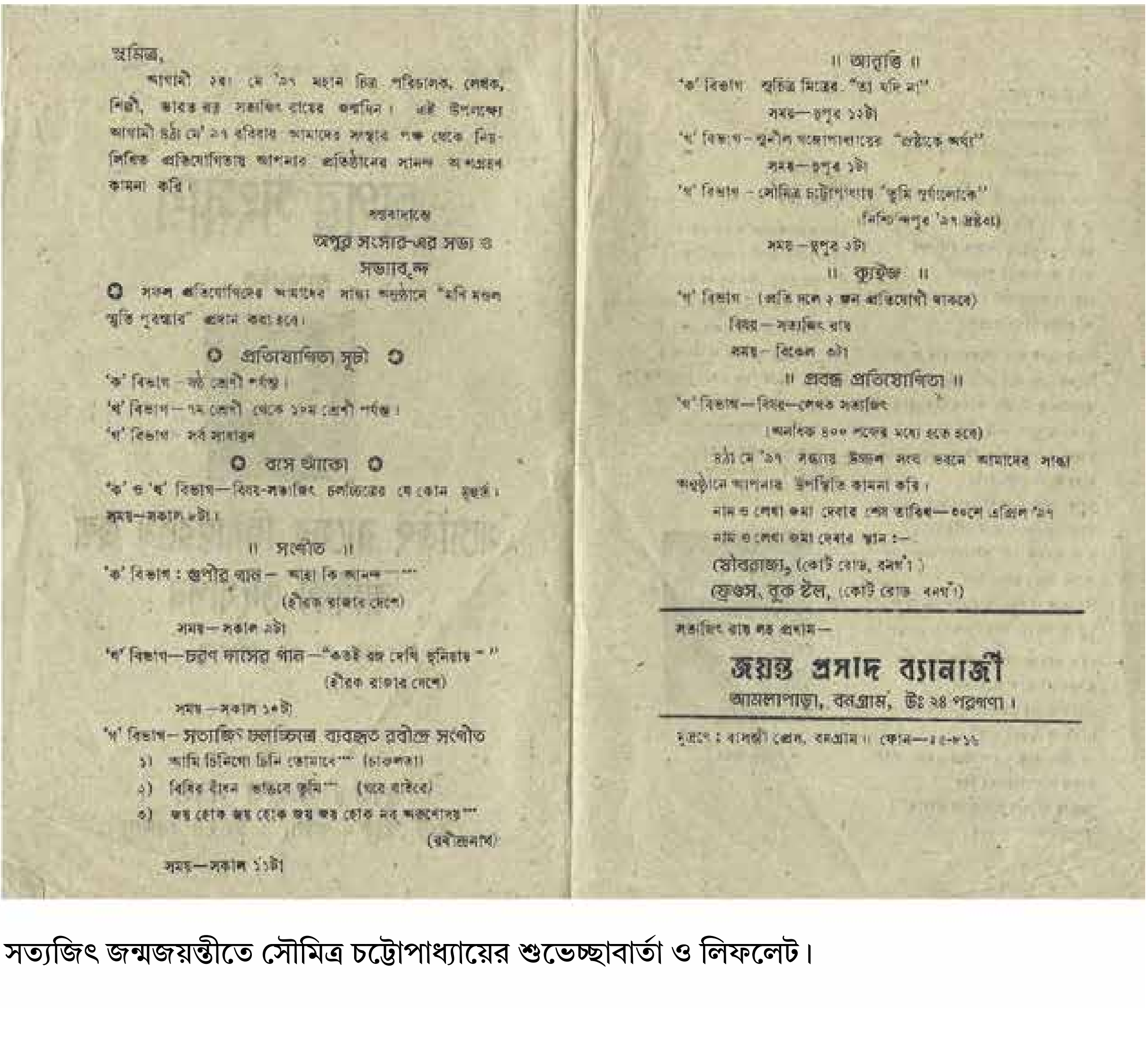
শুভেচ্ছান্তে—
অপুর সংসার-এর
সদস্য সদস্যা বৃন্দ

নানা বছরের সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তীর আমন্ত্রণ পত্র।



পরিচালিত জোড়া শর্টফিল্মের পোস্টার।





সুমিত্র,

আগামী ২রা মে '৯৭ মহান চিত্র পরিচালক, লেখক, শিল্পী, ভারত রত্ন সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে আগামী ৪ঠা মে' ৯৭ রবিবার আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে নিম্ন-লিখিত প্রতিযোগিতায় আপনার প্রতিষ্ঠানের সানন্দ অংশগ্রহণ কামনা করি।

শুভকামনায়

অপুর সংসার-এর সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ

সকল প্রতিযোগিদের আগামীর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে "রবি মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার" প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিতা সূচী

'ক' বিভাগ – ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত।
'খ' বিভাগ – ৭ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত।
'গ' বিভাগ – সর্ব সাধারণ

বসে আঁকো

'ক' ও 'খ' বিভাগ—বিষয়-সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের যে কোন মুহূর্ত।
সময়—সকাল ৮টা।

॥ সংগীত ॥

'ক' বিভাগ : গুপীর গান — আহা কি আনন্দ....
(হীরক রাজার দেশে)
সময়—সকাল ৯টা

'খ' বিভাগ—চরণ দাসের গান—"কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়...."
(হীরক রাজার দেশে)
সময়—সকাল ১০টা

'গ' বিভাগ— সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্র সংগীত
১) আমি চিনিগো চিনি তোমারে.... (চারুলতা)
২) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি.... (ঘরে বাইরে)
৩) জয় হোক জয় হোক জয় জয় হোক নব অরুণোদয়....
(রবীন্দ্রনাথ)
সময়—সকাল ১১টা

॥ আবৃত্তি ॥

'ক' বিভাগ : সুচিত্র মিত্রের "তা যদি না"
সময়—দুপুর ১২টা

'খ' বিভাগ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্রষ্টাকে অর্ঘ্য"
সময়—দুপুর ১টা

'গ' বিভাগ – সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় "তুমি স্বর্গালোকে"
(নিশি' অপুর '৯৭ গ্রন্থের)
সময়—দুপুর ২টা

॥ ক্যুইজ ॥

'গ' বিভাগ – (প্রতি দলে ২ জন প্রতিযোগী থাকবে)
বিষয়—সত্যজিৎ রায়
সময়– বিকেল ৩টা

॥ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ॥

'গ' বিভাগ—বিষয়—লেখক সত্যজিৎ
(অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে)

৪ঠা মে '৯৭ সন্ধ্যায় উজ্জ্বল সংঘ ভবনে আমাদের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

নাম ও লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ—৩০শে এপ্রিল '৯৭
নাম ও লেখা জমা দেবার স্থান :–
যৌবরাজ্য, (কোর্ট রোড, বনগাঁ)
ফ্রেণ্ডস, বুক স্টল, (কোর্ট রোড বনগাঁ)

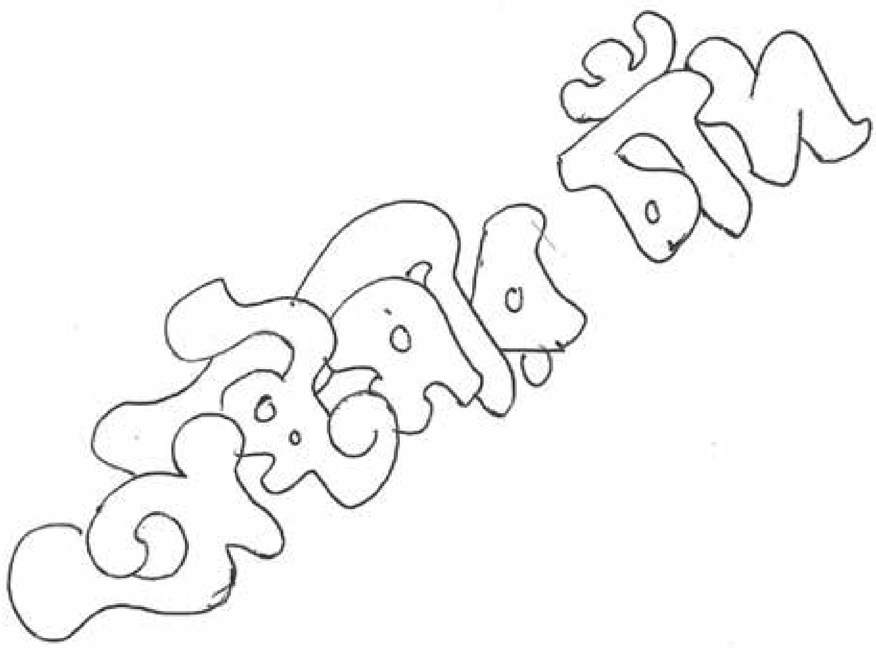
সত্যজিৎ রায় শত প্রণাম—

জয়ন্ত প্রসাদ ব্যানার্জী
আমলাপাড়া, বনগ্রাম, উঃ ২৪ পরগণা।

মুদ্রণে : বাসন্তী প্রেস, বনগ্রাম ॥ ফোন—২২-৮১৬

সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তীতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা ও লিফলেট।

পাণ্ডুলিপির কিছু পৃষ্ঠা



নিজের অজান্তে নিজেকে নিঃস্ব করেছি, অন্ততঃ চাকুরী
জীবনের প্রান্তে এসে ভাবছি কতখানি সফল আমি? যে
নিজে থেকে নিজেকে কখনই আনন্দ দিতে পারি না.
না অনার্স, না M.A., না B.Lib-এ কোনটিতেই সফলতা
হতে পারলাম না, তবুও; তবুও একেবারেই কি অসফল বলিয়া
মুক্তিকামী অন্যান্যদের. নিঃস্বতায় দুঃখের একটা যন্ত্র কিছু-
এতে পারলাম না? যেটিকে বলে তিতিক্ষা। তবু আমি
স্কুলের শিক্ষকদের স্নেহ আমার মধ্যে-স্কুলের ভালবাসা,
স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসায় জীবন আমার
বন্ধুদের ভালবাসা, বন্ধুদের ভালবাসায় জীবন আমার
এইসঙ্গে, বন্ধুদের পেয়েছি আমি, তাদের নিকটে আর
মনে কিছুই মনে পড়ে না তবুও সফলতা? তার কি কোনো
দাম নেই? এই ভালবাসাতেই তৃপ্তি অনেক পেয়েছি, নিঃস্বতঃ
আমার সাংস্কৃতিক জীবন এবং অভিনিবেশ আমার
আমার সাংস্কৃতিক জীবন এবং অনুষ্ঠানাদির এর জীবন আমার কর্ম
শিক্ষকতার জীবন এবং অনুষ্ঠানাদির এর জীবন আমার নিজের
জীবনের সবটা জুড়ে। সেইজন্যই আমি দিন আমার নিজের
কাটাতেন, এবং, শিক্ষকতার শুরু থেকে পেয়েছে পূর্ণতার সুখ
অনুভব, এবং, শিক্ষকতার শুরু থেকে শিক্ষা আমার নিজের
পেয়েছি, তাই, ১৯৭৬ সালের ১লা থেকে শিক্ষক আমার নিজের
শুরু হয়েছিল আর তিন. ১৯৮৬ সালের ২০শে অক্টোবর
ছাত্র স্কুলে হয় আর তিন, ১৯৮৬ সালের অনুষ্ঠানাদির জন্য
শিক্ষক আমার চাকুরী-জীবন অর্থাৎ অনুষ্ঠানাদির জন্য
শুরু হয়। আমার কোন প্রকারেই তৃপ্তির পর্যন্ত থেকে পারে
নি, আমার পরেই কোনো যে ঠিক নিয়ে অন্য কাজকর্ম,
সেই-জন্যই আমার জীবন আমার অবসরের ঠাঁই. যে
অবসর নিয়ে কাজ শুরু করেছি, প্রতিটিই আমার মনে
পড়ে যাচ্ছে, আমি পড়তেও এত পারছি;

যে সব সাহিত্যিকদের চিন্তাভাবনা 'নিয়ে' আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি
আমার প্রথম লেখাই, অর্থাৎ টি. এস. এলিয়টের এবং
ইয়েটসের প্রভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে। প্রকৃতিতে ঈশ্বর এই চিন্তার
স্থিতির ভেতর দিয়ে নিজের হৃদয়ের মাঝে মাঝে মুক্তিস্নানের অনুভব
ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়। প্রথম এ প্রকৃতি আমার এক বড় — পরিচয় - এই
বাংলার লোকেদের ভেতরে অর্থপূর্ণ সাহিত্যের আলোকপাতের মত,
শেক্সপিয়র এবং মধুসূদনের [illegible] [illegible] [illegible]
আমি [illegible] [illegible] এতই পৃথিবী থেকে [illegible] উঠে
এল। [illegible] এই [illegible] পৃথিবীর [illegible]। বিভূতিভূষণ
[illegible] যাঁদের আমি অগ্রজ বলে মনে করি। সাহিত্যের ভেতরেও
[illegible] আমি [illegible] এবং [illegible] ভেতরে [illegible] হয়েছে।
[illegible] - যুদ্ধ - ভালবাসা, এ সম্পর্কে [illegible] [illegible] আমার
জীবনের [illegible]। [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible]
[illegible] আমার [illegible] [illegible] হয়েছিল। [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] আমার [illegible] ঈশ্বরের [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] হয়
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] - এর [illegible]
'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]' আমাকে [illegible], [illegible] '[illegible]'
এই সাহিত্যিকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] - [illegible] [illegible]

অস্ট্রেলিয়া এ ভারত — দেশদুটিতেই আমাদের আবর্তন হয়
নিঃসঙ্গ মানুষ, আমাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যেও
নিজে অনুভব ও চেতনার গুণ প্রবর্তন হওয়ার জন্যই তীব্র
অনুভবী এ অস্ট্রেলিয়া দেশেই নির্ভরতার সুস্পষ্ট হতে
পারিনি। একথা '<u>মানুষ</u>' এ <u>মানুষের</u> কাছে [illegible] নির্দেশ
সুমনা হয়েছেন আমার যন্ত্রণা [illegible], জীবনযাপন
একটা দিক আমার — দেখিনি। এই জন্য আমার আমার, দুই দেশ
সত্যি হয়েছি। তবে, আমার মনে এই অভাব হয় যে আমার
শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্ব — এর অভাব কি হয়েছিল। ভারতে
(3) আমার মনে ভারতে মহিলাদের ও Industry হয় নি।
প্রথমে দেশের তুই বলা, তুই তুমি, তুই দিয়ে সম্বোধন
উচ্চারণ করে। এর পরে সহকর্মীদের দেশেও পুরুষ করে
আমার সহকর্মী বিদেশের, অস্ট্রেলিয়ান হলে আমরা সবাই
সাথে মেয়েটা তাকায়, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষিকা নিজেও সময়
অস্ট্রেলিয়ান পুরুষদের আপাতত হয়তো উচ্চারণ পুরুষটি
এক নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে। মেয়েদের পুরুষের প্রতি আচরণ
যেন ব্যবহার —' ভারতের মেয়েদের একমাত্র সম্মান হয়
নিরাপত্তার', প্রতিটি তাই, 'নিঃস্বার্থ নিরাপত্তার অভাব
উত্তর নেই। একই কারণে এই একই করছে! আমার প্রশ্ন'
'কেন?' এই প্রশ্নটাই কেবল মনে নেই। মেয়েরা স্বাধীন।
সর্বাঙ্গীণ পুরুষের এবং নিজেদের [illegible] উচিত হয়, তবু
পুরুষের করেই আছে। এখানে সামাজিক — এই মনের মহিলার — তাও
নিজে মাইকেলের পার্শ্বীয় নিয়েছে। তাই মেয়েদের। নিশ্চিত
এই দেশ।

আমার ছাত্র-জীবন

ছাত্রজীবন তো সারা জীবন জুড়েই, সেই জন্ম থেকে বাড়িতে দিদিমায়ে-
দের. তার পর তো শুরুই লেখা, স্কুলে, কলেজে, হাটে, মাঠে,
ঘাটে যেখানে যে চলছে. দিদি আমাকে অ-আ-ক-খ
লেখান, ছোটমামা - দিদিমা নিয়ে গেল মহেশ স্কুলে. তখন
বন্ধু-বান্ধবদেরই লেখাদের তাঁর অঙ্ক খাতায় মনে পড়ে
'ঝিকিমিকি রাতে আমি স্বপন দেখিনু', সেই শুরু হল আমার
আবৃত্তি চর্চা, এখনও পড়াদের মাঝে আমার ক্লাসে আবৃত্তিই
হয়. Class II এর পড়ার সময় দিদিমা দিয়ে হল: বালিগঞ্জে
হেস্টিংস হাউস আমি ভর্তি হই ক্লাসে.., দিদিমা দিয়েছিল নাম
(৭) মাতাইশ্বরীর কাছেই প্রথম শুনি 'রোমিও জুলিয়েট' নাম
দেখতে আসি, যেখানে আর দিই, মাতুলের হেস্টিংসের
আমার মাতাইশ্বরী সম্পর্ক ঠাকুরের জন্য স্কুলে দিয়েও
হেস্টিংসের পর, আমার প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার মনে
থেকে মাতাইশ্বরীর স্মৃতিতে আমার আমার কাছে অ-স্থা
জানি দেখিয়েছিল. তারপরই দিদিমা সম্পূর্ণ করে হাসিমুখে
আমার আবদার, প্রতিদিন বেড়াতে নিয়ে সম্পূর্ণ করেছে
যেন ঠিক তখন ছাত্রতে পারতাম না. সেই দিন থেকে
ছাত্রজীবনে হাসিমুখে দিয়ে, তখন থেকে, দুঃখ, আনন্দ,
বেশ আমার এত বেশি মানুষের আশিস, যে জীবনে,
  নিজে বহুবার পড়ি, মাতাইশ্বরীর নতুন গৌরব
অনুভবে আমাকে নিয়ে যায় হল জীবনের - সে, অ-স

মন থেকে মনে

পঁচিশ বছর। এক সঙ্গে সুখে-দুঃখে, মানে-অভিমানে, ঝগড়া-ঝাটি করে বেশ চলে গেল। মাঝে হারালাম আমাদের বাবা-মা মাখনলাল দাস, প্রতিমা দাস, চন্দ্রকান্ত দেবনাথকে। ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন আমাদের বন্ধু-দার্শনিক-শিক্ষকরা- পরিমল মুখোপাধ্যায়, মনি মণ্ডল, রতন সাধুরা। হঠাৎ করেই দাদা তড়িৎ দাসের চলে যাওয়াটা আজও মেনে নিতে পারি না।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। তাই ওঁদের স্মৃতিকে নিয়ে পাথেয় করে থাকি। ধর্মকে স্বীকার করিনি কোনও দিন। করবও না। হাজার সমালোচনা সত্ত্বেও শুধু মাত্র মনুষ্যত্ব-ধর্মকে নিয়ে কাটাব ভালবাসাময় জীবন। হাজার মাইল হাঁটতে পারি শুধু ভালবাসার জন্য এই আমাদের প্রত্যয়। অভিমানে সরে গেছে অনেক বন্ধুজন। যাদের আজও মিস্ করি। আবার পরম আত্মীয়তায় কাছে এসেছে অনেক নতুন বন্ধু। সাদর ভালবাসা।

ছেলে চার্বাকের ইচ্ছাতেই এই সংকলন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল লেখাগুলো। ওর ইচ্ছাতেই যা খুঁজে পাওয়া গেল তাই দিয়েই একটা মালা গাঁথার চেষ্টা। নিছক ছেলেখেলা। ভাল লাগলে আমাদেরও ভাল লাগবে। শেষ কথাটি বলি- যা চেয়েছি, যা পেয়েছি, তার তুলনা নাই...

২৭.৯.২০১০

(রচনা সংকলনের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখা।)

নিছক দুটি পরিবারের গল্প

ভারতবাবুরা ভিন্ন হলেন। ভাই পবিত্রবাবুর থেকে। মোটামুটি সুখেরই সংসার ছিল ওদের। ছোটবেলায় বাবা মা মারা যাওয়ার পর বাবার ব্যবসার ম্যানেজার বাবুই ওদের দেখাশোনা করতো। খুব বড় ব্যবসা না হলেও চলে যেত ওদের। ম্যানেজার কাকার তত্বাবধানেই ওরা ম্যাট্রিক পাশ করে, বিএ পাশ করে। একসময়ে পিঠোপিঠি দুই ভাই ভারত আর পবিত্র কাঠগোলায় গিয়ে বসে। সত্যি কথা কি ম্যানেজারবাবু ওদের এই গোলায় গিয়ে বসাটা পছন্দ করলেন না, বরং কিছুদিন আগেও যেমনটি বকাবকি করতেন তেমন ভাবেই হাঁকিয়ে দিলেন। ভারতরাও নাছোড়বান্দা। একদিন সত্যি সত্যি ভারত আর পবিত্র গোলায় গিয়ে খাতা খুলে বসলেন।

-এটা কি হলো কাকাবাবু?

- কি জানতে চাইছিস?

- হিসেব যে বড় গোলমাল দেখছি। তাছাড়াও বা নিজের অ্যাকাউন্টে এত টাকা নিয়ে কি করলেন?

- সে হিসাব কি তোকে দেব? তোদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছি, পড়াশুনা শিখিয়েছি, বিয়ে দিয়েছি কি এখন তোদের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য?

ওটাইতো ভুল করেছেন কাকাবাবু। আমাদের পড়াশুনা না শেখালে আমরাতো আপনার ফাঁকিটা ধরতে পারতাম না। যা হোক আপনি আপনার পথ দেখুন। এবার আমরাই ব্যবসা চালাতে পারবো। না হয় আপনি কিছু মাসোহারা নিয়ে যাবেন- ঠোঁটকাটা পবিত্র সাফসাফ উত্তর দেয়।

- আচ্ছা আমিও তোমাদের দেখে নেব। সত্যিই দেখে নিলেন ম্যানেজার বাবু। এক মুসলমান মহিলার সঙ্গে পবিত্রর গোপন সম্পর্ক আছে এই রকমটা নিরীহ ভারতবাবুর কানে ঢালতেই ভারতের সঙ্গে পবিত্রের ঝগড়া। পরিণতি ভারতবাবু তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের নিয়ে দক্ষিণ দিকের দোতলা বাড়িটায় থাকতেন। আর পবিত্রবাবু স্ত্রী পূর্বাকে নিয়ে উত্তরের একতলা বাড়িটা পেলেন।

সেই শুরু। তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া। বিশেষ করে একতলা দোতলা নিয়ে, তাছাড়া ব্যবসাও দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। একজনের বক্তব্য অন্য জন যথেষ্ট সম্পত্তি পেয়েছে। অন্যজন বলে- ওই আমাকে ঠকিয়ে বেশিটা হাতিয়েছে। এই নিয়ে নিত্য তিরিশ দিন ঝগড়াঝাটি। এমনকি পাড়ার লোকজনও এসে ঝগড়া মেটায়।

এর মধ্যে আবার একটা ঘটনা ঘটে। পবিত্রবাবুর স্ত্রী পূর্বার সঙ্গে পবিত্রবাবুর ডিভোর্স হয়ে গেল। পূর্বাদেবীও অন্য কোথায় চলে গেলেন। কুলোকে বলে এই ডিভোর্সের পেছনে নাকি ভারতবাবুর স্ত্রীর হাত ছিল। তিনিই নাকি পূর্বাকে বুঝিয়েছিলেন যে পবিত্র মাতাল এবং লম্পট। ওর সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

এদিকে ভারত এবং পবিত্র দুজনেই দুজনের বিরুদ্ধে কেস করে বসে আছেন। তার মধ্যে মাঝে মাঝেই দুজনের বাড়িতে মস্তানরা চড়াও হয়। ক্ষত-বিক্ষত হয় বাড়ি, ক্ষত বিক্ষত হয় মন। ভারতবাবুর স্ত্রীও একদিন আহত হন। মজা হল দুজনই কিন্তু আশ্রয় নিয়েছে পাড়ার মস্তান অমর কাকার। ওরই লোক একবার ভারতবাবুকে ঠেঙায়, একবার পবিত্রবাবুকে ঠেঙায়। এদিকে কেস চালাতে গিয়ে দুই পরিবারেরই টাকা জলের মতো খরচ হচ্ছে। ছেলে মেয়েরা দুবেলা খেতে পায় না, তাতে কি? জিততে তো হবে। এভাবেই এখনও চলছে। এর শেষ করে তা কেউ জানে না।

আসল কথাটাই বলা হয়নি। ভারতবাবু আমার বাবা, পবিত্রবাবু আমার কাকা, আমরা ভাইবোনেরা আর খুড়তুতো ভাই বোনেরা জানেন খুব চাই একে অন্যের বাড়িতে যেতে, খেলতে, আনন্দ করতে। কিন্তু আমাদের বাবারা তো তা চান না। কি করি বলুনতো!

গল্প সূত্র: টুর্ণামেন্টের ফাইনালে ভারত পাকিস্তান ম্যাচের সময় এই ইউরোপীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রাক্তণ ক্রিকেটার জাহির আব্বাস বলেন- ‘ভারত পাকিস্তান দুটি এশিয়ান দেশ। যেই জিতুক তা এশিয়ার জিত।’

প্রবন্ধ

বিস্ময়ে তাই জাগে

আমরা একা যেখানে একটা প্রাথমিক স্কুল গড়তে পারি না, সেখানে রবীন্দ্রনাথ একার উদ্যোগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন।

আজও যেখানে আমরা অপেশাদার নাটকের দলে অভিনেত্রী যোগাড় করতে হিমশিম খাই রক্ষণশীলতার কারণে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে একশ বছর আগে বাড়ির মেয়েদের দিয়ে নাটক অভিনয় করান।

আজ এই ২০১০ সালেও যদি কেউ বিধবাকে বিয়ে করে, আমাদের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন বিধবার সঙ্গে।

সাধারণ মানুষ সারাজীবন বিপ্লব করে শেষ জীবনে দীক্ষা নিয়ে ঠাকুর দেবতা নিয়ে পূজাঅর্চ্চনায় মেতে থাকে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে উপনীত হয়ে লেখেন ‘পুনশ্চ’। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন। মৃতের মিছিল গেছে রবীন্দ্রনাথের সামনে দিয়ে। যে কোনও লোক সব ছেড়ে চলে যেতেন আধ্যাত্মবাদী কোনও আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম এখানেই। আমৃত্যু তিনি থেকে গেছেন কর্মযোগী। আজ সার্ধশততম জন্ম দিবসে এই কর্মযোগীকে আমার প্রণাম।

সত্যজিৎ রায়: ছোটদের জন্য

’৮১ সাল, কলেজ থেকে ফিরছি। পোস্টারের লেখা টেনে নিল চোখ। ‘ছোটরা বড়দের নিয়ে এস’ লেখাটার ব্যঞ্জনা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এভাবে প্রচার! একেবারে অভিনব, অবশ্য যিনি বাংলা বিজ্ঞাপন জগতের দিগ্দর্শক তাঁর কাছে এই ভাবে ছবির দ্ব্যর্থতাকে বুঝিয়ে দেওয়া ছিল অনায়াস সাধ্য। ছবিটির নাম ‘হীরক রাজার দেশে’, তখন আমি না ছোট না বড়। সেই মানসিকতা থেকেই দেখলাম গুগাবাবা সিরিজের দ্বিতীয় ছবিটি। কী বলব ছবিটি সম্পর্কে? সুপার্ব? অতুলনীয়? বোধহয় কোনও ভাষাই বেরোয়নি আমাদের মুখ থেকে। ছোটদের জন্য যেন মেপে মেপে সংলাপ, চরিত্র, গান, সুর। রঙে রূপে ছন্দে মন ভরিয়ে দিয়েছিল আমাদের। ছবির মেজাজকে মাথায় রেখেই কবি অমিতাভ চৌধুরী সুন্দর সমালোচনা করেছিলেন ছড়ার মাধ্যমে।

বস্তুত, বাংলা তথা ভারতে প্রথম সারির চিত্র পরিচালক সমাজ সম্পর্কে ভাবেন, অর্থনীতি নিয়ে ভাবেন, গরিবের অধিকার রক্ষার কথা ভাবেন, বার্লিনের প্রাচীন নিয়ে ভাবেন, নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে ভাবেন, ভাবেন না শুধু ছোটদের নিয়ে। যারা কল্পনায় ভেসে যায় অ্যালিসের দেশে, গালিভারের দেশে, রবিনসন ক্রুসোর দেশে, ভূতপেতনী-দত্যিদানো অসম্ভবের দেশে। বোধহয় হাতে গুণে পাওয়া যায় ভাতীয় শিশু চলচ্চিত্রের সংখ্যা। যার জন্য বছর কয়েক আগে শিশু চলচ্চিত্র নিগমের সভাপতি অমল পালেকরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল চিল্ডেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’র কয়েকটি দৃশ্য কেটে দেখানোর। বাংলা শিশু চলচ্চিত্রের দায় প্রায় একাই নিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই জন্য তিনি শিশুদের একান্ত আপন।

ছোটদের জন্য সত্যজিৎ রায় কাহিনী চিত্র নির্মাণ করেন চারটি গুগাবাবা, হীরক রাজার দেশে, সোনার কেল্লা এবং জয়বাবা ফেলুনাথ। একটা মজার গল্প বলি, আমাদের পাড়ার এক ভদ্রমহিলা দেখে আসছিলেন সোনার কেল্লা’ ছবিটা। আমার মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কেমন লাগল?’ ভদ্রমহিলার ঝটিতি উত্তর- ‘কেমন আবার? বুঝলে ভাল না বুঝলে খারাপ।’ অর্থাৎ ভদ্রমহিলার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম মানেই দুর্বোধ্য, কঠিন কিছু একটা। কিন্তু কথাটা কখনই সঠিক নয়। ছবিতে গল্প বলার প্রবক্তা সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের ভাষায়- ‘কোনও রকম গালভরা প্রচার মূলক বক্তব্য পেশ না করে আমার ছবিতে আমি গল্পটাকেই উপস্থিত করতে চাই। প্রথম এবং অন্যতম কথাই হল তাকে একটা গল্প হতে হবে। আমি কাহিনীতে বিশ্বাস করি কারণ গল্প বলায় ভারতের একটা ঐতিহ্য আছে।’ আসলে ‘সহজ কথা যায় না বলা সহজে’ আর সেই সহজ কথাটিই ছোটদের জন্য বলেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর স্বাভাবিক মুন্সীয়ানায়। এবং আশ্চর্যভাবেই সেখানে অনুপস্থিত কোনও জ্ঞান বিতরণ, দেখানো ভাব আর জটিলতা। এই ভাবেই ছোটরা আর এক দুনিয়াকে আবিষ্কার করে। যেখানে রূপকথা, বাস্তব, কল্পনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ‘গুপিগাইন বাঘাবাইন।’ ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ জীবনীকার মারী সিটন লিখেছেন- বাস্তব ও কল্পনা দ্বিগুণ প্রকাশে এক রূপক vকাহিনী এমন এক আন্তরিক মজাদার সমসাময়িক চলচ্চিত্রে পরিণত হয় যার অর্থ ও তাৎপর্যের অনেকগুলি স্তর আছে (দ্য টাইমস্ - ১৯৬৯)। কিন্তু সম্ভবত কথাটি ঠিক নয়। কারণ সত্যজিৎ রায় বহু সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার ভাবে বলেন যে, শুধুমাত্র বালক পুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি এই ছবিটি করেন। কোনও রকম বার্তা

বহন না করেই। এ কথাটা বলার অর্থ হল যে তিনি শুধুমাত্র ছোটদের মনোরঞ্জনের কথাটাই মনে রাখতেন অন্য কিছু নয়। যে সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা সমালোচকের চোখে ধরা পড়ে তা নিতান্তই আরোপিত।

সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য কী করেছেন? এক কথায় তিনি আমাদের হাতে ধরে ফিল্ম দেখতে শিখিয়েছেন। তাই আজ যে সব জটিল শট্ আমরা দেখতে অভ্যস্ত সে সবই সত্যজিৎ তুলেছেন অনায়াস দক্ষতায়। সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের আর একটি বৈশিষ্টের কথা বলি, সেটা হল একটি সদর্থক ধারণা। যদি হীরক রাজার দেশে দেখা যেত হীরক রাজা সবাইকে শেষ পর্যন্ত মগজ ধলাই করে দিল বা হাল্লার যুদ্ধবাজ মন্ত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ হল বা ফেলুদা দুটি ক্ষেত্রেই হেরে গেল তাহলে কেমন হতো? কিচ্ছু হতো না। কারণ শিশু মনের অন্যতম চাহিদাই হল ইচ্ছাপূরণ। হিংসুটে, ঝগড়ুটে, মারকুটেদের সেখানে কোনও স্থান নেই। আছে শুধু সাদা রঙের অনাবিল আনন্দ। আর তাই তাদের ইচ্ছাপূরণের দাবি নিয়েই ভূতের রাজার বর নিয়ে আসরে নামে গুপিবাঘা আর মগজাস্ত্র নিয়ে ফেলুদা।

এটা ঠিক যে, সত্যজিৎ রায়ের ধমনী শিরাতে প্রবাহিত ছিল লেখকের রক্ত। শিশু সাহিত্যে রাজা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর রাজপুত্র সুকুমার রায় তাঁর সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ। তবুও ৩৭ বছর বয়সে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম লেখাটি লেখেন। অথচ এখনও তাঁর লেখা বই বেস্টসেলার- এটাকে কী বলব? নেহাত জন্মসূত্রে প্রতিভা নয়, আমার মনে হয় অসাধারণ দৃষ্টিশক্তিই দায়ী। যে ডিটেলিং- এর কাজ তাঁর সমস্ত ফিল্মে ছড়িয়ে অঅছে, তার ছাপ রয়েছে তাঁর লেখাতে। যে কোনও দৃশ্য যেন আমাদের চোখে ভাসে শুধুমাত্র তাঁর ডিটেলিং- এর গুণে।

যে অর্থে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় বা অবনীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যিক সেই অর্থে সত্যজিৎ রায় কিন্তু শিশু সাহিত্যিক নন, বরঞ্চ তাঁকে বলা যায় ছোটদের সাহিত্যিক কারণ তাঁর বইয়ের অধিকাংশ পড়ুয়াই তো দশোর্দ্ধ। শুধু ছোট বা বলি কেন, আমি নিজে দেখেছি সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে দশ বছরের খোকাটি ‘সেরা সত্যজিৎ’ নিয়ে গিলছে। কাজেই সত্যজিৎ-এর আকর্ষণ নয় থেকে নব্বই সবার কাছেই। তাঁর গল্পগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, অবশ্যই ফেলুদা এণ্ড কোং। দুই, প্রফেসর শঙ্কু। এবং তিন, তাঁর অসাধারণ ছোটগল্পের ঝাঁপি। সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় কী সিনেমা কী সাহিত্যে ছোট্ট মানুষটি সেজে ছোটদের কাছে তাঁর ঝুলি থেকে বের করেছেন অসাধারণ রঙীন সব জ্যান্ত চরিত্র।

বাংলা সাহিত্যে দুই ধারাকে এক জায়গায় নিয়ে এসে তৈরি হয়েছে অদ্বিতীয় ফেলুদা। একদিকে রয়েছে ব্যোমকেশ অন্যদিকে রয়েছে টেনিদা, ঘনাদা। এই দুই- এর মিশ্রণে ফেলুদা যে আমাদের চোখে জীবন্ত, চাল-চলনে আমাদেরই খুড়তুতো দাদা ফেলুদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনায়াসে ঘোরা হয়ে যায় বেনারস, রাজস্থান, নেপাল, গ্যাংটক। শুধু ভূগোল নয়, ইতিহাসও জানা হয়ে যায় সত্যজিতের বর্ণনার মাধ্যমে। এর সঙ্গে আবার আছেন জটায়ু বা লালমোহন গাঙ্গুলী। সত্যি সত্যিই জটায়ু আর তপসে ছাড়া ফেলুদা অসম্ভব। সত্যজিৎ রায়ের গভীর জীবনবোধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বৈচিত্র্য ও কৌতুকরসের অমর উদাহরণ হয়ে থাকবে জটায়ু চরিত্র।

ফেলুদার জনপ্রিয়তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বোধহয় সত্যজিতেরই আর এক প্রফেসর শঙ্কু। শঙ্কুর কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয়ে ১৩৩৮ সালে নায়ক 'ব্যোমযাত্রীর ডাইরি' নামে। এতে ছিল শঙ্কুর একুশ খানা ডাইরির হদিশ যা একের পর এক বের হয়। শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে অনেকে ডাইরিগুলো দেখতে 'সন্দেশ' কার্যালয়ে উপস্থিত হন। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্পকেও যে এমন টান টান করে বলা যায় তার পেটেন্ট একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের।

ছোট গল্পে সত্যজিৎ রায় যেন একেশ্বর, যার কোনও বিকল্প নেই। যেমন তুলনা নেই তাঁর 'খগম', 'বন্ধু', 'ম্যাজিসিয়ান', কাটুম-কুটুম', ক্লাসফ্রেন্ড'- এর মতো অজস্র গল্পের। সত্যজিতের ছোট গল্পের ভাষা 'এমন কথা বলে বোঝেরে সকলে, উচা নিচা ছোট বড় সমান' এমন বিষয়, এমন ঘটনা সমাবেশে, রূপ ও রসের এমন বৈচিত্র্য তো সহজে মেলে না। ছোট গল্পগুলো যেন এক একটি বিশ্বকোষ। তাঁর গল্পের নামকরণও জুড়িহীন। অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি সেখানে। লক্ষ্য করুন কৈলাশে কেলেংকারী, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে। শুধু তাই নয়, তাঁর গল্পের লেখক লালমোহন বাবুর লেখা বইয়েরও ঐ দশা- সাহারায় শিহরণ, দুর্ধর্ষ দুশমন, করাল কুম্ভির।

সত্যজিৎ রায় শুধু সাংবাদিকের মতো নিস্পৃহ গল্প বলেননি, সব সময় চেষ্টা করেছেন কী করে হামবড়া লোকটাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, দুর্বলকে যারা ঠকায় তাদের উচিত শাস্তি দিতে। তাই 'ঘুরঘুটিয়ার কাহিনী'তে ফেলুদা বলে- 'খুনীর হাত থেকে উপহার নেবার বাসনা নেই আমার।' যে সব সাহেব এখনও নেটিভদের ঘৃণা করে সত্যজিৎ, থুড়ি ফেলুদা সাহেবের কাছ থেকে তদন্তের খবর নিতেও অস্বীকার করে (লন্ডনে ফেলুদা)। এইখানেই সত্যজিতের মহত্ত্ব, কৃতিত্ব। তাই আমরাও বলি "মহারাজা তোমার সেলাম।"

মহান দার্শনিক বি. ডি. স্পিনোজা এবং তাঁর ঈশ্বরতত্ত্ব

আগের যুগটা ছিল বিশ্বাসের যুগ। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর।' এইভাবে যুগযুগ ধরে শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও ধর্মভীরু লোকগুলোকে বোকা বানিয়ে রাখতেন গীর্জার বিশপ, মসজিদের মোল্লারা এবং মন্দিরের পুরোহিতরা। ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্ট প্রথম ডাক দিয়েছিলেন - Doubt Everything. এই সন্দেহের বর্শা হাতে নিয়েই জন্ম হল আধুনিক যুগের যুক্তিবাদের যুগের।

এই বাতাবরণেই বেরুখ স্পিনোজার জন্ম হল্যাণ্ডে, ১৬৩২ সাল, না, হল্যান্ড তার আদি বাড়ি নয়। বাড়ি ছিল আগে স্পেন বা পর্তুগালে। কিন্তু সেখানে খ্রীষ্টানদের অত্যাচারে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন এই ইহুদি পূরিবার। মাতৃভাষা স্প্যানিস ছাড়াও বেরুখ জানতেন ডাচ, ইতালিয়ান, ফরাসী, পর্তুগীজ-হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন। এইভাবে তিনি আসেন ইতালীয় দার্শনিক ব্রুনোর দর্শনের কাছাকাছি। ব্রুনো ছিলেন ধর্মবিরোধী। তাই ধর্মীয় বিচারকরা তাকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন কারণ খ্রীষ্টান ধর্মে 'রক্তপাত' নিষেধ। যা হোক স্পিনোজা গীর্জায় যান না বরঞ্চ বলেন যে ইহুদি খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

এমনকি যীশুখ্রীষ্টকেও ঈশ্বরপুত্র বলে মানেন না। তার কাছে যীশু হলেন সর্বোত্তম মানুষ। স্পিনোজার যে মত দর্শনের ইতিহাসে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে তা হল তার ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি বলেন যে ঈশ্বর বলে আলাদা কিছু নেই। বরঞ্চ এই জগতই হল ঈশ্বর। ঈশ্বর হলেন জগতের আত্মা, আবার জগৎ হল ঈশ্বরের দেহ, এক কথায় প্রকৃতিই হল ঈশ্বর। কাজেই পুজো করা, মানত করা নিষ্প্রয়োজন।

যদি প্রকৃতিই একমাত্র সত্তা হয় তবে অন্য সবকিছু হয়ে পড়ে অলীক। এতে কি হল? যারা এতদিন ঈশ্বরের দালাল হয়ে সাধারণ মানুষের পুজো বা মানত থেকে ভাগ বসাচ্ছিল। তাদের পেশাটা হয়ে পড়ল অর্থহীন। কারণ প্রকৃতি যখন অপরিবর্তনীয় তখন মিছিমিছি ঈশ্বর বা 'উপরওয়ালার' কাছে অনুরোধ অর্থহীন। স্বভাবতই এতে ধর্মীয় পুরোহিতরা স্পিনোজার সংঘবদ্ধ হন। এবং তাদের বিচারে (১৬৫৬ সালে) স্পিনোজাকে এক ঘরে করা হল, তার ধোপা নাপিত বন্ধ করা হল। এইভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে অন্য যে কেউই হয়ত ঈশ্বরের কাছেই আবেদন জানাত। কিন্তু স্পিনোজা ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। যে সব গুণ ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, দয়াময় করে, সেই ঈশ্বরকে তিনি স্বীকার করেন না। তার কাছে তিনি আবেদন জানাবেন কীভাবে?

স্পিনোজা ছিলেন আজন্ম আপোষবিরোধী। ইচ্ছা করলে তিনি বহু কিছু সুযোগ নিতে পারতেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই তাকে শর্তসাপেক্ষে বৃত্তিদানের প্রস্তাব দেন। জার্মানী হাইডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্মবিরোধী কোনও কথা না বলার কড়ারে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ দেন। কিন্তু স্পিনোজা এসব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা তখন স্পিনোজাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে করে। তখন বেরুখ স্পিনোজা শহর ছেড়ে পালান এবং নতুন নাম নেন বেনেডিক্ট ডি. স্পিনোজা। এ প্রসঙ্গে আরও তিনজন আধুনিককালের মনীষীর নাম বলা যায়, যারা বাধ্য হয়েছিলেন মাতৃভূমি ত্যাগ করতে। এরা হলেন কার্ল মার্কস, সিগমন্ড ফ্রয়েড ও আইনস্টাইন।

ধর্ম এবং তথাকথিত ঈশ্বরবিরোধী এই মহান দার্শনিক শেষ পর্যন্ত জীবন ধারণ করেন সামান্য কাঁচ ঘষার কাজ করে। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সবার অজ্ঞাতে মারা যান। আসুন, তার প্রতি হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধা নিবেদন করি। স্পিনোজার মূল বক্তব্যগুলি হল:

----একমাত্র দ্রব্য হলেন ঈশ্বর বা প্রকৃতি।

-----যে জ্ঞানী সেই মুক্ত।

------জ্ঞানই মুক্তি, মোহের বন্ধন, আবেগের বন্ধন থেকে মুক্তি। প্রায় এই কথাগুলিই বলেছেন আমাদের দেশের মহান বৈদান্তিক দার্শনিক শংকরাচার্য স্পিনোজার ৮০০ বছর আগে। শংকরও বলেন যে, ব্রহ্ম বা পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ- নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ আনন্দ স্বরূপ। এবং ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।

কিন্তু অবোধ মানুষ অবোধ্য অজ্ঞতাবশত মায়াপ্রভাবে ব্রহ্মতে গুণ আরোপ করে

এবং সেই সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজা-আর্চা ইত্যাদি করে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান হলেই আমাদের ব্রহ্ম জ্ঞান হবে। 'সোহহম্'- আমরা জানতে পারব যে জীব এবং ব্রহ্ম আসলে একই। তাই তোমার সঙ্গে আমার কোনও পার্থক্য নেই- জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। এর থেকে অন্তত অনুমান করা যায় যে মানবতাবাদী দর্শন ভারতীয় দর্শন সারা বিশ্বেই একদিন তার প্রভাব ফেলেছিল এবং তারই ফলশ্রুতি হল বিশ্বখ্যাত অদ্বৈতবাদ তথা যুক্তিবাদের প্রবক্তা মহান বিধর্মী ম্লেচ্ছ, মানবতাবাদী দার্শনিক বেরুখ স্পিনোজা।

সহায়ক গ্রন্থ

- পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য।
- পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা-রমাপ্রসাদ দাস।
- ভারতীয় দর্শন-সেনগুপ্ত।
- জগৎগুরু শংকরাচার্য- মন্টু চক্রবর্তী।
- প্রমিথিউসের পথে- উৎস মানুষ।

সত্যজিৎ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও পিতা সুকুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল গভীর। সত্যজিৎও প্রথম যৌবনে শান্তি নিকেতনে শিল্পশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও নন্দলাল বসুর শিক্ষা সত্যজিতের শিল্পদৃষ্টিকে অনেকটাই নির্মাণ করে দিয়েছিল সে কথা বহুবার স্বীকার করেছেন স্বয়ং সত্যজিৎ।

সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল তিনি নিজের ফিল্ম জীবন শুরু করবেন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়ে। এ বিষয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা, বেশ খানিকটা এগিয়েছিলেন। কথা ছিল ছবির চিত্রনাট্য লিখবেন সত্যজিৎ। পরিচালনা করবেন হরিসাধন দাসগুপ্ত। কিন্তু নানা কারণে 'ঘরে-বাইরে' প্রকল্প বাতিল হল। সৌভাগ্য আমাদের। এই প্রকল্পটি যদি সাফল্য পেত তাহলে বাংলা ছবিতে সত্যজিতের আবির্ভাব ঘটত চিত্রনাট্যকার হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্যকার অনেকটা আড়ালেই থাকেন। কাজেই এক হিসাবে ছবিটি নির্মিত হতে পারেনি সেটা একপক্ষে ভালই হয়েছিল।

রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে সত্যজিতের সপ্তম ছবি 'তিনকন্যা'। তবে এরও আগে 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্র দিয়েই সত্যজিতের রবীন্দ্রযাত্রা। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে ভারত সরকারের তরফ থেকে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তাব হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চেয়েছিলেন এটি নির্মাণ করুন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রাজি হন। প্রচুর পরিশ্রম করে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করা হয়। এরই নাম 'রবীন্দ্রনাথ- পোট্রেট অব এ ম্যান'- শিল্পী সত্যজিৎ রায়। দিল্লিতে পণ্ডিত নেহরু ও অন্যান্যদের সামনে ছবিটি পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী দেখে

উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

সম্ভবত এ তথ্যচিত্র নির্মাণ করার অবকাশেই সত্যজিতের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে ছবি করার কথা আসে। তথ্যচিত্রটিতে রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রায় সব প্রসঙ্গই এসেছিল শুধু গল্প-উপন্যাস বাদে। তাই তিনি একই সময়ে কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন তিনটি গল্প নিয়ে। ছবির নাম 'তিনকন্যা'। ছবির বিষয়গত অবস্থান তথ্যচিত্রের পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীতে ১৯৬১ সালে 'পোস্টমাস্টার', 'মনিহারা' এবং 'সমাপ্তি' অবলম্বনে নির্মিত হয় তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। এক্ষেত্রে 'তিনকন্যা' নাম দিয়ে সেই ছবি পরিবেশিত হয়। তিনটি ছবিই য়ে দর্শকের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে তা নয়। সমালোচকদের অনেক অভিযোগ বর্ষিত হয় পরিচালকের বিরুদ্ধে। সব থেকে বড় অভিযোগ হল রবীন্দ্রনাথের গল্পে সত্যজিৎ মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন। এমন সব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন যা রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। বিশেষত 'পোস্টমাস্টার' ছবির শেষ অংশের সঙ্গে গল্পের একবারেই মিল নেই।

১৯৬৮ সালে নির্মিত চারুলতা (নষ্টনীড় অবলম্বনে) ছবি নিয়েও অনেক বিতর্ক উঠেছিল। সমালোচনা হয়েছিল- 'প্লট এবং থীম, রস, চরিত্র সবই পরিবর্তিত করার পরও চারুলতাকে নষ্টনীড়ের চিত্ররূপ বলে পরিচালক বিজ্ঞাপিত করেন কোন যুক্তিতে জানতে কৌতূহল হয়।' এই প্রশ্নের উত্তর সমরেশ বসু দিয়েছিলেন তাঁর আলোচনায়, 'সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের এক বিশ্বস্ত ও অপরূপ চিত্রসৃষ্টি- রবীন্দ্রনাতের ভাবনার মধ্যে যে তীব্রতা লুকিয়েছিল, সত্যজিৎ তাকেই প্রকাশ করেছেন। ভূপতি ও চারু, এই দম্পতির প্রাণের ভাষা ভাঙার যে ভয়ঙ্কর পরিণতি, যে দুঃসহ হাহাকার পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ভাষার মধ্যে ফুটে উঠেছে তার প্রতিট ঝংকারই আমাদের অনুভূতিতে একই সুরে বেজে উঠেছে।'

মূলগল্প থেকে সরে এসেও যে অসামান্য ফিল্ম তৈরি হতে পারে তার উজ্জ্বল প্রমাণ চারুলতা। 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প, চারুলতাও সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। সত্যজিৎ নাকি এই ছবিটিকেই নিজের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করতেন। অথচ সিনেমা-রসিক মাত্রই জানেন চারুলতা নির্মাণের সময় সত্যজিৎ মূল গল্প থেকে কতটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। শেষ দৃশ্যে ভূপতি, চারু পরস্পরের দিকে হাত বাড়ায় কিন্তু হাত অস্পর্শিত থেকে যায়। এখানেই সাহিত্যের চিত্ররূপের অসামান্যতা। চিত্রনাট্য রচনার সময় সত্যজিৎ এ ধরণের স্বাধীনতা নিয়েছিলেন বলেই চারুলতা ফিলম্ হিসাবে অন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল।

অবশেষে, ২০ বছর পরে ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ নির্মাণ করেন 'ঘরে- বাইরে'। 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে উপন্যাস থেকে সত্যজিৎ বরং তেমন সরে আসেননি। আমরা জানি না চারের দশকে 'ঘরে-বাইরে'র যে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল তার চেহারা কেমন ছিল। প্রায় চার দশক ধরে লেখা চিত্রনাট্যটি নতুন করে যে লেখা হয়েছিল তা বোঝা যায়। অসুস্থতার কারণে সত্যজিৎকে চিত্রনাট্য লিখতে হয়েছিল যথাসম্ভব বহির্দৃশ্য বাদ দিয়ে। যেটুকু ছিল তা তুলেছিলেন সন্দীপ রায়। স্বভাবত, সিনেমার চরিত্রকে ক্ষুন্ন করে এই ছবিতে সংলাপের

বাহুল্য দেখা যায়। এই উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল তা যেন ছবিতে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রকাহিনী অবলম্বিত সত্যজিতের ছবিগুলির মধ্যে 'ঘরে-বাইরে'-কে তেমন উজ্জ্বল মনে হয় না। তবে কি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস কিংবা সিনেমার রস স্থান, কাল, পাত্রে সীমাবদ্ধ। কালোত্তীর্ণতার দাবি সেখানে নিরর্থক। ১৯৬১-র উপন্যাসকে ১৯৮৪- এ ব্যাখ্যা। তাতে ওই উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বের স্বদেশী মাত্রা না থাকবারই কথা। সন্দীপের সঙ্গে স্বদেশী যুগের আবহাওয়ার যে সংলগ্নতা, যার ফলে সন্দীপ এক সচেতন চরিত্র এবং ভিলেন নয়। ১৯৮৪-তে সেই সন্দীপে মধ্যশ্রেণির দিশেহারা মূল্যবোধহীনতাই প্রবল। ফলে সত্যজিতের 'ঘরে-বাইরে' নিতান্তই তার ছবি। এর ভাল-মন্দ সেভাবেই বিবেচ্য।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে দেখা নয়, নিবিড় শান্তি নিকেতনী ভাব সত্যজিতের প্রতিটি শিল্পকর্মে অদৃশ্য সূতোর মতো কাজ করে গেছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অফুরান যোগান সত্যজিতের ফিলমে বারবারই এসেছে আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণভাবে। টুকরো টুকরো তো বটেই সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ বহুবার তার ফিলমে। তারই একটি চিত্র পাই আমরা নীচের তালিকা থেকে

১. রবীন্দ্রনাথ

ওই মহামানব আসে হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু

২. তিনকন্যা (মণিহারা)

বাজে করুণ সুরে (রুমা গুহঠাকুরতা)

৩. কাঞ্চনজঙ্ঘা

এ পরবাসে রবে কে (অমিয়া ঠাকুর)

৪. চারুলতা

আমি চিনি গো চিনি তোমারে (কিশোর কুমার) ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে

৫. ঘরেবাইরে

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি (কিশোর কুমার)

৬. জনঅরণ্য

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে (শর্মিলা পোমো রায়)

৭. শাখা-প্রশাখা মরিলো মরি আমারে বাঁশীতে (শ্রমণা গুহঠাকুরতা) ডেকেছে কে

৮. আগন্তুক

বাজিল কাহার বীণা (শ্রমণা গুহঠাকুরতা)

লেখক সত্যজিৎ রায়

বাংলার মানিক ভারতের গর্ব সত্যজিৎ রায় ২৩শে এপ্রিল তার অপার কীর্তিকে পেছনে ফেলে চলে গেছেন পরপার জয় করতে। বহু গবেষণা হবে তার অতুল কীর্তি সিনেমা, গ্রাফিক ডিজাইন, সংগীতের, সাহিত্যের। তবু এখানকার ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আলোচনার স্পর্দ্ধা দেখিয়ে ভুল করলাম কিনা পাঠক বিবেচনা কররেন।

এটা ঠিক যে, সত্যজিৎ রায়ের ধমনী-শিরাতে প্রবাহিত ছিল লেখকের রক্ত। শিশু সাহিত্যের রাজা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর রাজপুত্র সুকুমার রায় তার সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ। তবুও ৩৮ বছর বয়সে সত্যজিৎ প্রথম লেখাটি লেখেন। অথচ এখনও তার লেখা বই বেস্ট সেলার। এটা কী বলব? নেহাৎ জন্মসূত্রেই প্রতিভা নয়। আমার মনে হয় তার অসাধারণ দৃষ্টিশক্তিই এর জন্য দায়ী। কোথায় যেন পড়েছিলাম সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'আমার সিনেমার বা লেখার অধিকাংশ কথাই রাস্তার লোকেদের মুখে শোনা।'

বাংলা সাহিত্য ফুলে-ফলে-পত্রে বহুদিন সমৃদ্ধ। তবুও ছোটদের জন্মদিনে বই দেওয়ার জন্য আজও তাকের পর তাক খুঁজতে হয়। বস্তুত বড় বড় লেখকরা ছোটদের জন্য ভাবতেই নারাজ। সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় কি সিনেমা, কি সাহিত্যে ছোট্ট মানুষটি সেজে ছোটদের কাছে তার ঝুলি থেকে বের করেছেন অসাধারণ রঙিন সব জ্যান্ত চরিত্র। সুনীল গাঙ্গুলী, সমরেশ বসু, প্রেমেন মিত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি - শুধু মাত্র শিশু সাহিত্য লিখেই উপার্জন করা একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব। (উনি নিজেই বলেছেন, আমার সংসার চলে ছোটদের জন্য বই লিখে) একটা ভুল কথা বারবার বলা হয়ে থাকে। যে অর্থে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় বা অবনীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যিক সে অর্থে সত্যজিৎ রায় কিন্তু শিশু সাহিত্যক নন। বরঞ্চ তাকে বলা যায় ছোটদের সাহিত্যিক কারণ তার বইয়ের অধিকাংশ পড়ুয়াই দশোর্দ্ধ। শুধু ছোটই বা বলি কেন আমি নিজে দেখেছি সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে দশ বছরের খোকাটি 'সেরা সত্যজিৎ' নিয়ে গিলছে। কাজেই সত্যজিৎ-এর আকর্ষণ নয় থেকে নব্বই সবার কাছেই। সত্যজিৎ-এর গল্পগুলিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি (চিত্রনাট্য বা প্রবন্ধ যেমন 'বিষয় চলচ্চিত্র' ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে)। এক, অবশ্যই ফেলুদা এণ্ড কোং। দুই, প্রফেসর শঙ্কু। এবং তিন, তার অসাধারণ ছোটগল্পের ঝাঁপি।

বাংলা সাহিত্যের দুই ধারাকে এক জায়গায় নিয়ে এসে তৈরি হয়েছে অদ্বিতীয় ফেলুদা। একদিকে রয়েছে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, অন্যদিকে রয়েছে টেনিদা, ঘনাদা,

ব্রজদা - এই দুইয়ের মিশ্রণে ফেলুদা। যে অনেকেরই চোখে জীবন্ত। সাতাশ বছরের এই যুবক কথাবার্তায়, চালচলনে কখন যে আমাদের খুড়তুতো দাদা হয়ে উঠেছে তা জানতেই পারিনি। ফেলুদার কাহিনীর মধ্যেই রয়েছেন সত্যজিৎ- এর অমর সৃষ্টি জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলী। ফেলুদা, তপসে আর জটায়ু এই ট্রায়োর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনায়াসেই ঘোরা হয়ে যায় বেনারস, রাজস্থান, নেপাল, গ্যাংটক, পুরীর মতো জায়গা। শুধু ভুগোল নয়, ইতিহাসও জানা হয়ে যায় সত্যজিৎ- এর মজার মজার সব বর্ণনার মাধ্যমে। এর সঙ্গে আবার আছেন লালমোহন গাঙ্গুলী- ভুল বলা এবং ভয় পাওয়া যার সহজাত। সত্যি সত্যিই যেন জটায়ু ছাড়া ফেলুদা অসম্পূর্ণ। ফেলুদার জনপ্রিয়তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ হয় সত্যজিতেরই আর এক নায়ক - প্রফেসর শঙ্কু। প্রফেসর শঙ্কুর কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৮ সনে। 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' নামে। এতেই ছিল শঙ্কুর একুশ খানা ডায়েরীর হদিশ যা একের পর এক বের হয়। শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে অনেকে ডায়েরীগুলো দেখতে 'সন্দেশ' কার্যালয়ে চলে আসেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্পকেও এমন টানটান করে গলা যায় তার পেটেন্ট একমাত্র সত্যজিৎ রায়।

ছোটদের ছোট গল্পে সত্যজিৎ রায় যেন একেশ্বর। সত্যিই যার কোনও বিকল্প নেই। যেমন নেই তার 'খগম', 'বন্ধু', ম্যাজিশিয়ান', 'কুটুম কাটুম', ক্লাসফ্রেন্ড' - এর মতো অজস্র গল্পের। সত্যজিতের ছোট গল্পের ভাষা 'বোঝে রে সকলে উচা নিচা ছোট-বড় সমান'। তাঁর গল্পের আবেদন একদিকে আমাদের ভাবনার কাছে, অন্যদিকে আমাদের কল্পনার কাছে। প্রতিটি গল্প সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, গল্পগুলিতে একটি পরিমিতি, পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়।' এমন বিষয়, এমন ঘটনা সমাবেশ, রূপ ও রসের এমন বৈচিত্র তো সহজে মেলে না। মাঝে মাঝে তো মনে হয় ছোট গল্পগুলোই যেন এক একটি বিশ্বকোষ। 'ভেন্ট্রিকুইলিজম' মানে যে মুখ না নাড়িয়ে কথা বলার শিল্প সত্যিই পড়বার আগে জানতাম না। সত্যজিতের অনেক গল্পের মধ্যে যে গা ছমছম করা বর্ণনা তা যে হাড় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। 'খগম্' গল্প পড়তে গিয়ে যেখানে ধূর্জটিবাবু ধীরে দীরে সাপ হয়ে যাচ্ছেন তখন পা শিরশির করেনি এমন লোকের সংখ্যা নেই বোধহয়। অন্তত আমার তো হয়েছিল।

অবাক হয়ে ভাবি, অমন গম্ভীর লোকটার মনে এত হাসি কী করে লুকিয়ে থাকত? রাজশেখর বসুর শিষ্য নয়তো! হাসির যোগানদার জটায়ু একাই একশো। তিনি 'হ্যা' আর 'ইয়েস' এক সঙ্গে বলেন হ্যায়েস। জয় বাবা ফেলুনাথের একটি লাইন - 'লালমোহন বাবুর ভুরু দুটো উপর দিকে উঠে এক জোড়া খিলেন হয়ে গেল।'

তার গল্পের নামকরণও জুড়িহীন। অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি সেখানে। লক্ষ্য করুন কৈলাসে কেলেঙ্কারী, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে, শুধু তাই নয়, তার গল্পের লেখক লালমোহনবাবুর লেখা বই এরও ঐ দশা- 'সাহারায় শিহরণ'।

সত্যজিৎ রায় শুধু সাংবাদিকের মতো নিস্পৃহ গল্প বলেননি। সব সময় চেষ্টা করেছেন কী করে হামবড়া লোকটাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। দুর্বলকে যারা ঠকায় তাদের উচিত শাস্তি দিতে। তাই ঘুরঘুটিয়ার কাহিনীতে ফেলুদা বলে, 'খুনীর হাত থেকে উপহার নেবার কোনও বাসনা নেই আমার।' শুধু তাই নয় যে সব সাহেব এখন নেটিভদের ঘৃণা

করেন, সত্যজিৎ থুড়ি ফেলুদা সাহেবের কাছ থেকে খবর নিতে অস্বীকার করেন (লন্ডনে ফেলুদা)। এখানেই সত্যজিতের মহত্ব, কৃতিত্ব, তাই আমরা সবাই বলি- 'মহারাজা তোমারে সেলাম।'

পুনশ্চ: পরিশেষে একটা অনুরোধ, সরকার-বেসরকার সবাই সত্যজিতের নামে অনেক সভা করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। ভালো কথা। কিন্তু যেখানে সুদূর ফ্রান্সে অনুদিত 'ফটিকচাঁদ' স্কুলে পড়ানো হয়, সেখানে আমরা কি করছি? চেষ্টা করলে কি সামনের শিক্ষাবর্ষে VII - VIII ও IX - X - এ সত্যজিৎ রায়-এর গল্প পড়ানো যায় না? দেখাই যাক না কী হয়?

প্রসঙ্গ হিন্দুধর্ম

স্বল্প পরিসরে হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব। এর যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণয় করাও কঠিন। কারণ হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের কোনও প্রত্যাদেশ বা ব্যক্তি বিশেষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা বাণী ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বিভিন্ন যুগের অসংখ্য মুনি, ঋষি, আচার্য্য ও ভক্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপদেশই হল হিন্দুধর্মের ভিত্তি। উৎপত্তি নির্দেশ করা যায় না বলে হিন্দুরা এই ধর্মকে নিত্য ও সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।

অতীতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসে সিন্ধু নদীর ধারে বসবাস করত। অনেকের মতো এরাও 'স'-র উচ্চারণ করত 'হ', সিন্ধু শব্দটি থেকেই অপভ্রংশে হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি। ক্রমে ক্রমে তাদের সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি এবং তাদের ধর্ম তথা কর্তব্য নীতি, সংবিধান ইত্যাদি হয়ে দাঁড়াল 'হিন্দুধর্ম', মূলত, বেদকে কেন্দ্র করেই হিন্দুধর্মের সৃষ্টি, কাজেই একে বৈদিক ধর্ম বলাই যুক্তিসংগত।

একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঋগবেদে একাধিক দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব দেবতা প্রথমে বিভিন্ন প্রকৃতিক শক্তির সঙ্গে অভিন্ন ছিল। যেমন- সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, বাতাস। আগুন। জল প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকের প্রার্থনায় একজনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। ম্যাক্সমূলার এই প্রথাকেই 'দেব প্রাধান্যবাদ' বলেছেন। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগে বহু দেবদেবী স্বীকার করা হয়েছে এবং এদের সকলকেই এক একটি বিশেষ কর্তব্যে রত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন ধনদেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাদেবী সরস্বতী, বাণিজ্যদেব গণেশ।

একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের মধ্যে ঈশ্বরবাদের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের অন্যান্য অনেক ধর্মই একেশ্বরবাদী কিন্তু এগুলি অদ্বৈতবাদ নয়, ঈশ্বর ও জগৎ এই দ্বৈততায় তাদের বিশ্বাস। হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদ বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে উপনিষদ বা বেদান্তে। উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি প্রাচীন ভারতের গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যখনই পৃথিবীতে পাপ অধর্ম ও গ্লানি বৃদ্ধি পায়, তখনই পরম করুণাময় ঈশ্বর জীবের কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন ও পাপ বিদূরিত করে সত্য ও ন্যায় ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণগুলিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা ও মহেশ্বরকে সংহার কর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে বিষ্ণুকেই সর্বপ্রধান ঈশ্বররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণের প্রধান চরিত্র বিষ্ণুর অবতার। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। 'অবতার' শব্দের অর্থ হল যিনি অবতীর্ণ হন। হিন্দুধর্মে যে অর্থে রাম বা কৃষ্ণকে অবতার বলা হয়, যিশু বা মহম্মদকে সেই অর্থে অবতার বলা যায় না, এঁরা দুজনেই ঈশ্বরের প্রেরিত প্রিয় পুত্র হলেও স্বয়ং ঈশ্বর নন। এই ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাসের সঙ্গে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের পার্থক্য লক্ষনীয়।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় তা একদিকে যেমন বিশ্বাসগত ও ধারণাগত, আর একদিকে তেমনই আনুষ্ঠানিক, ফলে সৃষ্টি হল বৈদিক ক্রিয়াকলাপের। মানুষ বিশ্বাস করে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাদের ফলদানে বাধ্য করা যায়। পুরাণে দেবতাদের এই ধরণের চিত্রই পাওয়া যায়। কল্প সূত্রে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে বিবৃত আছে। আজও হিন্দুর জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সময় এই সব স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠান করা হয়। উল্লেখ করা যায় এই আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধেই গড়ে ওঠে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম।

জন্মান্তরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। জন্মান্তরের ধারণা গ্রীক সংস্কৃতিতেও লক্ষ্মণীয়। একই আত্মা একাধিকার জন্ম ও মৃত্যুবরণ করে এই ধারণা অন্য খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মে পাওয়া যায় না। উপনিষদে যে মোক্ষের উল্লেখ আছে, তা হল এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে চির মুক্তি। মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি বা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মূল্য উপনিষদে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রবণ মানে বৈদিক তত্ত্ব শোনা, মনন অর্থ যেগুলির বিচার বিশ্লেষণ এবং নিদিধ্যাসন অর্থ বৈদিক তত্ত্বের ধ্যান।

আধুনিক হিন্দু ধর্মে অবশ্য অনেক বিবর্তন ঘটেছে। এর কারণ বৈদিক হিন্দুধর্ম দেশী ও বিদেশী অন্যান্য ধর্মের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হয়েছে, তবে সুখের কথা মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম ও নীতির বহু আধুনিকতাকে স্বীকার না করে প্রভূত শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষ চান ধর্মকে বুদ্ধি ও বিচারের ভিত্তিতে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আজ একদিকে যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়, গুজরাটে চলে গণহত্যা, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় তার প্রতিবাদে কবিতা উৎসব করে দরজা খুলে দেয় ভালবাসার। যতদিন না ধর্মের ভিত্তি হবে ভালবাসা, ততদিনই চলবে এই রক্তঝরা, বাইরে যতই পার্থক্য থাকুক, আমরা সবাই মানুষ, এই মনন সবার মধ্যে মন্ত্র উঠুক আমাদের 'শতফুল বিকশিত হোক।'

‘নারী স্বাধীনতা’ কি বকচ্ছপ না হাঁসজারু?

সম্প্রতি তসলিমা নাসরিন বা বনগাঁর তসলিমা, কলকাতার তসলিমা, চাঁদপাড়ার তসলিমার এত বেশি ভিড় চারিদিকে যে, কিছু কথা বলার থাকলেও বলবার অবকাশ পাওয়া যায় না। বিদীরার দীপক আমাকে কিছু লিখতে বলায় লিখতে বসেছি। লেখা বলা ভুল, কারণ আমার নিজেরই জ্ঞানগম্যি যথাসম্ভব কম, আমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে তাই নিয়ে কিছু কথা বলা-কওয়া যাক।

এখন দেখা যাক নারী স্বাধীনতা কাকে বলে? আর একটু পরিষ্কার হওয়া যাক, স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? নারীবাদীরা বলবেন (‘নারী’ কি একটা মতবাদ?) যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই হল স্বাধীনতার প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার। আমার বিনীত প্রশ্ন আমার স্ত্রী একটি পয়সাও আয় করেন না, আর আমি যা হোক কিছু আয় করি। তাহলে আমি রাত্রে আকন্ঠ সুরাপান করে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে অন্য কাউকে ঘরে ঢোকাতে পারি কি? পারি না। কারণ আমার সে স্বাধীনতা নেই। আমার কেন সভ্য জগতের কারুরই কোনও কিছুতেই অবাধ স্বাধীনতা নেই। সেক্ষেত্রে কেন এই অবান্তর নারী স্বাধীনতার আবদার?

স্বনামধন্যা এক চিত্রপরিচালিকা অবশ্য স্বাধীনতা বলতে অবাধ যৌন স্বাধীনতা এবং মেয়েদের smoke করাকে বোঝান (তাঁর সিনেমাতে আমরা যেমন দেখেছি)। যদি তাই হতো তাহলে তো গণিকারাই পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতেন। কিন্তু বাস্তব তার ঠিক উলটো। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে। মুক্ত পুরুষ বা মুক্ত নারী ব্যাপারটাই অলীক তাই না? এক যদি বুদ্ধ বা শংকরাচার্যের দেশের লোক আমরা সবাই ঘরদোর ছেড়ে রাস্তায় না বেরিয়ে পড়ি। ও হরি তাহলে তো সৃষ্টিই রসাতলে যায়। আসল কথাটা হল আমরা কে কতটা মুক্তমনা হতে পারছি. অন্যের মতকে সহ্য করা, সমস্ত বিতর্ককে মুক্তমনে যুক্তি দিয়ে ভাবার অবকাশ বা সদিচ্ছা আছে কি কারও? যদি কারও থাকে তবেই সে স্বাধীন মুক্ত।

নারীবাদীরা হয়তো বলবেন, মশাই! নারীদের পুরুষেরা থোড়াই কেয়ার করে। সংসারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তো পুরুষেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষা বিজ্ঞানে একটি খুব ভাল কথা আছে When you teach a boy, you teach an individual, When you teach a girl, you teach a family, এর মানেটা তাহলে কি দাঁড়াল? এই নয় কি নারীরা শিশু তথা শিশুর বাপকে পরিচালনা করে। শুধু প্রবাদ নয়, আপনারা যে কেউ যে কোনও সংসারে গিয়ে খোঁজ করুন, কয়টি সিদ্ধান্ত পুরুষেরা নিয়ে থাকেন।

হ্যাঁ, এরপরেও বলছি পুরুষেরা অনেক ক্ষেত্রে নারীদের উপর খবরদারি করেন এবং সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? ধরুন, পৃথিবীতে পুরুষ আগে আর নারী পরে এসেছে, এ নিশ্চয় নয়। তবে কেন হল পুরুষ শাসিত সমাজ? পুরুষদের বাহুবল বেশি বলে? তাহলে স্বীকার করুন, পুরুষেরা অন্তত একটি জায়গায় এগিয়ে আছে। (পাঠিকারা মাপ করবেন) হয়তো তাও নয়। একটা কথা আমার মনে হয় পাঠক বিচার করবেন, Biological কারণেই স্বামী স্ত্রীর থেকে বয়সে বড় হয় বা হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বয়সে বড়দের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে খবরদারি করবার ক্ষেত্রে।

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেন (মাফ করবেন, বলতে পারলাম না গীতা সেনের স্বামী মৃণাল সেন) একটি সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, 'শ্যুটিং সেরে আমরা দুজনে বাড়ি ফিরলে মৃণাল ইজি চেয়ারে বসে থাকে আর আমাকেই চা করতে হয়।' ভালো কথা। কিন্তু গীতাদেবী এ কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গেছেন যে, মৃণালবাবু শ্যুটিং চলাকালীন যে Brain Workটি করেছেন তা উল্লেখ করতে। যাহোক, নারীদের অবলা নয়, তাঁদের যথার্থই মানুষ বলে পরিচিত হওয়ার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি-

১. আপনারা বাসেট্রামে Ladies seat বা ট্রেনে Ladies Compart- ment বয়কট করুন।

২. আকাশবাণী বা দূরদর্শনের 'মহিলা মহল' অনুষ্ঠান বয়কট করুন। (কেন মহিলা? যখন সবাই সমান)

৩. 'মেয়েদের পত্রিকা' (মেয়েদের পত্রিকা, কিন্তু মেয়েলি নয় এই কথাটির মানে কী?) বয়কট করুন।

৪. পুরুষদের পাশ দিয়ে রেল বা সিনেমা হলে টিকিট কাটবেন না, দরকার হলে একই লাইনে পেছনে এসে দাঁড়ান। (লেক টাউনে জয়া সিনেমা হলে আমি ও আমার স্ত্রী রবীন্দ্র ধর্মরাজের 'চক্র' সিনেমাটি দেখতে গিয়েছিলাম। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার স্ত্রী টিকিট কাটছিলেন অনেক পুরুষের পিছনে দাঁড়িয়ে, অনেকের 'জ্ঞান' শুনেও। শেষ পর্যন্ত ওর তিনজন আগে টিকিট শেষ হয়ে যায়। আমাদের ঐ সিনেমা আর দেখা হয় না। পরিবর্তে মিনি জয়াতে দেখলাম আমরা 'কপাল কুণ্ডলা।' হাঃ হাঃ হাঃ)।

৫. রাস্তাঘাটে কোনও পুরুষের সাথে সংঘর্ষ হলে অনেক সময় ঘটনার সত্যতা যাচাই না করেই তাদেরকে গালি দেওয়া সময় বিশেষে চপেটাঘাত করা বন্ধ করুন। নতুবা কোনও নারী পুরুষের সাথে সংঘর্ষ ঘটালে সে ক্ষেত্রে পুরুষটিও রাগের মাথায় গালাগাল বা চপেটাঘাত করলে রাগ করবেন না যেন (কেন না নারী পুরুষ সমান সমান)।

৬ চাকুরিরতা মহিলারা বেকার ছেলেদের বিয়ে করুন এবং কথা দিন যে, কোনও দিন উঠতে বসতে তাঁকে খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন না। এবং গ্যারান্টি দিন ভবিষ্যতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবেন না।

এতসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমি নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভাবি। বরঞ্চ আমিও চাই এক সুন্দর সমাজ যেখানে পুরুষ আছে পুরুষের শক্তি নিয়ে, সামর্থ নিয়ে, কঠোরতা নিয়ে। পাশাপাশি নারীও থাকুক নারীর কোমলতা নিয়ে, বর্ষার জল নিয়ে, শরতের মেঘ নিয়ে। আর যদি তা না হয়, যদি পুরুষ আর নারী সর্বস্তরে সমান হয়ে যায়, একে অন্যের পরিপূরক না হয়, তবে বিশ্বের সমস্ত ফুলের বাগান কেটে ফেলা হোক, নদী বুজিয়ে ফেলা হোক। থাকুক শুধু খেজুর গাছ, মরুভূমি আর যত কেঠো জিনিস। পৃথিবী হয়ে যাক রুক্ষ, অনূর্বর এক পাথর খণ্ড মাত্র।

যুক্তিবাদী আন্দোলনে মেয়েরা পিছিয়ে কেন? একটি সামাজিক সমীক্ষা

যুক্তিবাদী আন্দোলন ভারতবর্ষে আজকের নয়, তবে খুব বেশি পুরনোও নয়। রামমোহন, ডিরোজিওর থেকে শুরু আজকের প্রবীর ঘোষ পর্যন্ত বিভিন্ন যুক্তিবাদীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি কী ভাবে ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, এখন তো মহীরূহ, তবুও একটা কাঁটা ক্রমশ যুক্তিবাদের গলায় আটকে যাচ্ছে সেটা হল নারীরা কেন যুক্তিবাদী আন্দোলন বিমুখ। হ্যাঁ, বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু নারী সংগঠন বা একক নারী যুক্তিবাদের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন বটে। কিন্তু সেখানেও তো গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে, দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। এক, এটা তো এখন পূর্ণিমা অমাবস্যার মতো স্পষ্ট যে তসলিমা নাসরিন যে 'লজ্জা' উপন্যাসটি লেখেন তাতে মুসলিম মৌলবাদ উস্কানি পেয়েছে। তাহলে? দুই, আমাদের অতি প্রিয় অভিনেত্রী পরিচালিকা শ্রীমতী অপর্ণা সেন, কিছুদিন আগে, তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিজে পুরুষের বদলে কন্যা সম্প্রদান করলেন। তাহলে কি দাঁড়াল? তাঁর মেয়ে কি কোনও আসবাব যাকে সম্প্রদান করতে হয়? অর্থাৎ ঘুরে ফিরে আবার গোল্লা।

যাক, যে কথা বলছিলাম, আসলে একটা বিষয় বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, যুক্তির বিপরীত হল আবেগ, যে আবেগতাড়িত, সে কখনও যুক্তির ধার ধারে না। পারিবারিক মঙ্গল, পাপ-পূণ্য, ইষ্ট-অনিষ্টর চিন্তা যখনই পেয়ে বসে মানুষকে তখনই সে আর যুক্তিবাদী থাকতে পারে না, হয়ে পড়ে আবেগের বশ। মনস্তত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন যে, মেয়েরা জন্মগতভাবে আবেকপ্রবণ। স্নেহ-মায়া, মমতা, প্রেম ইত্যাদি কোমল প্রবণতাগুলো মেয়েদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা যায়। তাই যখন সন্তানের রোগ দেখা যায়, তখন মা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় মানত করে বসেন কোনও 'জাগ্রত' দেবতার কাছে নতুবা জলপড়া ইত্যাদির শরণাপন্ন হন। বহু নাস্তিক, যুক্তিবাদীর বাড়িতে ঠাকুরের আসন পাতা দেখেছি (এমন কি লেনিন ও কালীকেও একই পঙ্‌ক্তিতে) গৃহিণীর ইচ্ছায়।

তাছাড়াও আরও একটা মজার ব্যাপার এই পুরুষশাসিত সমাজে দেখা যায়, কোনও মেয়ে যুক্তিবাদী হলে অন্য মেয়েরা যতটা পারে তাকে পিছনে ফেলার চেষ্টা করে যায়, আমার বোন শ্রীমতী মানসী ভট্টাচার্য (বিশ্বাস) যুক্তিবাদে বিশ্বাসী হওয়াতে তাঁর ছাত্রীর মুখেই শুনেছি, মেয়েছেলের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

জন্মগত প্রবণতার দিক থেকেও নারীদের মানসিক গঠন এমন যে তাঁরা সহজেই বিশ্বাস করেন, তাই অক্লেশে কলেজছাত্রীটি তার সদ্য পরিচিত সহপাঠীর কাছে হাতটি বাড়িয়ে দেয় এবং আগডুম বাগডুম শোনাবার পর বিশ্বাস করে স্বপ্ন দেখা শুরু করে। দোহাই পাঠিকা, আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল ভাববেন না। অসংখ্য ছাত্রীর কাছ থেকে জ্যোতিষীর দয়ায় পাশ করা, আর মা কালীর দয়ায় চাকরি পাওয়া শুনতে শুনতে আমার এইরকমই ধারণা হয়েছে।

কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবেই বিশ্বাস করি যে, 'When you teach a boy, you teach an individual, when you teach a girl, you teach a fimily.' শিক্ষা মানুষকে যুক্তিবাদী করে তোলে। কিন্তু বিধিবদ্ধ যে শিক্ষা ব্যবস্থা তার থেকে এইরকম অস্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধিহীন ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। আবেগতাড়িত হয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক

নির্ণয় না করে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরেই পৃথিবীটা পেছতে পেছতে আবার আমরা জঙ্গলে গিয়ে ঢুকব। আর সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হলেই গুহায় গিয়ে ঢুকব।

সংস্কার বনাম কুসংস্কার প্রসঙ্গে শিক্ষার ভূমিকা

কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। সাদামাটা কথাগুলো, হয়তো বহুবার বলা হয়ে গিয়েছে, তবুও আবার বলা। আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল সংস্কার। এখন সংস্কার কী? এর সঙ্গে কুসংস্কারের পার্থক্য কোনও জায়গায়। এদের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কটাই বা কী?

আমাদের সামাজিক জীবনে কতগুলো প্রথা বহুকাল ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে, যা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা হয় না বা উত্তর পাওয়া যায় না। সেইগুলোই হল সংস্কার। উগ্র প্রগতিবাদীরা হয়তো বলবেন সব সংস্কারই কুসংস্কার। আমি বলবো না। শিক্ষককূল চূড়ামনি ডিরোজিওকে শ্রদ্ধা করেও বলছি গুরুজনদের প্রণাম করা, শিষ্ট ব্যবহার, অসহায়কে সাহায্য করা অবশ্যই সদর্থক সংস্কার, বরঞ্চ অনেক বেশি কুসংস্কার ফেডেড জিনস্, রোদ চশমা আর লিপিস্টিক ব্যবহার করা তরুণীদের সন্তোষী মা'র পূজা করা।

সমাজকে ভেঙে দেব, পুরনো ঐতিহ্য যা ভুলে যাব। মার্কিনী সভ্যতা আমদানী করবো, কথায় কথায় ভুল ইংরাজী বলব- এটাও নঞ্চর্থক সংস্কার তথা কুসংস্কার। এর জন্য কাকে দায়ী করবো? সরকারকে? সিনেমাকে? T.V. কে? বিজ্ঞাপন সংস্থাকে? না শিক্ষক বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে?

হয়তো সবাইকে, তবু আমি বিশেষ করে দায়ী করবো শিক্ষকদের। জানি, আমাদের পড়াশোনা করতে হয় একটা নির্দিষ্ট সিলেবাসকে কেন্দ্র করে, পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। তবু যে শিশুটিকে বাবা মা এবং শিক্ষক এই তিনজন তিল তিল করে গড়ে তোলেন সমাজ, রাষ্ট্রের উপযোগী করে, তাঁদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি তৈরি করে এক বিকট ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকে! বহুক্ষেত্রেই বাবা মা অশিক্ষিত। কিন্তু শিক্ষকরা? তারা কি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন? আমি অভিজ্ঞতার থেকেই বলছি। অবশ্যই মহান যথার্থ শিক্ষকদের ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে, শিক্ষকরা অধিকাংশই উল-কাটা আর D.A. নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? অনেকে আমাকে অনেক উত্তর দিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে যেটি মাখনের মতো বেরিয়ে এগিয়ে এসেছে সেটি হল Adjustment, হ্যাঁ জোর দিয়েই বলছি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল মিলন! স্কুল কলেজগুলো সামাজিক মেলবন্ধনের এক তীর্থ স্বরূপ, অথচ সেখানেও Cong-এর ছেলে, C.P.M.-এর ছেলে, অফিসারের ছেলে, কেরানীর ছেলে মিশতে পারছে না। এতে শিক্ষকদের দায়িত্ব নেই?

শুধু এই নয়, কুসংস্কারের জাল ফেলা রয়েছে পুরো সমাজ জীবনে। এক চোখ না দেখা, এক শালিক না দেখা, হাচি, কাশি টিকটিকি, ভূত দেখা, ভর হওয়া সব তো এখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। শুনি, ওখানে জাগ্রত কালী আছে, সেখানে জাগ্রত শিব আছে, তা

বেশ তো, যে কোনও মন্দিরে গিয়ে পরম 'দেবভক্ত' নিজের গায়ে আগুন দিয়ে দিক। দেখা যাক দেবতা তাকে রক্ষা করেন কিনা। করলে আমি আমার সারা জীবনের আয় সেই মন্দির জমা রাখব।

প্যারীচরণ সরকার ও বিদ্যাসাগর

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে আলোচনার সময় এক দিন মন্তব্য করেছিলেন, '... আমি জীবনে চারজন মানুষ দেখেছি, তার মধ্যে একজন ছিলেন প্যারীচরণ। বিদ্যাসাগরের ছোটভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিতে' এর সমর্থন মিলবে। প্যারীচরণের সম্পদে বিপদে নিত্য সহচর ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

প্যারীচরণ সরকার বাঙালির কাছে বিস্মৃত একটি নাম। বাংলার শিক্ষার প্রসারে তার ভূমিকা যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। বিদ্যাসাগরের জন্মের তিন বছর পর অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী চোরাবাগানে তার জন্ম। অল্প বয়সেই পিতৃহীন হবার পর দাদা পার্বতীচরণ তাকে পটলডাঙার স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখান থেকে হিন্দু কলেজে। কুড়ি বছর বয়সে লেখাপড়া শেষ করে হুগলি স্কুলে শিক্ষাকতা শুরু করেন। সেখানে তিন বছর চাকরি করে বারাসাতে প্রধান শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন। যে স্কুলের অধুনা নাম 'প্যারীচরণ সরকার' সরকারি বিদ্যালয়। এই সময়টাই প্যারীচরণের জীবনের স্বর্ণযুগ। এখানে ছিলেন ১৮৫৪ পর্যন্ত। তারপর ডেভিড হেয়ারের কলুটোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। এই সময়ে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী ইংরাজি অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৬৭ সালে স্কুল থেকে অবসর নেন। তাঁর প্রস্তাবেই স্কুলের নাম হয় হেয়ার স্কুল। অবসরের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। বারাসাতে প্যারীচরণের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি ছিল বেথুন সোসাইটির শাখা স্থাপন, কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমজীবীদের জন্য তিনি আলাদা একটি স্কুল খোলেন। এছাড়াও তার অসাধারণ কীর্তি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন। সে সময়ে ভাল বাংলা বর্ণপরিচয় ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী ইংরাজি বই তো নয়ই, 'প্যারীচরণের সদর বাটীর বৈঠক খানা সর্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সমাগমে মজলিস হইত। সেদিনকার বৈঠকের কথাবার্তায় স্থির হয় যে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ইংরাজি বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি ইংরাজি পুস্তক রচনা করিবেন। আর বিদ্যাসগর মহাশয় বালকদিগের উপযোগী কতগুলি বাংলা পুস্তক রচনা করিবেন। এইরূপ স্থির হবার পর উভয় বন্ধু ঐ উভয় ভাষায় কিছু পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীরা প্যারীচরণ সরকারের First Book Reading পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথও First Book পড়েছেন। তাঁর জীবনস্মৃতির পাতায় উল্লেখ আছে।

কর্মজীবনে এসে সময় ও সমাজের নির্দয়তার মোকাবিলা করার কঠিন মুহূর্তে অনেকের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু প্রগাঢ় সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল এক মাত্র প্যারীচরণের সঙ্গে। প্যারীচরণ ও বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ়

ও স্বার্থদ্বেষশূন্য ছিল যে, যে কোনও সময় তারা নিঃসঙ্কোচে একে অপরের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিতেন। এই দুই বন্ধু সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন সমাজ সংস্কারের সূত্রে। বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রোধের চেষ্টা করেছেন। বিধবা বিবাহ আইনানুগ করে ছেড়েছেন। বিদ্যাসাগর যখন নারী মুক্তির জন্য লিখে যাচ্ছেন, অকাতরে অর্থব্যয় করে চলেছেন এবং আচার সর্বস্ব হৃদয়হীন সমাজের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন তখন যে গুটিকয় বন্ধু তার পাশে ছায়ার মতো থেকেছেন প্যারীচরণ তাদের অন্যতম। বাংলার উৎপীড়িত নারী সমাজের শিক্ষা, সম্মান ও মুক্তি কামনায় প্যারীচরণের চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা বা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রতিটি কাজে বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ একই সাথে এগিয়েছেন। বাংলায় বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কাজে কালীকৃষ্ণ মিত্রের প্রধান সহায় ছিলেন দুজনেই। 'ইংরাজি ১৮৫৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানে যেকটি বিধবা বিবাহ দিয়েছেন তার প্রায় সবগুলিতেই প্যারীচরণ বিদ্যাসাগরের পাশেই দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ প্রথম বিবাহের পরদিনই ঠনঠনিয়া নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যার যে বিবাহ সংগঠন হয় তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন প্যারীচরণ।' (নবকৃষ্ণ ঘোষ)

এইভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরকে ছায়ার মতো অনুসরণ করার অপরাধে প্যারীচরণকে সামাজিক নিন্দা ভোগ করতে হয়েছিল। এমনকি তাকে সমাজচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার প্রতিবেশীরা। কিন্তু প্যারীচরণকে এই সব সমাজের গুরুমশাইরা তার সংকল্প ও কর্তব্যপথ থেকে সরাতে পারেননি। বিধবা বিাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে জলস্রোতের মতো অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। প্যারীচরণ দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করেছেন। এজন্য তাকে লোকের কাছে নীচু হতে হয়েছিল এবং অনেকে তীব্র অনুযোগের সঙ্গে এই সম্মানিত ব্যক্তিকে বিমুখও করেন। উচ্চ আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সশ্রদ্ধ বন্ধুত্বের জন্যই এই সব লাঞ্ছনা তিনি সহ্য করেছিলেন।

বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ, সমাজ সংস্কারক, বাঙালির শিক্ষাগুরু ও বাংলা ভাষার জনক বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করে বলেন, 'আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতাম না', পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত, আক্রান্ত ও অপমানিত বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শেষকটি বছর স্বজন ও সমাজ থেকে দূরে নির্বাসিত সাঁওতাল পল্লীতে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সুখের কথা বিদ্যাসাগরের আঙুলে গোনা কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে প্যারীচরণ এই দুর্বল, দাম্ভিক ও কর্মহীনদের মধ্যে ছিলেন না। ১৮৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্যারীচরণ মারা যান। বিদ্যাসাগর তারপর ডাঃ ভুবনমোহন সরকারের কাছে চিঠি লেখেন-'আমার এই অভিন্ন হৃদয় সুহৃদের মৃত্যুতে আমার প্রাণে যে কী দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা তুমি ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সামর্থ নাই। আমরা যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই পরস্পরকে জানিতাম। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন নিগূঢ় ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল যে প্যারীবাবুর মৃত্যুতে আমি আমার প্রিয়তম ও স্নেহভাজন সহোদর হারাইয়াছি। তাহার উপযুক্ততা, জনসমাজের হিতসাধনে তাহার নিষ্ঠাপূর্ণ একাগ্রতা, সদনুষ্ঠান নীতিমান লোক মণ্ডলীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।'

মনসামঙ্গল

দেখতে দেখতে লোকসভা নির্বাচন এসে গেল। এবার দেশের এ্যাডভাইসরী কমিটির চেয়ারম্যান মহাদেববাবু তার মেয়ে (অবৈধ) মনসাদেবীকেও মন্ত্রিত্ব দেবেন বলে স্থির করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের বিভিন্ন মন্ত্রিপদে বসিয়েছেন। যেমন স্ত্রী দুর্গাদেবী আছেন প্রতিরক্ষা বিভাগে। অনেকবারই তিনি বিদেশী শত্রুদের থেকে দেশকে রক্ষা করে তার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, দুই মেয়ে লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীদেবী হলেন যথাক্রমে অর্থমন্ত্রি ও শিক্ষামন্ত্রি। ছেলেদের মধ্যে গণেশ হলেন বাণিজ্যমন্ত্রি ও মিঃ কার্ত্তিক কুমার হলেন সেনাপতি। সুতরাং এবারকার নির্বাচনে জয়লাভ করে যদি মন্ত্রিত্ব না পাওয়া যায় তবে মনসাদেবী যতই তিনি অবৈধ হন না কেন কী করে সম্মান তার থাকে। সুতরাং তিনি এবার মনস্থ করে ফেলেছেন যে তিনি লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াবেন এবং যেনতেন প্রকারেন জিততে তাকে হবেই। নতুবা তাকে সবসময়ই বিমাতা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে অপমানিত হতে হয়। আবার তার বাবা মহাদেব ছাড়া উপায়ও নেই কারণ একবার এক মুনির কৃপায় তিনি সন্তান সম্ভবা হওয়ার পরই মুনিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এবার তার ইচ্ছা আছে যে মহাদেবের সাহায্য নিয়ে একবার মন্ত্রি হতে পারলে হয়, তারপর তাকে আর দেখে কে।

ঠিক হল যে, তিনি চম্পকনগর থেকে দাঁড়াবেন নাগ পার্টির হয়ে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথ দত্ত। বিরাট ব্যবসা তার। বাড়িতে স্ত্রী আর ছয় ছেলে বউ নিয়ে সংসারও তার বিরাট। আর এক ছেলে লক্ষ্মীন্দ্র বিদেশে গেছে পড়াশোনা করতে। এখন এই চন্দ্রনাথবাবু দাঁড়িয়েছেন বণিক সভার পক্ষ থেকে। খুবই করিৎকর্মা ভদ্রলোক। তাই মনসাদেবী নিজেই একদিন গেলেন চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। উদ্দেশ্য, যদি চন্দ্রবাবু স্বেচ্ছায় নমিনেশন পেপার withdraw করেন। কিন্তু তিনি কোনও মতেই রাজি হলেন না। বরঞ্চ মনসোদেবীকে প্রায় তাড়িয়েই দিলেন।

অপমানিতা, ক্রুদ্ধা, মনসাদেবীও প্রতিজ্ঞা করলেন যে চন্দ্রবাবুকে তিনি বণিক সভার পক্ষ থেকে কোনও মতেই দাঁড়াতে দেবেন না। বরঞ্চ চন্দ্রবাবু তাকে ভোট দেবেন। মনসাদেবী ফিরে এসেই urgent meeting ডাকলেন, মিটিং-এ নাগপার্টির উপ-সভাপতি শঙ্খচূড়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন- ভাইসব, আমরা আজ যে জন্য একানে সমবেত হয়ছি তা নিশ্চয়ই আপানাদের বলতে হবে না, কারণ সকলেই জানেন যে, চন্দ্রবাবু কোনও মতেই তার পার্টি ছাড়বেন না, আবার তিনি যদি এই কেন্দ্র থেকে দাঁড়ান তবে আমাদের জয়ের আশা কম, সুতরাং যেভাবে হোক তাঁকে আটতেই হবে, আপনারাই বলুন কী করা যাব?

এবার সদস্যদের মধ্যে একজন উঠে বললে, আচ্ছা যদি আমরা চন্দ্রবাবুকে কোনও বেকায়দায় ফেলতে পারি তবে হয়তো কাজটা হাসিল করা সহজ হবে।

অনেক জল্পনা-কল্পনা করে শেষে ঠিক করা হল যে, চন্দ্রবাবুর ছয় ছেলেকে আটকে রাখা হবে এবং এই সুযোগেই চন্দ্রবাবুকে বশে আনা যাবে। কথামতো চন্দ্রবাবুর ছয় ছেলেকে আটকে রাখা হল নাগ অফিসের সাত নম্বর সেলে এবং চন্দ্রবাবুকে চিঠি পাঠান

হল যে তিনি যদি তার ছেলেদের ফিরে পেতে চান তবে যেন তিনি এখনই নির্বাচন থেকে দূরে সরে যান। কিন্তু হা হতোস্মি! চন্দ্রবাবু অনড়, স্ত্রী সনকা শত কান্নাকাটি করলেও তিনি পাথরের মতো বসে থাকলেন। এদিকে তার সাতটা মাল বোঝাই লরিও আটকে রাখা হল।

বাবার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে লক্ষ্মীন্দ্রও ফিরে আসছিল দেশে। সঙ্গে তার সবে বিয়ে করা বউ বেহুলা (ব্যাপারটা বাড়ির সবার গোপনেই করেছিল)। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাকসি ভাড়া করল লক্ষ্মীন্দ্র।

ট্যাক্সিতে করে আসছে ওরা। লক্ষ্মীন্দ্রর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল, যখন এই চেনা রাস্তাগুলো দিয়ে কত বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিল। - ঘ্যাচ্।

কী হল! - লক্ষ্মীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, এখানে দাঁড়ালে কেন? এই মাঠের মধ্যে?

ড্রাইভার মুখ ফেরায়। বিস্মিত লক্ষ্মীন্দ্র ও বেহুলা দেখে ড্রাইভারের সব কটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই গাড়ির দুই দিক থেকে কতগুলো লোক রিভালভার নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে থেকেই একটা মেয়ে এসে গাড়ির বাইরে থেকে বলল- এই যে দাদা, অনেকক্ষণ বউয়ের আঁচলে রয়েছেন, এবার আমাদের সঙ্গে চলুন তো। বলেই মেয়েটা দরজা খুলে বেহুলাকে ধাক্কা মেরে গাড়ি থেকে ফেলে দিল এবং চটপট গাড়িতে উঠে হুশ করে বেরিয়ে গেল।

বেহুলা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অনেক কষ্ট করে সে চম্পকনগরে পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে চন্দ্রবাবুকে নিজের পরিচয় ও সকল ইতিবৃত্ত জানাল। কিন্তু কিছু করার নেই। চন্দ্রবাবু কোনও মূল্যেই তার স্বকীয়তাকে বিক্রি করতে রাজি নন।

এদিকে বেহুলা রাজধানী স্বর্গের দিকে রওনা দিল। পতিপ্রাণা বেহুলার সঙ্গে এখন শুধু তার স্বামীর একটি ফটো।

স্বর্গে গিয়েই সে সমস্ত বড় বড় লোকদের একটা Party তে invite করল, Party তে সে নিজে সবাইকে western dance দেখাল। প্রত্যেকে খুবই খুশি। মহাদেব তো বলেই বসলেন, ‘মেরে প্যারে মাঙ্গো ক্যা মাঙ্গনা চাতি হো?’ বেহুলা অকপটে সব জানাল মহাদেববাবুকে, মহাদেববাবুও এক হাতে জিনের বোতলটা টেনে আর এক হাতে তার নিজস্ব প্যাডের উপর লিখতে লাগলেন Dear Manasha ....

মনসাদেবী সবই দিতে রাজি হলেন। কিন্তু এক শর্তে, চন্দ্রবাবুকে with- draw করতে হবে। বেহুলা তাতেই রাজি হল। কয়েকদিন পরেই সে ছয় ভাশুর, স্বামী আর সাতটা লরি নিয়ে চম্পকনগরে ফিরে এল।

চন্দ্রবাবু এবার আর না বলতে পারলেন না। তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন এবং মনসাদেবী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় M.P. হয়ে গেলেন।

বিষয় বিভিন্ন। যা আমি দেখেছি এখানে ওখানে চলতে গিয়ে তারই কিছু তুলে ধরলাম পাঠকের কাছে, এ আমার নিতান্তই নিজস্ব অনুভূতি, পাঠক যদি একাত্ম হন তবে আমাকে ধন্য করবেন।

বন্ধু কেমনে চিনি

বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর একটা বই পড়েছিলাম কয়েক দিন আগে 'মানুষ চিনবেন কী করে?' জানা হয়নি 'বন্ধু চিনি কী করে?' শাস্ত্রে আছে 'আতুরে বাসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব।' তাছাড়া বাংলা প্রবাদে আছে 'বিপদেই বন্ধু চেনা যায়' এ প্রসঙ্গে ভল্লুক ও দুই বন্ধুর গল্প স্মর্তব্য। আমার কিন্তু ভিন্ন ধারণা। বন্ধু বরং চেনা যায় সম্পদে। অর্থাৎ সুখে। বিপদে পড়লে আপনার আশেপাশে কিছু লোক থাকবেই মানবিকতার খাতিরে। ধরুন, আপনার মেয়ের বিয়ের বা ছেলের ফিজ জমা দিতে হবে। ঠিক লোক পেয়ে যাবেন উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু যদি আপনার মেয়ের বিয়ে হয় খুব ভাল জায়গায় বা আপনার অভাবিত সাফল্য আসে তখনই দেখবেন আপনার বন্ধুরা সরে যাচ্ছে এবং অভিযোগ করছে 'রামের বড় ডাঁট হয়েছে। শ্যামের আয় কোথা থেকে হয় জানি না! ইত্যাদি'। সুতরাং সাধু সাবধান।

সামিরুল হক

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগ, ইতিহাসে অনার্স। এম, এ, সার্ট লিব আমার ভাই সামিরুল। সামিরুল হক, পাকিস্তান-ভারত খেলায় ভারত জিতলে যাকে মিষ্টি খাইয়ে বোঝাতে হয় যে, সে ভারতের সাপোর্টার, যে রাজনৈতিক ডামাডালে বহুদিন চাকরি পায়নি। শেষে নারকেল ডাঙ্গার একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। চূড়ান্ত দারিদ্র, এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রলোভন সত্ত্বেও সামিরুল কলকাতায় একটি টিউশানিও করে না এবং চাকরি পাওয়ার পরদিন থেকে চারঘাটে নিয়মিত টিউশানি করলেও একটি পয়সাও কারও কাছ থেকে নেয় না। না, সবাইকে সামিরুল হতে বলছি না। তবে যখন কোনও লক্ষপতি শিক্ষককে বলতে শুনি যে টিউশানি করতে একদম ভাল লাগে না। সরকার যদি আইন করে টিউশানি বন্ধ করে দিত তবে টিউশানি করতে হতো না। ভাবুন মজাটা। ভাব এমন যেন সরকারের নির্দেশের শুধু অপেক্ষা নইলে কবেই- মুখ আর মুখোশ তো আলাদা হবেই।

দেহোপজীবিনী

হাওড়া স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে, দাঁড়িয়ে আছি সাকরাইলে বন্ধু শ্যামলের বাড়ি যাব বলে। বিরাট লাইন। পাশেই নারী কন্ঠের ফিস্ফিসানি- টিকিট কাটবেন? চমকে তাকাতেই দেখি, লেডিস কাউন্টারটা একেবাররেই ফাঁকা। তারই সুযোগ নিয়ে পুরুষের কাছে তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে দেওয়ার প্রলোভন অতিরিক্ত এক টাকার বিনিময়ে। হাসি পেয়ে গেল মেয়েটার কথায়। তার নারীত্বের দাম মাত্র এক টাকা! আমার নীরবতায় বোধহয় বিরক্ত হয়েই সে চলে গেল অন্য পুরুষের কাছে।

ইংরাজি .... ইংরাজি

অবশেষে সরকার আবার ইংরাজি চালু করলেন। বাচ্চারা আবার সকালে উঠিয়া মনে মনে বলবে 'Rat Cat Fat' ইত্যাদি। স্বয়ং অমর্ত্য সেন বলেছেন যে তিনি নয় বছর বয়সে ইংরাজি শিখেছিলেন। তাতে কী হয়েছে? কম শিখেছেন? রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও দেখেছি যে শিশু নয় বছরে ইংরাজি শিখেও অন্যান্য পাঁচ বছর বয়েস থেকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত শিশুদের সাথে পাল্লা দিতে পারে, অসুবিধা হয় না। তাহলে কী হল? কিছু লোক আন্দোলন করল। বন্ধ করল, আর সরকার তাড়াতাড়ি ইংরাজির জন্য কমিটি করে ফেললেন! যদি আজ থেকে হেরোইন খোলা বাজারে বিক্রি হওয়ার জন্য বা ব্লু ফিল্ম প্রকাশ্যে দেখাবার জন্য আন্দোলন হয় বা বন্ধ হয় (হতেই পারে) তবে সরকার সেগুলোও চালু করবেন তো?

পদবী

চট্ করে বলুন তো বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেব এদের পদবী কী ছিল? শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, রাম, লক্ষ্মণ এদের পদবী কী ছিল? পারবেন না তো। পারবেনও না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির এদের কোনও পদবী ছিল না। পদবী একালের তৈরি লেজ যা দিয়ে সমাজে শুধু ভেদাভেদ নয়, হানাহানিও সম্ভব হয়েছে। ধরুন, উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী রাম মুখার্জী মাধ্যমিকের খাতা দেখছেন শ্যাম মণ্ডলের। শুধু পদবীর জন্যই মার্কস কম পেয়ে যাবে শ্যাম মণ্ডল। আবার শ্যাম মণ্ডলের কাছে খাতা আসলো রাম মুখার্জীর। তারও অবস্থা তাই হবে। কী হবে পদবী দিয়ে, যখন কর্মই মানুষের পরিচয়। তাই উঠে যাক পদবী। বরং আসুক আকাশ, পলাশ, সমুদ্র ইত্যাদি পদবী যার সঙ্গে জাত-পাত-এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না, আগামী শতাব্দী হোক পদবীহীন শিশুদের রাজ্য।

প্রয়োজন ও প্রথা

দার্শনিক Maciver ও Page প্রথা বলতে বুঝিয়েছেন "– an intricate complex of usages or modes of behaviour" অর্থাৎ রীতি নীতি বা আচরণ- বিধির জটিল সমষ্টিই হল প্রথা। Gisbert প্রথার তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন, যথা আচরণের ধারাবাহিকতা, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, আদর্শগত মূল্য। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করা যেমন মানুষের অভ্যাস হয়ে যায়, তেমনি প্রথা পালনের ব্যাপারেও মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়।

জমিদার বাড়িতে দুর্গাপূজা হবে। বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে। বাড়ির বিড়ালগুলো বিরক্ত করে। জমিদারবাবু বাধ্য হয়েই বিড়ালগুলোকে বেঁধে রেখেছেন। জমিদারের বাচ্চা ছেলেটিও তা দেখল। দেখতে দেখতে বড় হল। জমিদারবাবু মারা গেলেন। বিড়ালও ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে একেবারে 'নেই' হয়ে গেল। দুর্গা পূজা আসন্ন। জমিদারের যুবক পুত্রের ঘাড়ে দুর্গাপূজার দায়িত্ব। ঠাকুর মশাইকে তিনি বললেন- ঠাকুরমশাই আমাদের বাড়ির নিয়ম দুর্গাপূজায় বিড়াল বাঁধা। কিন্তু বাড়িতে একটাও বিড়াল

নেই। কি করি? ঠাকুরমশাই বিধান দিলেন- অন্ততঃ একটি বিড়াল আনতেই হবে। নতুবা অনর্থ হতে পারে। একটাতেই কাজ হবে। বাকীগুলোর জন্য না হয় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমাকে কিছু ধরে দিও। ভারতীয় শাস্ত্রে আছে- 'ইষ্টং ধর্মেন যোজয়েৎ", অর্থাৎ যা প্রয়োজন তা ধর্মের সঙ্গে যোগ করা উচিত। এই ভাবেই প্রয়োজনের কাঁধে ভর করেই যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত পরিবেশেও প্রথা আমাদের ঘাড়ে সিন্ধবাদের দৈত্যের মতো চেপে আছে। এই নিবন্ধে আমি চেষ্টা করেছি কিভাবে পাঁচ হাজার বছর আগের বৈদিক যুগের প্রয়োজন মাফিক কাজগুলো আজও অপ্রয়োজনে আমরা পালন করে চলেছি। ধর্মকে আঘাত করা নয়, আমার মূল উদ্দেশ্য যারা latest model এর Mobile এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক তৈজস ব্যবহার করছেন, অথচ অন্য হাতে প্রাক- ঐতিহাসিক যুগের অপ্রয়োজনীয় কাজ করছেন, তাদের কিছুটা ভাবতে সাহায্য করা।

ধরুন, সন্ধ্যা দেওয়া। হিন্দু মাত্রই জানেন মা বোনেরা সন্ধ্যাবেলায় ধূপ-ধূনা জালান। (মশার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য) পাঁচ হাজার বছর আগে যখন বৈদ্যুতিক আলোর প্রশ্নই ছিল না তখন আলোর প্রয়োজনেই প্রদীপ জ্বালানো হত। ঠিক তেমনি এখনও বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালান। খানিক পরেই হাত দিয়ে, ফু দিয়ে নয়, প্রদীপ নেভান। সন্ধ্যা দেওয়ার প্রচলিত প্রথা হল দরজায় দরজায় জল ছিটান। নিশ্চিত ভাবেই বাইরের ধুলো যাতে ঘরে না আসে। চীন দেশের জনপ্রিয় ফেংসুই-তেও দরজার পাশে জল রাখার নিয়ম আছে। আমি অবাক হয়ে এও দেখেছি বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যাবেলায় প্রথামাফিক ভদ্রমহিলা প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজায় জল ছেটাচ্ছেন।

তখন জন্ম, বিবাহ বা মৃত্যুর কোন রেজিস্ট্রেশন করা হতো না রাজার পক্ষ থেকে। তাই সমাজকে জানানোর জন্যই অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা শ্রাদ্ধর অনুষ্ঠান করে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে জানানোর প্রয়োজন ছিল যে এই শিশুটি ওই দম্পতির সন্তান বা দুটি নারী-পুরুষ সমাজ স্বীকৃত বিবাহ করে একসঙ্গে থাকবে বা যিনি মারা গেছেন তাঁর মৃত্যু সংবাদ সমাজকে শ্রাদ্ধর (শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান) মাধ্যমে জানানো হত। আজও জন্ম, বিবাহ তো বটেই, শ্রাদ্ধতেও ঘটা এ করে লোক খাওয়ানোর চল রয়েছে। যদিও সরকার স্বীকৃত Birth Certificate, Marrage Certificate, Death Certificate ছাড়া আজকের সমাজে থাকা অবৈধ শুধু নয়, অসম্ভবও।

অসম্ভব বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম মুসলিম ধর্মে ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ নমাজ পড়তে বলেন পাঁচ ওয়াক্ত। ওয়াকিবহাল মুসলিম ভাই মাত্রই জানেন, এটি নিখাদ একটি শারীরিক ব্যায়াম। যা সুস্বাস্থ্যের জন্য অবশ্য করনীয়। খাবার আগে 'ওজু' করা যা হিন্দুদের আচমনের (হাত ধোওয়া) সঙ্গে তুলনীয় এটি অবশ্য করনীয়। (১৫ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব হাত ধোওয়া দিবস)। সুন্নত করা হলে ফাইমেসিস রোগ কখনও হবে না নিশ্চিত। তাহলে এখানে ধর্মীয় অনুশাসন আসছে কেন?

হিন্দু ধর্মে তিনটি গুনের কথা বলা হয়ে, সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্বগুন প্রধান ব্যক্তি হলেন ব্রাহ্মণ, রজগুন প্রধান ব্যক্তি হলেন ক্ষত্রিয়, রজ ও তম গুন বিশিষ্ট হলেন বৈশ্য এবং তমগুন প্রধান ব্যক্তি হলেন শুদ্র। সত্বগুন প্রধান ব্রাহ্মণ তার দ্বাদশবর্ষীয় বালক পুত্রকে গুরুগৃহে পাঠাতেন বেদ অধ্যয়ন করতে। গুরুও তাকে উপবীত (পৈতে) দেখে

নিয়ে নিতেন (উপনয়ন)। একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ পুত্রটি গুরুগৃহে যেতেন রথে চড়ে। তাই উপনয়নে রথকে সম্বোধন করেও একটি মন্ত্র আছে। এখন বিকল্পে সদ্যজাত ব্রাহ্মণ রিক্সায় করে শহর পরিক্রমা করেন। প্রশ্ন হল- উপনয়ন কেন? এখন তো গুরুগৃহে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। মেঘে ঢাকা শিশুচশশীগুলি আড়াই বছর বয়সে খাঁচায় করে স্কুলে যায়। এবং সেখানেও শুধু ব্রাহ্মণ নয়, আশুদ্র সব মানুষ বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার যোগ্য। এমনকি মেয়েরাও। তাহলে কি সবারই আড়াই বছর বয়সে উপনয়ন হবে? আর একটি কথা, ডাক্তারবাবুর ছেলে মেয়ে যখন ডাক্তার বাবু নয়, উকিলবাবুর ছেলে মেয়ে যখন উকিলবাবু নন, মাষ্টার মশাই-এর ছেলে মেয়ে যখন মাষ্টারমশাই নয়, তখন কেন ব্রাহ্মণের ছেলে মেয়ে ব্রাহ্মণ হবে? শুদ্রের ছেলে মেয়ে কেন শুদ্র হবে? কর্ম অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা হলেই সম্বোধনে সুবিধা হয়। এ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের অমোঘ উক্তি স্মর্তব্য

'বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে"

উপলক্ষ্য বিবাহ। সভ্যতার সমবয়সী এক সনাতন শুভ অনুষ্ঠান। যে বাঙালী জীবনে ধুতি পাঞ্জাবী পড়েনি, সেও প্রথার জেরে লত পত করে ধুতি পড়ে চলল বিয়ে করতে। বিয়েতে নাকি সেলাই করা কাপড় পড়তে নেই। হায়, বৈদিক যুগে সেলাই মেসিন বা সুচ কোথায় যে নিয়ম হবে? যা হোক পাত্র এক হাতে মোবাইল এবং অন্য এক হাতে বৈদিক প্রথা নুসারে দর্পন নিয়ে বসল বিয়ে করতে। পাত্রীর অভিভাবক কন্যা সম্প্রদান (কারণ কন্যা যার কাছে একটি বস্তু) করার পর হাটু ছুঁয়ে অর্থাৎ পা ধরে কন্যাকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান অবশ্য সবই সংস্কৃত মন্ত্রোচারণের মাধ্যমে। আশ্চর্য দেবদেবতারা এমনকি জ্ঞানের দবী সরস্বতী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ছাড়া জানেন না? তাদেরকে সংস্কৃতেই সব ভাল ভাল স্তুতি করতে হবে? পুজারী শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণদেব কিন্তু মাকে ডেকেছেন মাতৃভাষাতেই। আর সংস্কৃত - ভাষার কি বাহার। অর্ধশিক্ষিত পুরোহিতের ভুলে ভরা সংস্কৃত উচ্চারণ যজমানের কানে 'লোচন চঞ্চলা' হয়ে দাঁড়ায় 'লুচি চিনি ছোলা'। আরও আশ্চর্য, বিবাহ হচ্ছে দু'জনের। কিন্তু মন্ত্রোচারণ শুধু পুরুষের। যে বিদুষী মহিলা বিবাহিত হচ্ছেন তার কিছুই করার নেই। শুধু বসে বিয়ে করা ছাড়া। যখন নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়া হত বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে তখন স্বভাবতই চাকে পিড়ীতে বসিয়ে পাত্রের সমউচ্চে নিয়ে গিয়ে মালাবদল করানো হত। আজ বিপুলা দেবীকেও পিড়ীতে উঠতে হয়। আর বাক...........!

বিয়েতে একটি মন্ত্র আছে যাতে পাত্র ও পাত্রীর পরিচয় করানো হয়। যারা সাত বছর কোর্টসিপ চালিয়ে বিয়ে করল তাদেরও প্রথার পাকে পড়ে নতুন করে পরিচয় হল, নতুন করে শুভদৃষ্টিও হল।

আমার কথাটি ফুরোল। সুযোগ পেলে আরও অনেক উদাহরণ পেশ করা যাবে। একটিই অনুরোধ, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে যে গতিতে, আপনিও শিক্ষা-দীক্ষায়, ফ্যাসানে, টেকনলজিতে অনেক বেশী এগিয়ে এসেছেন। কেন এখনও এসব পুরনো প্রথা সর্বস্ব হয়ে থাকবেন?

সরস্বতী

বর্তমান যুগে যেমন গঙ্গার মাহাত্ম্য পূর্বে সরস্বতীর গৌরব সমধিক ছিল। সরস্বতী ছিল এর প্রাচীন আর্যদের প্রিয়তমা নদী। বেদে যেমন নদীর কথা আছে, তেমনই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা আছে। পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিক পর্যন্ত বেদে কত নদীরই নাম রয়েছে। কিন্তু সকল নদীর মধ্যে সরস্বতীর কথা সবচেয়ে বড় করেই বলা হয়েছে। ঋষিদের মনে সকল সময়েই নদীর সঙ্গে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জেগে উঠত। তারা অধিকাংশ সময়েই সরস্বতী বলতে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝতেন। বৈদিক আর্যরা সরস্বতী নদী তীরে বাস করতেন এবং দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন তাঁরা চিরকাল সেখানে বাস করতে পারেন। ঋকবেদের কোন জায়গায় এমন উক্তি নেই যেখানে দেখান হয়েছে যে, সরস্বতী নদী দেবতা ব্যতীত অন্যকিছু।

কিন্তু ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সময় সরস্বতী ও বাক অভিন্ন হয়েছেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পূরে বাক্ ও সরস্বতী পৃথক দেবতা ছিলেন। অম্ভৃণ ঋষির ‘বাক্’ নামে এক কন্যা ছিলেন। উনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মবিদূষী হন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ‘বাগ্ বৈ সরস্বতী’ এই উক্তি থেকে ঐ ঝরি কন্যাকেই কেউ কেউ সরস্বতী মনে করেন। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে ‘বাগ্ বৈ সরস্বতী বলতে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই সরস্বতী বলা হয়েছে। বাক্যরই নামান্তর বাণী, ভারতী ভারতী নাম কেন? আপ্রী ও আপ্রসূক্তে যজ্ঞদেবতাত্রয়ের কথা পাই। এই দেবী ত্রয় হলেন ইরা ভারতী ও সরস্বতী। পরে ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন বনে কল্পিত হয়েছেন। ভরতরা যজ্ঞপ্রিয় জাতি ছিলেন। তারাই ভারতী ও সরস্বতীকে অভিন্ন করেন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা। এই দিন সারস্বত উৎসব। এই তিথির এক বিশেষ নাম শ্রীপঞ্চমী। শ্রী মানে কিন্তু লক্ষ্মী। শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী পঞ্চমী। পরে এই তিথি অধিকারিনী লক্ষ্মী না হয়ে সরস্বতী হলেন।

পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্ন বারিভিঃ

মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ।।

মস্যাধার এবং লেখনী কেন? লক্ষ্মীতো কালি কলমের ধার ধারেন না। পুরাণে শ্রীকৃষ বা বিষ্ণু সরস্বতীগত হয়ে বলেন- “মাঘস্য শুক্লা পঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি (ব্রহ্মহ্মবৈব পুরাণ)।” শ্রী পঞ্চমী ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীর হাত থেকে সরস্বতীর হাতে চলে গেল। অমর সিংহে সময় পর্যন্ত শ্রী শব্দের অর্থ সরস্বতী না থাকলেও মধ্যযুগের আচার্য হেমচন্দ্র, জটাধর প্রভৃতি অভিধানে সরস্বতীর একটি নাম হল শ্রী। এদিকে শ্রী পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হওয়াতে পঞ্চমী নামও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

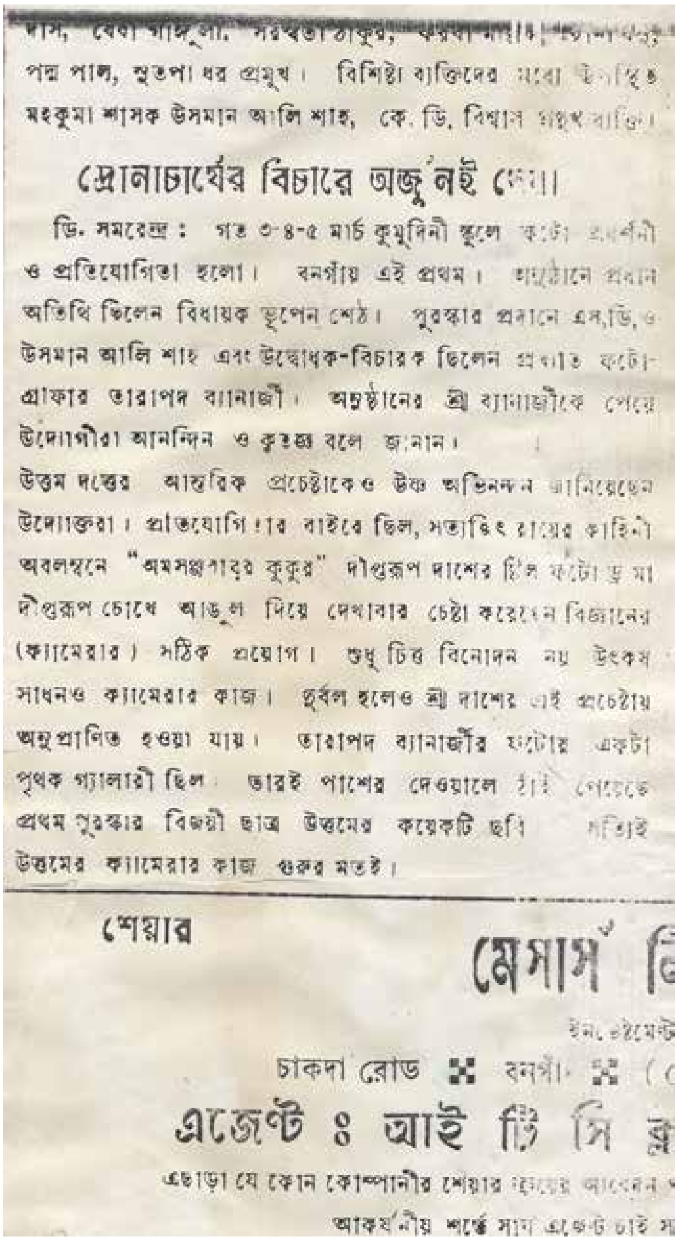
শাস্ত্রে আছে সরস্বতী শ্বেত পদ্মাসনা। ময়মুনি বলেন, ‘পদ্মং লক্ষ্ম্যা সরস্বত্যা”। পূরাণ সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি, ব্রহ্মা হংসবাহন। সুতরাং হংসকেই সরস্বতীর বাহন রূপে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে সরস্বতী সাধারণতঃ ময়ূরবাহনা। আবার সিংহবাহনা সরস্বতী

বৌদ্ধ সরস্বতী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় একটি মেষবাহনা সরস্বতী আছেন। শুক্রনীতিসারে শুক্রাচার বলেছেন-সত্ত্বিক মূর্তিতে শ্রীর চারটি হাত থাকবে। এই চার হাতে যা হবে- বীণা, লুঙ্গ (ফলা , অভয় ও বরদমুদ্রা।

যা কুন্দেষু তুষারহার ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা বীণাবরদন্ড মন্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।।
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা।।

Photographic Narrative:

এই পর্বের শুরুতে কিছু কথা বলা দরকার। আমরা জানি কমিকস সারা পৃথিবী জুড়ে মূলতঃ হাতে আঁকা হয়। সিরিয়াস বিষয় নিয়ে গ্রাফিক নভেল আরো সম্প্রতি এসেছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে গ্রাফিক নভেল কালচার অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে এবং এখনো তার জনপ্রিয়তা সীমিত। তারও একটি সাব-ডিভিশন বলা যায় ফটোগ্রাফিক নভেল বা ন্যারেটিভ যা এই ২০২৫ সালেও খুবই বিরল। কিন্তু পাপা নব্বইয়ের দশকে বনগাঁর মতো তথাকথিত মফস্বল শহরে বসে সীমিত রিসোর্স দিয়েই সত্যজিৎ রায়ের ‘ক্লাসফ্রেন্ড’ আর ‘অসমঞ্জবাবুর কুকুর’- এই দুটি গল্পের Photographic Narrative/Photo-comics বানিয়েছিল। নিজের বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রদের নিয়েই পাপা অপুর সংসার ক্লাবের পক্ষ থেকেই এই কাজ করেছিল যা এতদিন বনগাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ থেকে স্বীকার করতাই হয় পাপা নিজের সময় থেকে অন্ততঃ ত্রিশ বছর এগিয়ে ছিল। বলা বাহুল্য এই adaption সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, অপুর সংসার আয়োজিত সত্যজিৎ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়কে সম্মান জানাতেই করা হয়েছিল।


পদ্ম পাল, সুতপা ধর প্রমুখ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত মহকুমা শাসক উসমান আলি শাহ, কে. ডি. বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তি।

দ্রোনাচার্যের বিচারে অর্জুনই সেরা।

ডি. সমরেন্দ্র : গত ৩-৪-৫ মার্চ কুমুদিনী স্কুলে ফটো প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা হলো। বনগাঁয় এই প্রথম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক ভূপেন শেঠ। পুরস্কার প্রদানে এস,ডি,ও উসমান আলি শাহ এবং উদ্বোধক-বিচারক ছিলেন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার তারাপদ ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানের শ্রী ব্যানার্জীকে পেয়ে উদ্যোগীরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ বলে জানান।

উত্তম দত্তের আন্তরিক প্রচেষ্টাকেও উক্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন উদ্যোক্তরা। প্রতিযোগিতার বাইরে ছিল, সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে "অসমঞ্জবাবুর কুকুর" দীপ্তরূপ দাশের স্টিল ফটো ড্রামা দীপ্তরূপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের (ক্যামেরার) সঠিক প্রয়োগ। শুধু চিত্ত বিনোদন নয় উৎকর্ষ সাধনও ক্যামেরার কাজ। দুর্বল হলেও শ্রী দাশের এই প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। তারাপদ ব্যানার্জীর ফটোর একটা পৃথক গ্যালারী ছিল। তারই পাশের দেওয়ালে ঠাঁই পেয়েছে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী ছাত্র উত্তমের কয়েকটি ছবি। সত্যিই উত্তমের ক্যামেরার কাজ গুরুর মতই।

বনগাঁর স্থানীয় সংবাদপত্র ‘সীমান্ত বাংলা’য় বেরোনো রিপোর্ট।

--চার্বাক দীপ্ত



অসমঞ্জবাবু, পোষ্ট অফিসে রেজিষ্ট্রি বিভাগে কাজ করেন তিনি, বিয়ে-থা করেন নি, মাসে দুটো হিন্দী ছবি, একটা বাংলা থিয়েটার কি যাত্রা, হপ্তায় দুদিন মাছ আর চারপ্যাকেট উইলস্ সিগারেট হলেই চলে, একা চাকর বিপিনকে নিয়ে আছেন,



বাজারে গেছিলেন কমলালেবু কিনতে, হঠাৎ শোনেন 'বাই ডগ? ডগ বাই? ভেরি গুড ডগ,' বাঃ! বেশ কুকুরতো! যাকে বলে ফ্রেণ্ডলি, সাথে সাথে রফা হল, অসমঞ্জ কুকুরটা কিনে নিলেন, যাই হোক একটা সঙ্গী তো হল, "স্ট্যাণ্ড আপ,' 'সিট ডাউন,' 'শেক হ্যাণ্ড' বললে যদি কুকুরটি শোনে তাহলে বেশ হবে, আর উনি হবেন সেই সাহেবের মালিক- মানে 'হিজ মাষ্টার' আর কি।



বাড়ী এসে অসমঞ্জবাবুর খেয়াল হল যে, কুকুরটার একটা নাম দেওয়া হয়নি, সাহেবী নাম ভাবতে গিয়ে প্রথমে টম ছাড়া আর কিছুই মনে এল না, হঠাৎ মনে এল রঙটা যখন ব্রাউন গোছের তখন ব্রাউনী নামটা হয়তো বেমানান হবে না,





আশ্চর্য, ব্রাউনী বলে ডাকতেই ছানাটা ঘরের কোণে রাখা বেতের মোড়াটার উপর থেকে একটা ছোট্ট লাফ মেরে তাঁর দিকে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল,

ঘটনাটা ঘটল তিন মাস পর, অসমঞ্জবাবু চেয়ারে বসতেই চেয়ারটা সরে গিয়ে চোখের পলকে তিনি চেয়ার সমেত সশব্দে মেঝের উপর পড়লেন, ডান হাতের কনুইটা বাতিল হয়ে যাবে কিনা সেই চিন্তাটাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল,





কিন্তু একটা অ-প্রত্যাশিত শব্দ তাঁকে তার যন্ত্রনার কথা ভুলিয়ে দিল; হাসির শব্দ, যাকে বলে খিল খিল হাসি, আর সেটার উৎস হচ্ছে নিঃসন্দেহে তাঁর কুকুর ব্রাউনী,



অসমঞ্জ বাবু অবাকও হলেন, আবার
চিন্তিতও হলেন, কারন কোনও বইতেই
কুকুরের হাসির কোনও উল্লেখ নেই,
অথচ ব্রাউনী যে হেসেছে তাতে
কোনও সন্দেহ নেই, শুধু হাসেনি,
হাসির কারনে হেসেছে।



দ্বিতীয় বারের হাসিটি অবশ্য খিলখিল
নয়, যাকে বলে ফিক করে হাসা, ঘরে
ঢুকে বিপিন বলল অসমঞ্জ বাবুর
দাড়ির সাবান দেখেই ব্রাউনীর
হাসি,



নিউ মার্কেটের সবকটা বইয়ের দোকানে খুঁজেও
ঐ জাতীয় কুকুরের কোনও বই পেলেন না
অসমঞ্জবাবু, তখন মনে হল- রজনী চাটুজ্যের
কাছে গেলে কেমন হয়? তাঁর পাড়াতেই
থাকেন অধ্যাপক রজনী চাটুজ্যে,



অসমঞ্জবাবু, রজনীবাবুর কাছে জানতে চাইলেন কোন কুকুর হাসে কিনা,
কারন, তাঁর নিজেরটি হাসে।





কখন হাসে? রাত্তিরে কি? রাত্তিরে আপনি ক'রকম নেশা করেন? শুধু গাজায় তো হয় না এ জিনিষ, তার সঙ্গে ভাঙ, চরস, আফিং এসবও চলে কি?

অসমঞ্জবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন।
রজনীবাবু স্পষ্ট ভাবে বললেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রানী আছে তার মধ্যে মানুষ **ছাড়া** আর কেউ হাসেনা, হাসতে পারেনা।
অসমঞ্জবাবু উঠে এলেন।







চললেন ডাঃ সুখময় ভৌমিক— ভৌ
ডাক্তারের কাছে, কি বলে দেখা যাক,

কুকুরের হাসির কথা শুনেই ডাক্তারের
চোখ কপালে উঠল, "কই প্রমাণ তো
দেখি?"





অসমঞ্জবাবু জানালেন যে, ব্রাউনী এত সহজে
করুণাময়েসী হাসি হাসে না, কেবল কোন হাসির
ঘটনা ঘটতে দেখলেই হাসে,

এরপর ডাঃ ভৌমিক আর
বেশী সময় দিলেন না
অসমঞ্জবাবুকে—





অসমঞ্জবাবু ঠিককরলেন
আর কোনদিন কাউকে ব্রাউনীর
হাসির কথা বলবেন না,

বেশ কিছুদিন থেকেই অসমঞ্জ বাবু
অভ্যাস করে নিয়েছিলেন কাজ থেকে
ফিরে এসে ব্রাউনীকে নিয়ে একটা
চক্কর মেরে আসা, একদিন এপ্রিল
মাসের এক বিকেলে বেড়ানোর সময়
হঠাৎ আচমকা এল তুমুল ঝড়।





এমন সময় এক ভদ্রলোক ওদের থেকে
হাত দশের দূরে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে
হাতের ছাতাটা খুলতে গিয়ে ঝড়ের দাপটে
সেটা হঠাৎ করে উল্টে গেল,

সত্যি বলতে কি এই দৃশ্য দেখে
অসমঞ্জ বাবুরও হাসি পেয়ে গেছিল,
কিন্তু তিনি হাসার আগেই ব্রাউনীর
অট্টহাসি পৌঁছে গেল সেই ভদ্রলোকের
কানে,





ভদ্রলোক ছাতা সোজা করার চেষ্টা বন্ধ করে অবাক বিস্ময়ে ব্রাউনীর দিকে চাইলেন।

ভদ্রলোকের মুখে 'রা' নেই দেখে অসমঞ্জ বাবুই বললেন – "লাফিং ডগ,".... হাউ এক্সট্রাঅর্ডিনারী! ভদ্রলোক একজন সাংবাদিক, তিনি জানালেন যে, অসমঞ্জ বাবু নিজেই বুঝতে পারছেন না তিনি কি আশ্চর্য সম্পদের অধিকারী,



পরের রবিবার সকালে গ্র্যান্ড হোটেলে আমেরিকার সিনসিনাটি— শহরের অধিবাসী উইলিয়াম মুডিকে খবরটা পড়ে শোনালে ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের ছোকরা নন্দী, কুকুরটা সাহেবের চাই-ই,





দু'জনে হানা দিলেন অসমঞ্জবাবুর বাড়ী। অসমঞ্জবাবু অগত্যা দু'জনকে তাঁর ঘরে এনে বসালেন।

ব্রাউনীর কেমন যেন ইতস্ততভাব, তার কারন বোধহয়, এই ঘরে এক সঙ্গে তিনজন পুরুষকে দেখেনি।



শ্যামল নন্দী সাহেবের পরিচয় দিলেন, সাহেব মার্কিন মুলুকের একজন বিশিষ্ট ধনী। ভারতে এসেছেন পুরানো গাড়ীর খোঁজে। সকালে ব্রাউনীর খবর পেয়ে তাকে একবার দেখার লোভ সামলাতে পারেন নি।



অসমঞ্জবাবু লক্ষ্য করলেন, সাহেব নানারকম মুখভঙ্গী করতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ কুকুরকে হাসানোর চেষ্টা চলেছে।
"দাঁজ হিঁ রিয়েলি ল্যাঁফ?"
বিরক্তির সঙ্গে অসমঞ্জবাবু বললেন- সব সময়ে হাসে না, যেমন সব মানুষও হাসতে বললেই হাসেনা,
অনুবাদ শুনে সাহেব জানালেন যে, প্রমান না পেলে তিনি কুকুরের পেছনে খরচ করতে রাজী নন, এই লাফিং ডগটি কেনবার জন্য তিনি সঙ্গে চেকবইটিও এনেছেন।



আপনার ভোল
পাল্টে যেত মশাই,
আপনার কুকুরকে
হাসাতে পারলে, ইনি
হাজার ডলার পর্যন্ত
দিতে রাজী আছেন
ওই কুকুরের জন্য,
মানে টাকার হিসেবে
দেড়লাখ,

রাউনী হাসছে, এ হাসি আগের কোন
হাসি নয়, এ একেবারে নূতন হাসি।





বাঁউ বাঁই ইউঁ স্ট্যাঁকিং,
.... মুণ্ডি সাহেব কম্পিত
হাতে পেনটি বের করে
অসমঞ্জবাবুর নামের
বানান জিগ্যেস করলেন।





অসমঞ্জ বাবু উত্তর দিলেন না।
নামের বানানের বদলে তিনি বললেন—
সাহেবকে বলুন কুকুর কেন হাসছে সেটা
জানলে তিনি আর টাকার কথা বলতেন
না।

"আপনি আমাকেই বলুন না।"
"সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে
দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়,
তাই শুনে কুকুর হাসছে।"
"বটে, আপনার কুকুর দার্শনিক
নাকি?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ।"
"মানে, কুকুর আপনি বেচবেন না?"
"আজ্ঞে না।"



বেড়িয়ে যাবার সময় সাহেব শুধু
মাথা নাড়িয়ে বলে গেলেন—
"....হিঁ মাষ্টঁ বি ক্রেঁজী।"





অসমঞ্জবাবু ব্রাউনীকে জিগ্যেস
করলেন — তোর হাসির কারনটা
ঠিক বলিসনি রে?

ব্রাউনী ছোট্ট করে হেসে দিল—
ফিক্ ..... অর্থাৎ ঠিক,

অপুর সংসার নিবেদিত

অসমঞ্জবাবুর কুকুর

চিত্রগ্রহণ— মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী গল্প: সত্যজিৎ রায়

অভিনয়ে—

সুকুমার সাহা • দেবাশিস দাস • শংকর দাস
প্রদ্যুৎ দাস • গৌতম মণ্ডল • দীপ্তরূপ দাস •
রুদ্রপ্রসাদ নাথ • জয়ন্ত চক্রবর্তী

অলংকরণে— পুলক পাল

সহযোগিতা— চামেলী চন্দ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা— দীপ্তরূপ দাস

অঙ্কুর সংস্থার

নিবেদিত দ্বিতীয় চিত্র-নাট্য — ৭৭

লাসমেংড



চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

দীপ্তরূপ দাস



সকাল সোয়া ন'টা; মোহিত সরকার অফিসে যাবেন, এই সময়ে ফোনটা বেজে উঠল।
'তোমার ফোন'– স্ত্রী বললেন।
'হ্যালো'!
'কে মোহিত? চিনতে পারছ? আমি সেই জয়দেব বোস, ইয়ে একটু দরকার ছিল। একবার দেখা হয়?'
'তাহলে আজই কর, সাতটা নাগাদ আসতে পারবে?'
'নিশ্চয়ই পারব, তখন কথা হবে।'
বালিগঞ্জ স্কুলের জয়দেব– যার সঙ্গে ৩০ বছর দেখাই হয়নি– স্মৃতির অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। এই সত্যটা মোহিত পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে বেশ বুঝতে পারল।

অফিসের কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফিরে—
'চিনতে পারছো? অনেক বদলে গেছি না?'





গলার স্বর শুনে, আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে চেয়ে মোহিত সরকারের যে প্রতিক্রিয়াটা হল সেটা সিঁড়ি উঠতে গিয়ে শেষ ধাপ পেরোনোর পরেও আরেক ধাপ আছে মনে করে পা ফেলতে গিয়ে যা হয়।



চোদ্দ বছর বয়সের জয়ের সঙ্গে এই লোকটির চেহারার কোন মিলই নেই।
৩০ বছরে একজনের চেহারায় এত পরিবর্তন হয় কি? নাকি কোন ধাপ্পাবাজ।



মোহিত বিপিনকে ডেকে চা আনতে বললেন, আর সেই সঙ্গে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, কেক মিষ্টি যদি নাও থাকে তাহলেও ক্ষতি নেই। এনার পক্ষে বিস্কুটই যথেষ্ট।

মোহিত একটা কথা না বলে পারলেন না—
'তোমারতো মোটামুটি আমারই বয়েস ছিল বলে মনে পড়ে'—
'তোমার চেয়ে তিন মাসের ছোট।'
'— তাহলে এমন বুড়োলে কি করে? চুলের দশা এমন হল কী করে?'
'স্ট্রাগল, ভাই স্ট্রাগল,' বললেন আগন্তুক।





বিপিন চা এনে দিল।

'ছেলেটার পরীক্ষা আসছে, অথচ
এমন দশা, জানো মোহিত ভাই, স্ত্রী-
এর টাকাটা যে কোত্থেকে আসবে
তা তো বুঝতেই পারছি না।'
'তাই বলছিলাম ভাই, অন্তত শ'-
খানেক টাকা যদি এই পুরোনো বন্ধুর,
হাতে —





'আর বলতে হবেনা, মোহিত বুঝে
নিয়েছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল
এর আসার কারণটা, মোহিত মনস্থির
করে ফেলেছেন, ইনি যে 'জয়' চেহারায়
তার কোন প্রমান নেই, যদি জালিয়াত
হয়!

'সবিভাই, আমার কাছে
জাস্ট নাউ ক্যাশের একটু
অভাব।'
'আমি কাল আসতে পারি
এনি টাইম, তুমি যখনই
বলবে।'
'কাল আমি কলকাতায় যাব,
ফিরব দিন তিনেক পরে,
তুমি রোববার এস।'
'রবিবার........,'





'আচ্ছা, তাহলে আমি.....
তুই এই উপকারটা করলে সত্যিই
চেটকুল থাকব ভাই।'

ঘরে ঢুকলেন মোহিতের
অন্তরঙ্গ বন্ধু বানীকান্ত সেন।
আরও দুজন আসার কথা আছে
তারপর তাদের আড্ডা
বসবে। এটা রোজকার
ঘটনা।

বানীকান্ত ঘরে ঢুকেই-
যে আগন্তুকের দিকে
একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিলেন
সেটা মোহিতের দৃষ্টি
এড়াল না। আগন্তুকের
সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়ের
ব্যাপারটা মোহিত অম্লান
বদনে এড়িয়ে গেলেন।





'এই চোর তোমাকে
তুই করে বলছে—
ব্যাপারটা কি?'
'এতক্ষণ তুমি বলছিল,
শেষে তোমাকে শুনিয়ে
তুই বলল।'
'লোকটা কে? অন্তত
৩২ বার দেখেছি রেসের
মাঠে।'



'সেটাই স্বাভাবিক;'
মোহিত তারপর
আগন্তুকের সঙ্গে কী
কথা হলো সেটা
সংক্ষেপে বললেন।
'পুলিশে খবর দে। চোর
জোচ্চোরদের ডিপো
হয়েছে কলকাতা শহর।'

'রোববার এসে আমাকে না
পেলেই ব্যাপারটা বুঝবে, তারপর
আর উৎপাত করবে বলে মনে
হয় না। রোববারতো যাচ্ছি বারুই-
পুর নিখিলের বাগান বাড়ীতে।
তুমিতো আবার যেতে পারবে না।'





বারুইপুরে বন্ধুর
পুকুরের মাছ, পোলট্রির
মুরগীর ডিম খেয়ে আর
বন্ধুদের সঙ্গে তাস
খেলে ভালোই কাটলো
দিনটা।

বাড়ী ফিরে মোহিত
বিপিনের কাছে শুনলেন
যে, সেই লোকটি আজ
আবার এসেছিল।
'যাবার সময় কিছু বলে
গেছে কি?'
'আজ্ঞে না।'
'যাক, নিশ্চিন্ত! আর
আসবে না।'





পরদিন সকালে
বিপিন একটা ভাঁজ
করা চিরকুট এনে
দিল মোহিতকে।

ভাই মোহিত,
আমার জান পাখি মরতে বসেছে, তাই
ছেলেকে পাঠালাম, সামান্য স্বরূপ-সামান্য
কিছুও এর হাতে দিলে অনেক উপকার
হবে। আশা করি হতাশ করবে না, —
ইতি
জয়—



মিনিট খানেকের মধ্যেই
একটি ১৫-১৬ বছর
বয়সের ছেলে দরজা
দিয়ে ঢুকে মোহিতের
দিকে এগিয়ে এলো।



একদম ৩০ বছর আগেকার
জয় যেন এসে মোহিতকে
প্রনাম করে আবার কয়েক
পা পিছিয়ে গিয়ে চুপ
করে দাঁড়িয়ে রইল।
মোহিত তার দিকে চেয়েই
থাকলেন।





'বোসো'
ছেলেটি একটু ইতস্তত
ভাব করে সোফার
এক কোণে জড়সড়
হয়ে বসল।

'আমি আসছি এক্ষুনি।' বলে
মোহিত দোতলায় গেলেন
টাকার ব্যাগ আনতে।





'টাকা সাবধানে নিতে
পারবে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'আমার গাড়ী তোমাকে
বাড়ী পৌঁছে দেবে।'



কড় কড়ে ২০০ টাকা **সেই** ছেলেটির
হাতে তিনি দিলেন।
ভারী হাল্কা বোধ করছেন তিনি; ভারী প্রসন্ন।
জয়কে দেখে না চিনলেও তিনি তার
ছেলের মধ্যে তাঁর ৩০ বছর আগের
ক্লাসফ্রেণ্ডটিকে ফিরে পেয়েছেন।



সারস্বত উৎসব উপলক্ষে নানা বছরে প্রকাশিত নিশ্চিন্দিপুর ও বনগাঁর কোথায় কী।



সারস্বত উৎসব উপলক্ষে নানা বছরে প্রকাশিত নিশ্চিন্দিপুর ও অপুর সংসারের চাঁদার বই।

গণমাধ্যমে দীপ্তরূপ

‘অপুর সংসার’-এর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সঙ্কিতা দাস : এবারের আশ্বিন এল, অথচ আকাশে সাদা মেঘ উড়ল না। সাদা ফিঙেলি আর কাশবন হাওয়ার দোল পেল না। কালো মেঘের দাপনীর মধ্যেও ‘অপুর সংসার’ সম্প্রতি বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে সংস্কৃতি প্রেমীদের মনে একটু দোলা দিয়েছিল তাদের প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ‘আশ্বিন ঐ এলো’ আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন বৈশাখী কর্মকার। ‘বিদীর্ণা’ বিত্‌স্তিত্‌ঘষের ‘মেঘমল্লার’কে শ্রুতিনাটকে শোনালেন, তখন বৃষ্টি নেমেছিল তবে বনে নয় শ্রোতাদের মনে। একক ও সম্মেলক কবিতা আবৃত্তি শোনালেন ‘অনুভব সংস্থা’। তারপরে গানে গানে দর্শক শ্রোতাদের মাতিয়ে তুললেন শাশ্বতী ঘোষ ও শিপ্রা রায়। অবশেষে অপুর সংসারের সদস্যবৃন্দ অভিনেতা-নাট্যকার মনোজ মিত্রের ‘মহাবিদ্যা’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে অনুষ্ঠান যবনিকা টানলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি নিখিলেন্দু দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন অনিল চৌধুরী। সম্পাদক দীপ্তরূপ দাস জানান যে অভিনেতা-নাট্যকার-কবি ও আবৃত্তিকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধদের এক সমাবেশই হচ্ছে এই সংস্থা। সুস্থ ও সৎ সিনেমা প্রদর্শন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি উপস্থিত দর্শকদের সৎ সিনেমা ও সৎ সংস্কৃতি আন্দোলনের শরিক হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

চার □ PRANTADESH-Bengali Fortnightly News

যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসব

প্রতি বছরের মত এবারও দীপ্তরূপ দাস ও প্রদ্যুৎ দাস পরিচালিত কোর্ট রোডের যৌবরাজ্যে হল সারস্বত উৎসব। শুধু সরস্বতী পুজা নয়, সংস্কৃতিমনা বনগাঁবাসীর কাছে এই উৎসব পরম কাম্য হয়ে যাবে এর নতুন নতুন আঙ্গিকের জন্য। যেমন এবছরই প্রকাশিত হল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারস্বত উৎসব স্মারক পত্রিকা। নাম ‘নিশ্চিন্দিপুর’ বিষয়বস্তুর নতুনত্বে যেমন দীপ্তরূপ দাসের ‘আমার শিক্ষকতা’ শীর্ষ নিবন্ধটি। শিক্ষাবিষয়ক সমীক্ষাটি নিঃসন্দেহে সুধীজনকে ভাবাবে, এছাড়াও ছিল ‘অপুর সংসারের’ চিত্রনাট্য সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে ‘অসমঞ্জবাবুর কুকুর’ এরকম একটি ‘লাইভ কমিকস্’ অন্য কোথাও হয়েছে কিনা আমাদের অন্ততঃ জানা নেই।

(শেষ পাতায় দেখুন)

যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসব

(১ম পাতার পর)

অনুষ্ঠানে বনগাঁর মধ্যে গত বছর বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বানিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ মানাধিকারীকে দেওয়া হয় ৺মাখনলাল দাস স্মৃতি পুরস্কার। দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মানাধিকারীকে দেওয়া হয় মনি মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার। এছাড়াও বিশিষ্ট ভাস্কর সুনীল সরকারকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্বর্ধনা। এরপর দেখান হয় অপুর সংসার নিবেদিত এবং দীপ্তরূপ দাস পরিচালিত ভি ডি ও টেলিফিল্ম ‘মলমলের আগে’।

যৌব রাজ্যের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিত্রনাট্য আমাদের দেশে নতুন না হলেও এই জেলাতে অপুর সংসার প্রযোজিত দীপ্তরূপ দাস পরিচালিত ‘ক্লাস ফ্রেণ্ড’ একেবারেই নতুন আঙ্গিকে চমকপ্রদ উপস্থাপন, যা দর্শকদের অনায়াসে আকৃষ্ট করে। সত্যজিৎ রায়ের কাহিনীতে মোহিতের কাছে ৩০ বছর পর এসে ছেলের পরীক্ষার ফি র একশ টাকা ধার চায় এক সময়ের অভিন্ন হৃদয় স্কুলবন্ধু জয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত মোহিত হত দরিদ্র হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর হাত পেতে টাকা চাওয়ার মধ্যে ঠগবাজ মানুষ ছাড়া ভাবতে পারেন না।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুকুমার সাহা সমর মুখোপাধ্যায়। দুটি চিত্র বিশেষ করে কারোর কাছে হাত না পাতা জয় ছেলের জন্যে হাত পাতার অসহায় আত্মসমর্পণ আর অনস্তোপায় উদ্বেগ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনেতার পরিচয় দিয়েছেন বশিষ্ঠ গোস্বামী। চিত্র-নাট্যটি ২৬—২৮শে জানু: চিত্রপ্রদর্শনীতে অপ্রদর্শিত রাখার পিছনে কর্তৃপক্ষের সংকীর্ণতাই প্রকটিত হয়েছে। দীপ্তরূপ দাস অবশ্য বলেছেন, এর পিছনে ছিল প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের হীন ষড়যন্ত্র

দীপ্তরূপের দীপ চিত্রনাট্য ‘ক্লাসফ্রেণ্ড’

নারায়ণ মণ্ডল : চিত্রনাট্য আমাদের দেশে নতুন না হলেও এই জেলাতে অপুর সংসার প্রযোজিত দীপ্তরূপ দাস পরিচালিত ‘ক্লাস ফ্রেণ্ড’ একেবারেই নতুন আঙ্গিকে চমকপ্রদ উপস্থাপন, যা দর্শকদের অনায়াসে আকৃষ্ট করে। সত্যজিৎ রায়ের কাহিনীতে মোহিতের কাছে ৩০ বছর পর এসে ছেলের পরীক্ষার ফি-র একশ টাকা ধার চায় এক সময়ের অভিন্ন হৃদয় স্কুলবন্ধু জয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত মোহিত হত দরিদ্র হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর হাত পেতে টাকা চাওয়ার মধ্যে ঠগবাজ মানুষ ছাড়া ভাবতে পারেন না। টাকা দেওয়ার কথা বলেও প্রতারক বন্ধুকে প্রতারিত করতেই মোহিত বাড়ি থাকে না। কিন্তু পরের দিন বন্ধু পুত্রই এসে হাজির হয় মোহিতের সামনে। অভিনয়ে বশিষ্ঠ গোস্বামীর দুটি চিত্র বিশেষ করে কারোর কাছে হাত না পাতা জয় ছেলের জন্য হাত পাতার মধ্যে অসহায় আত্মসমর্পণ আর অনন্যোপায় উদ্বেগ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা জাত অভিনেতার পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতে দিলীপ ঘোষ ভাল, তবে অফিস যাওয়ার সময়ে ফোন আসা বা শেষ দৃশ্যে আরও চরিত্রানুগ হওয়া উচিত ছিল। তবে এই চিত্র-নাট্যটি ২৬—২৮শে জানুয়ারীর চিত্রপ্রদর্শনীতে অপ্রদর্শিত রাখার পিছনে কর্তৃপক্ষের সংকীর্ণতাই প্রকটিত হয়েছে। দীপ্তরূপ দাস অবশ্য বলেছেন, এর পিছনে ছিল প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের হীন ষড়যন্ত্র।

চলচ্চিত্রে বনগাঁর ছাত্র-যুবরা

সোমদেব রায়

মানুষ মাত্রই তার প্রতিবিম্ব দেখতে ভালবাসে। সম্ভবতঃ প্রথমে মানুষ জলের মধ্যেই তার প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়েছিল। পুলকিত হয়েছিল কিন্তু খুশী হয়নি। কারণ জলের প্রতিবিম্ব তো ধরে রাখা যায় না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি মানুষের ইচ্ছা পূরণ করেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যামেরা, ফিল্ম, ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে মানুষের ছবি। তাও তো খুব বেশী দিন বয়স হয়নি ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলির। মানুষ কিন্তু নিজেদের স্থির দেখে সন্তুষ্ট থাকেনি বেশী দিন। স্থির ছবিতো কথা বলে না, চলে না। মুভি ক্যামেরা তো প্রোজেক্টার মেশিনের মাধ্যমে সে আশাও পূরণ করেছে। সিনেমা হল দিয়ে বেশ কিছুকাল মানুষ তার বিনোদনের কাজ এগিয়ে নিয়েছে। এখন T.V. ঘরে বসেই বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে দিচ্ছে। VIDEO ক্যামেরার মাধ্যমে যে কোন ছবিই জীবন্ত হয়ে উঠছে। বনগাঁ শিল্প-সাহিত্যের পীঠস্থান তা আজ আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বেশকিছু উৎসাহী যুবক VIDEO ক্যামেরার মাধ্যমে তাদের শিল্পের চেতনাকে উদ্ভাসিত করে চলেছেন। বেশ কিছু ছাত্র, যুবক ও শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বনগাঁর "অপুর সংসার" নামে একটি ক্লাব। ক্লাবের সম্পাদক দীপ্তরূপ দাসের পরিচালনায় তৈরী হয়েছে পাঁচটি VIDEO Film. আলোচনায় আর একটি নাম অগ্রগণ্য—নিলয় বসু. পেশায় শিক্ষক। বহু বছর আগে তিনি বনগাঁর আশেপাশে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন নিয়ে করেন একটি তথ্যচিত্র। শিশু পত্রিকা ইউনিসেফের [illegible] এই ছবিটির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, বেশকিছু আলোচকের ও দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেন। নিলয় বাবুর চিন্তা-চেতনায় নতুন কিছু উপহার হয়তো বনগাঁবাসীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

অপুর সংসার বাংলার কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য একটি ক্লাব। এই ক্লাব পাঁচটি VIDEO Film-এর কাজ হাতে নিয়েছিল। ছবিতে বিষয় অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথম Film টি (স্বপন) প্রকাশযোগ্য করে তোলা যায়নি। ২য় ছবি সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে "গোলাইপুর সংবাদ" দর্শকদের দরবারে অপুর সংসার নিয়ে আসে ১৯৯৩-এর সরস্বতী পুজোর দিন "যৌবরাজ্যের" আঙ্গিনায়। সেই থেকে প্রতি বছর ছবিগুলির প্রদর্শন সরস্বতী পুজোর দিন উল্লেখিত স্থানেই হয়ে আসছে। ১৯৯৪-এ তৈরী হয় প্রদীপ ঘোষের গল্প অবলম্বনে সংস্থার দ্বিতীয় ছবি 'ফুটো'। এই ছবিটির মাধ্যমে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে ডুবে থাকাদের সচেতন করার কাজ সহজ হয়েছে। ছবিটি বহুবার বিভিন্ন বিজ্ঞান মঞ্চ ও বনগাঁর কেবল টিভির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। ৩য় ছবি মতি নন্দীর গল্প অবলম্বনে "দল বদলের আগে"। কলকাতা, বনগাঁ ও বিভিন্ন স্থানে ফুটবলের দল বদলের আগে ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের মধ্যে যে লড়াই শুরু হয় তা থেকে ফুটবলার ও তাদের পরিবারগুলির যে নাজেহাল অবস্থা হয় তার পটভূমিকায় এই ছবি। যে কোন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তার মনে হবে যে এটাতো আমারই ছবি। এই ছবিটির চরিত্রায়ন করেছেন— দীপশিখা ঘোষ, দিলীপ ঘোষ, পুলক পাল, সমর মুখোপাধ্যায়, শারজেক রহমান, সঞ্জয় বসু ও অপুর চক্রবর্তী।

এ বছর যে ছবিটির শুটিং-এর কাজ চলছে— বিখ্যাত গল্প ডাঃ জেকল ও মিঃ হাইড অবলম্বনে "সাদা-কালো"। প্রত্যেক মানুষের-ই দুটি রূপ। মানুষের চিরন্তন একটি প্রশ্ন যে রূপ আমরা বাইরে থেকে দেখি সেটাই কি তার আসল রূপ? না, যে শত্রুদের বাস আমাদের মনের মধ্যে তাকে যদি মিঃ হাইডের মাধ্যমে জন সমক্ষে নিয়ে আসা যায় তবে কেমন হয়? কি দেখবেন? সেই লুকানো শয়তানকে? পরিচালক দীপ্তরূপ দাস জানালো এবার সরস্বতী পুজোর দিন যৌবরাজ্যের আঙ্গিনায়। এবারের অভিনেতাদের তালিকা যা দিলেন তাতে বেশ কয়েকটি নতুন মুখ—তার মধ্যে অবাক করে দেওয়া একটি নাম—অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ, আর অন্য অভিনেতাদের নাম—পাওয়া গেল দীপ্তরূপ বাবু বললেন—সব বোস একবারে ফাটাবেন না, শুধু ছাত্র-যুব উৎসবের সাংস্কৃতিক বিভাগের কনভেনর ডাঃ জেকল্, না মিঃ হাইড না তার থেকেও বড় কেউ সেটাই দেখুন।

দিল্লি এক্সপ্রেস

রোদন ভরা এ হেমন্ত!

দীপ্তরূপ দাস



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক

১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ অভিনেতা, নাট্যকার, আবৃত্তিকার, কবি—বনগাঁর প্রিয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছায়, উঁহার একটা সংস্থা 'অপুর সংসার'-এর পথচলা শুরু হয়। মঞ্চনাটক, চিত্রনাট্য, শর্ট ফিল্ম নির্মাণে সৌমিত্রবাবুর শুভেচ্ছা সদা 'অপুর সংসার' [illegible]।

সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে [illegible] প্রথম আলাপ আমাদের সংস্থার [illegible] ১০ই ডিসেম্বর [illegible] মাঠে। [illegible] সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] এসেছিলেন। আমি আর পুলক পাল গিয়ে দেখা করলাম ওঁর সঙ্গে, [illegible] সেই শুরু। তারপর থেকে নিরন্তর ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ।

রবীন্দ্রভবনে 'টিকটিকি' দেখার পরদিন ওঁর বাড়িতে প্রথম গেলাম আমি আর পুলক। [illegible]

ছোটবেলা থেকেই আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ। [illegible] 'রাজকুমার', 'সাতপাকে বাঁধা', 'ঝিন্দের বন্দী', 'চারুলতা', 'অভিযান', 'অশনি সংকেত', 'সোনার কেল্লা' [illegible]

[illegible]

১৯৯৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। [illegible]

এও তো এক শিক্ষা।

সৌমিত্র আজ আর নেই। [illegible]

অবসর নিলেন

গ্রন্থাগারিক দীপ্তরূপ



সংবাদদাতা: বনগাঁ শহরের শ্রমিক পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক দীপ্তরূপ দাস ৩১ জুলাই অবসর নিলেন। লকডাউনে লাইব্রেরিগুলি বন্ধ রয়েছে। তাই সরকারি পর্যায়ে কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব দীপ্তরূপ দাস। একই সঙ্গে তিনি হেলেঞ্চার প্রগতি লাইব্রেরিরও দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। বনগাঁয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা উপলক্ষ্যে ও শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে 'গ্রন্থাগার দর্পণ' নামে পাঠাগার কর্মীদের মুখপত্র প্রকাশ করেন, তার সম্পাদক দীপ্তরূপ। মননশীল ভাবনা ও রচনা করতে সিদ্ধহস্ত। তিনি শুধু যে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, তাই নয়, তিনি বহু শর্ট ফিল্মের পরিচালক। নাট্য পরিচালনাও করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের স্নেহধন্য দীপ্তরূপ দাসের অবসর জীবন ভালো কাটুক—কামনা করেছেন পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত প্রিয়জনেরা।

শিল্পায়ন নাট্যপত্রিকা — ৩

নাট্য সংবাদ

'অপুর সংসার'-এর অনুষ্ঠান
শিল্পায়ন-এর 'সম্প্রীতি বিলাস'

বনগাঁ টাউন হলে সম্প্রতি বনগাঁ অপুর সংসার সংস্থার আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ২৭ সেপ্টেম্বর। অনুষ্ঠানে যৌবরাজ্যের নবরূপা নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশন করলেন মূকাভিনয়। অনুষ্ঠানটি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। এরপর 'অপুর সংসার' সংস্থা প্রযোজনা করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রূপান্তরিত একাঙ্ক নাটক 'আর একদিন' (ওয়ান মোর ডে অবলম্বনে)। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন পুলক পাল। অভিনয়ে বিশ্বাস রায়চৌধুরী (সলিল) এবং মহুয়া চক্রবর্তী (রেণু) দর্শক অভিনিবেশ দাবী করেছেন। শেষে যৌবরাজ্যের শিল্পায়ন প্রযোজনা করলেন তপোব্রত মিত্রের 'নৌকাবিলাস' ছোটগল্প অবলম্বনে আশিস চট্টোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'সম্প্রীতি বিলাস'। দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিতি অভিনন্দনযোগ্য। □

যৌবরাজ্যের সরস্বতী উৎসব

সংবাদ দাতা: ২৭শে জানুয়ারী যৌবরাজ্যের সরস্বতী উৎসব উপলক্ষে একটি [illegible] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান [illegible] ভূমিকা অভিনয় [illegible] সৌমিত্র সরকার ও [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]

[illegible] দীপ্তরূপ দাসের [illegible] 'দল বদলের আগে' [illegible]

[illegible]

সত্যজিৎ জন্মোৎসবে অপুর সংসার

ভারতবর্ষের মহান চলচ্চিত্রকার, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী গত ৫ই মে '৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 'অপুর সংসার' সংস্থার পরিচালনায় বসে আঁকো (বিষয়—সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের যে-কোন দৃশ্য), গুপীর গান, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, আবৃত্তি ও সত্যজিৎ কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। গত ২রা মে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন হলেও ঐ দিন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি কারণ লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের দিন ধার্য থাকায়। সকালে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হয় বনগাঁ উজ্জ্বল সংঘ ভবনে সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। ঐ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সত্যজিৎ সম্পর্কিত আলোচনা, গান, কবিতা পাঠ এবং সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে শ্রুতি নাটক ও স্থানীয় সাহিত্যিক, অধ্যাপক মণি মণ্ডলের লেখা গল্প অবলম্বনে পাঠ পাটিকা। প্রসঙ্গত প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি প্রদান করা হয় মণি মণ্ডল মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

গতানুগতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন ধরনের প্রচেষ্টার ফসল এই অনুষ্ঠান এক ঝলক টাটকা বাতাস বলে মনে হয়। ধন্যবাদ প্রাপ্য অবশ্যই 'অপুর সংসারের'। প্রসঙ্গত এই 'অপুর সংসার' সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ কিছু নবীন-প্রবীণের সমাবেশ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দেখানো হয় উক্ত সংস্থার কর্ণধার দীপ্তরূপ দাসের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত ভিডিও ফিল্ম 'সাদা কালো' প্রখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিক স্টিভেনসনের কাহিনী 'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড হাইডের' বাংলা রূপান্তর এই ফিল্ম। অভিনয়ে পুলক পাল ও রুদ্রপ্রসাদ নাথের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। ক্যামেরার কাজ সুন্দর। সম্পাদনা আরও ভালো হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে পরিচালক নিশ্চয়ই নজর দেবেন বলে বিশ্বাস।

—অরুণাক্ষ ভট্টাচার্য

যৌবরাজ্যের জীবনধর্মী উৎসব

পাপিয়া মধু : শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথির ছোঁয়া লাগে ২৫শে জানুয়ারী। ঘরে ঘরে শুরু হয়ে যায় দেবী সারদার আরাধনা। জীবনের সঙ্গে জীবনকে মেলাতে এদিন যৌবরাজ্যের সারস্বত উৎসব যুব মনের চাহিদা-কল্পনা-রঙ বিদ্রোহকে রূপ দিতেই সংস্থার সূচনা সাতাশি সালে এঁদের ঘোষিত নীতি : এখানে পড়ানো হয় না, শেখানো হয়। সারাবেলা-খাওয়া দাওয়া, সারা সন্ধ্যা গান গাওয়া। প্রশান্ত দাস নিবেদন করেন যৌবরাজ্যের কথা। পত্রিকা সম্পাদক রুদ্রপ্রসাদ নাথ, সঞ্জয় বসু মন থেকে মনে ছড়িয়ে দেন উত্তাপ নিশ্চিন্দিপুর এর পাতায় অর্পণ করা হলো মাখনলাল দাস স্মৃতি পুরস্কার ও মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি যথাক্রমে জ্যোতির্ময় ঘোষ, সমর মুখোপাধ্যায় আর সুকুমার সাহা। সঞ্চালক ছিলেন সংস্থাদ্বয়ের কর্ণধার ও শিক্ষাব্রতী দীপ্তরূপ দাস। এই সাথে আয়োজন করা হয় অপুর সংসার নিবেদিত ও দীপ্তরূপ দাস পরিচালিত ভিডিও ফিল্ম সাদা-কালো সত্যজিৎ রায়ের 'ক্লাস ফ্রেণ্ড' গল্পের চিত্রনাট্য ফটো নাটকে রূপান্তরিত এই প্রদর্শনীটি নজর কাড়ে সুধীজনের নাটকে অভিনেতার উজ্জ্বল ভূমিকা ফুটিয়ে তোলেন বংশষ্ঠ গোস্বামী।

যুগান্তর

সোমবার ৪ ভাদ্র ১৪০২ ❑ ২১ আগস্ট ১৯৯৫

অপুর সংসার

কলকাতার এখানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওখানে—সেখানেও প্রতিনিয়তই অনুষ্ঠিত হচ্ছে নজরকাড়া অনুষ্ঠান। সম্প্রতি যৌবরাজ্যে অপুর সংসারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল সাহিত্যিক মনিমন্ডল স্মরণ অনুষ্ঠান এবং সত্যজিৎ সন্ধ্যা। অপুর সংসার মূলত সত্যজিতের অপু আদলেই গড়ে ওঠা একঝাঁক নবীন প্রবীণদের সংগঠন এবং সত্যজিৎ ভাবনা নিয়ে তাঁদের উদ্যোগ এবং কাজকর্ম রীতিমতোই প্রশংসনীয়। ওইদিন দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রবীণ সাংবাদিক রতন সাধুকে স্মারক তুলে দেন শ্রীমতী কল্পনা মন্ডল। সত্যজিতের জীবন ও সাহিত্যের সমকালীন সমাজে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন সাহিত্যিক সমর মুখোপাধ্যায় এবং নৃসিংহ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি করেন ক্ষুদে আবৃত্তিকার বিহঙ্গদূত। অপুর সংসারের কর্ণধার দীপ্তরূপ দাসের পরিচালনায় সত্যজিতের কাহিনী অবলম্বনে ভিডিও ফিল্ম 'গোঁসাইপুর সরগরম' এরপর দেখান হয়। জমজমাট কাহিনীর উপর তরতর করে বেড়ে ওঠা গোঁসাইপুরের কান্ড চিত্রগ্রহণে সফল হলেও সম্পাদনা তেমন ভাল লাগে না। ভাল লাগে পুলক পাল ও সুকুমার সাহার অভিনয়। বর্তমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমন ঘোর দুর্দিনে উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সমর্থনের অভাব নিয়ে ক্ষোভ রইলেও এদিনের অনুষ্ঠানে দীপ্তরূপবাবু যে সার্থক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গণশক্তি ১৯শে মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯৯ (তিন)

'অপুর সংসার' ও প্রধানমন্ত্রী



'প্রধানমন্ত্রী' ভিডিও ছবিতে জ্যোতি ঘোষ ও পিন্টু ভট্টাচার্য।

প্রধানমন্ত্রী'। ভারতবর্ষের বর্তমান ছবিটাই ফুটে উঠেছে অপুর সংসার প্রযোজিত ভিডিও ফিল্ম প্রধানমন্ত্রীতে। রমানাথ রায়ের কাহিনী নিয়ে জমাটি গল্প প্রধানমন্ত্রী।

কেরানী হরিপদ ভালো কাজের সুবাদে অফিসের বড় বসের কাছ থেকে একটি বর পায়। যার ফলেই হাতের নাগালে চলে আসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মস্ত বড় সুযোগ। তারপর সব পরিচিত ঘটনাগুলিই উঠে এসেছে চরিত্রায়ণে। পরিচালক দীপ্তরূপ দাস জানিয়েছেন ভারতের বর্তমান রাজনীতি এবং পরিবারের মুখ ও মুখোশের গল্প 'প্রধানমন্ত্রী'।

অভিনয়ে হরিপদর ভূমিকায় পিন্টু ভট্টাচার্য, কাকলী বিশ্বাস ছাড়াও আছেন জ্যোতি ঘোষ, কল্পনা মণ্ডল প্রমুখ। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে ছোট ছবি তৈরির যে প্রচেষ্টা চলছে উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত শহর বনগাঁর অপুর সংসার তাদের অন্যতম। গত বছরে 'সাদা-কালো' ছবিটিও সাড়া জাগিয়েছিল। এই মহতী প্রচেষ্টাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

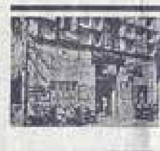
❑ অলক বিশ্বাস

গণশক্তি ২৬শে জুলাই, শুক্রবার, ১৯৯৬

অপুর সংসারে-র প্রথম প্রয়াস 'সাদা-কালো'

বিজ্ঞানী সীতাংশু রায় দীর্ঘদিন ধারাবাহিক গবেষণার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ ধরনের ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। যে ওষুধ শরীরে প্রয়োগ করলে মানুষ বা জীব জন্তুর দৈহিক পরিবর্তন হয়ে যায়। সাংবাদিক সম্মেলন করে আবিষ্কারের সংবাদটি প্রকাশ করা হয়। পরদিন এই সংবাদ প্রভাতী দৈনিক গুলোতে প্রকাশিত হলে গোটা শহর জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঢল নামে মানুষের। এভাবেই কাহিনীর শুরু। স্টিভেনসনের 'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড হাইড' ছায়া অবলম্বনে অপুর সংসারের প্রথম প্রয়াস 'সাদা কালো'। ইতোমধ্যে এই টেলিফিল্মটি স্থানীয় কেবল টি ভি-র বিভিন্ন চ্যানেলগুলিতে দেখানো হয়েছে। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত শহর বনগাঁয় এই প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হয়েছে। সম্পাদনায় সামান্য ভুল ত্রুটি চোখে পড়লেও তাতে ছন্দপতন হয়নি। স্থানীয় কলা কুশলীদের প্রচেষ্টায় যে যাত্রা শুরু হলো তাতে কয়েকজনের অভিনয় ভালো লেগেছে। বিজ্ঞানীর ভূমিকায় রুদ্রপ্রসাদ নাথ, কৃষ্ণেন্দু গুপ্তের ভূমিকায় পুলক পাল, দেবী (কাকলী বিশ্বাস) চমৎকার। মিহির বাগের ক্যামেরার কাজ মন্দ নয়। পরিচালক ও নির্দেশক দীপ্তরূপ দাস জানিয়েছেন সংস্কৃতির দুনিয়া পরিকল্পিতভাবে যে ভাবে দূষিত করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে 'অপুর সংসার' আন্দোলন শুরু করলো। এটি কোনও বানিজ্যিক সংস্থা নয়। এজন্য খুব কম খরচে 'ঐ উদ্দেশ্য'-কে মাথায় রেখেই কাজ করা হয়েছে। প্রগতিশীল সংস্কৃতিমনা মানুষদের আমরা পাশে চাই। গ্রাম বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য আর সহজ সরল মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আবারও উপস্থিত হবেন টেলি ফিল্মে সেই কর্মসূচী চলছে।

❑ অলক বিশ্বাস



আমরা চাই
তরুণ-তরুণীদের জন্য 'লাভ পার্ক'



দীপ্তরূপ দাশ

আমার পিতৃপ্রতিম শিক্ষক হাবরা বিএড কলেজের অধ্যক্ষ বলতেন, "যদি সবাই শুধু নিজের কাজটুকু করত, তাহলে এত আন্দোলন, এত বিপ্লব করতে হত না।"

নতুন পুরসভার সদস্যদের উদ্দেশে জানাই, অন্যের দোষ না-দেখে শুধু নিজের কাজটুকু যদি সুষ্ঠুভাবে করা হয়, তবে শুধু বনগাঁ নয়, সমগ্র পৃথিবীটাই সুন্দর হয়ে উঠবে। চাই তো অনেক কিছুই। সংস্কৃতিকেন্দ্র চাই, পার্ক চাই, তরুণ-তরুণীদের জন্য 'লাভ পার্ক' চাই, চওড়া রাস্তা চাই, সুইমিং পুল চাই, পিকনিক স্পট চাই। কিন্তু...

রাতে আমার একটা স্বপ্নের কথা বলি— আমি ৪ নং ওয়ার্ডে থাকি। ৪ নং ওয়ার্ড মানে বিচালিহাটা, পেয়ালাপাড়া, আমলাপাড়া, তালতলা, যশোর রোড জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। যদি ওয়ার্ডভিত্তিক একটিই ক্লাব থাকত (ব্যাঙের ছাতার মতো দুর্গাপুজাকেন্দ্রিক রাশি রাশি ক্লাব নয়)— তার সভাপতি হবেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সম্পাদক হবেন যুবক-যুবতিরা। ক্লাবঘরে থাকবে বয়স্কদের ঘর, ছোটদের ঘর, মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা আড্ডাখানা। ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মাঝে মাঝে তাঁদের সাধ্যমতো চাঁদা দেবেন। সেই চাঁদায় দুর্গাপুজা, সরস্বতীপুজা, বাৎসরিক পিকনিক, রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে। দুর্গাপুজোয় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর দিন আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব। আড্ডা মারব। পুজোয় অঞ্জলি দিতে দিতে এ-পাড়ার বান্টি ও-পাড়ার বাবলির দিকে আড়চোখে তাকাবে। ছোট একটি 'কমিউনিটি হল' থাকবে— যেখানে সব অনুষ্ঠান হবে।

ঘরের পাশেই অশোকনগরের সংহতি পার্ক, মিলেনিয়াম পার্ক, শহিদ সদন দেখে আমি বিস্মিত হই— যা ওরা পারে, কেন আমরা তা পারি না? বহুদিন ধরে শ্রীমা ও নন্দিতা সিনেমা হলদুটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। আমি চাই, পুরসভা ওই দুটি হল অধিগ্রহণ করলে বাণিজ্যভিত্তিক মল বা স্থায়ী বইবাজার বা প্রদর্শনীশালা বানানো যায়।

সবাই জানেন, সাহিত্যিক শংকরের আদিবাড়ি আমাদের ওয়ার্ডে। যদি ওই বাড়িটি সংরক্ষণ করা যায়, তবে সেখানে শংকরের অনুমতিক্রমে একটি সংগ্রহশালা করা যায়।

সবশেষে একটি অনুরোধ, বনগাঁর গর্ব বিভূতিভূষণ, দীনবন্ধু মিত্র এবং রাখালদাস-এর অন্তত তিনটি আবক্ষমূর্তি মুক্তমঞ্চের কাছে স্থাপিত হোক।

দীপ্তরূপের ভিডিও ফিল্মঃ আজবসন্ত এবং ক্লাসফ্রেণ্ড

প্রতীম চট্টোপাধ্যায় ঃ বনগাঁর সঙ্গীত, নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নৃত্য শিল্পের সমস্ত ধারা নিয়েই গর্ব করার অবকাশ সত্যিই আছে। সমগ্র বাংলা-সংস্কৃতির নিরীখেই তা বলবার মতন। কিন্তু চলচ্চিত্র? সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র তৈরি করার বিষয়ে কি আমরা বনগাঁবাসীর কোনও কাজ নিয়ে গর্ব করতে পারি (এক্ষেত্রে 'বাঁশের কেল্লা', 'নবীগোপালের বিয়ে' প্রভৃতি খ্যাত পরিচালক, একসময় বনগাঁর গোবরাপুর নিবাসী সুধীর মুখার্জি-কে আলোচনার বাইরেই রাখছি)? এই প্রশ্ন উঠলেই মনে হচ্ছে যে, বনগাঁর কেউ নিশ্চয়ই চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। হ্যাঁ বলা যেতেই পারে—চলচ্চিত্র। যদিও তা ভিডিও-তে তোলা। এবং খুবই সীমিত সুযোগ সুবিধের মধ্যে।



দীপ্তরূপ দাস-এর মস্তিষ্কপ্রসূত এই ভিডিও ছবির পরিকল্পনাকে প্রথমেই সাধুবাদ জানাচ্ছি। বেশ কয়েক বছর ধরেই সরস্বতীপুজোর দিন রাত্রে দীপ্তরূপ তাঁর আমলাপাড়ার বাসভবনে বেশ কিছু আমন্ত্রিত দর্শকের সামনে তাঁর তৈরি ভিডিও ছবি দেখিয়ে থাকেন। এবার করেছেন দুটি। একটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প—'আজ বসন্ত'। দ্বিতীয়টি—'ক্লাস ফ্রেন্ড'। সত্যজিৎ রায়ের গল্প। বিগত কয়েকটি ছবির চেয়ে এবারের দুটি বেশ ভাল। এ হল অনুশীলনের পরিণতি। দেখতে বসে আমার খুবই ভাল লাগছিল এই জন্যে যে, বনগাঁর অভিনেত্রী অভিনেতাদের নিয়ে বেশ কিছু আউট-ডোর করে দীপ্তরূপ এই কাজটি তো করেছেন যা আগামীর এক সফল চলচ্চিত্রের বীজ হিসেবেই হয়ত এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। আসলে আমি এক গর্বিত বনগাঁবাসী হিসেবে দেখেছি ব'লে এই দুটির কাজের তেমন কোনও সমালোচনা করতে পারব না। যারা অভিনয় করেছে তারা সবাই আমার খুবই পরিচিত। প্রত্যেকের মুখচ্ছবি টিভি-র পর্দায় দেখতেই ভাল লেগেছে। ভেবেছি—বাঃ! ক্যামেরায় তো বেশ সুন্দর লাগছে ওর মুখটা।—এই মন নিয়ে সমালোচনা করা যায় না।

তবু, 'আজ বসন্ত'-র চেয়ে 'ক্লাস ফ্রেন্ড' আমার অপেক্ষাকৃত ভাল লেগেছে। 'আজ বসন্তে' দীর্ঘক্ষণ ধ'রে অশোকনগরের সংহতি পার্ক দেখিয়ে গল্পের সুর একেবারেই ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। পরে গল্পটাকে ধরাই যায়নি।

'ক্লাস ফ্রেন্ড' ছবিতে রুদ্র (নাথ)-র অভিনয় বেশ মাপা। ইচ্ছাচলা সাবলীল। তবে রুদ্র-র কাছ থেকে তার মুখমণ্ডলের অভিনয় আরো বেশি আশা করেছিলাম। এই ছবির একটি চরিত্রে কটা (তাপস) মুখার্জির অভিনয় খারাপ লাগেনি। তবে তাঁর মঞ্চাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য এই ছবি-র অভিনয়ে থেকে যাওয়ায় একটু উচ্চকিত লেগেছে। মঞ্চের অভিনয় এবং ক্যামেরার সামনের অভিনয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমারেখা তিনি টানেনি। এই ছবিতে পরিচালক ফ্লাশ ব্যাক-এর একটি দৃশ্যে চার্বাক দীপ্ত-র অভিনীত গানের দৃশ্যটি যদি খুব অল্পে ছাড়তেন তবে আরো ভাল হত।

দীপ্তরূপ দাস খুশি হতে পারেন এই ভেবে, আগামীতে কোনও বনগাঁবাসী যদি সম্পূর্ণভাবেই কোনও চলচ্চিত্র নির্মাণ ক..েন, তাহলে দীপ্ত বলতেই পারবেন যে, আমি বনগাঁয় প্রথম চলচ্চিত্র তৈরি করার বীজ পোঁতার চেষ্টা করেছিলাম।

PRANT... Fortnightly News

অপুর সংসার-এর এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান

[illegible]

স্মরণে দীপ্তরূপ

জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক
দিল্লি এক্সপ্রেস
২৯ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৪ চৈত্র ১৪৩১/VOL- 29, ISSUE- 24, 28 MARCH, 2025, শুক্রবার

উদাহরণ হয়ে চলে গেলেন দীপ্তরূপ


দীপ্তরূপ দাস

সংবাদদাতা । বিশ্বখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য, চার্বাকদর্শনে বিশ্বাসী ও যুক্তিবাদী লেখক বনগাঁ আমলাপাড়ার বাসিন্দা দীপ্তরূপ দাস গত ২৩ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তাঁর জন্ম ১৯৬০ সালের ১ এপ্রিল। ৫ ভাইয়ের একজন দীপ্তরূপ। সপরিবারে দেশভাগের পর বনগাঁয় চলে আসেন। বাবা মাখনলাল দাস ছিলেন সিনেমা হলের অপারেটর। তিনি এলেপে এসেও সিনেমা হলের (শ্রীরামহল)-এর অপারেটর হন। বাবার কাছ থেকে সিনেমার প্রতি গভীর ভালোবাসা অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি অনেকগুলি শর্টফিল্ম পরিচালনা করেন। যেগুলি বোদ্ধাদর্শকদের মুগ্ধ করে। তাঁর কয়েকটি ফিল্ম জাতীয় স্তরের। তাঁর ফিল্মগুলি প্রযোজকসংস্থা 'অপুর সংসার'। এই সংস্থাটির সঙ্গে বিশ্বখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে আছে। তিনিই নামটি দিয়েছিলেন। শর্টফিল্মগুলি নিম্নরূপ:১) 'গোঁসাইপুর সরগরম' (১৯৯২), কাহিনী সত্যজিৎ রায়। ২) জুতো (১৯৯৩), কাহিনি প্রবীর ঘোষ। ৩) প্রধানমন্ত্রী (১৯৯৪), কাহিনি রমানাথ রায়। ৪) দলবদলের আগে (১৯৯৫), কাহিনি মতি নন্দী। ৫) সাদা কালো (১৯৯৬), কাহিনি 'ডাক্তার জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড' অবলম্বনে। ৬) প্রাইজ ফিল্ম: বাঁশি (১৯৯৭), কাহিনি রবীন্দ্রনাথ। ৭) ক্লাস ফ্রেন্ড (২০০২), আজ বসন্ত (২০০২), কাহিনি সত্যজিৎ রায়। ৮) ডাক্তার মুন্সির ডায়েরি (২০০৪), সত্যজিৎ রায়। ৯) নিছক দুটি পরিবারের গল্প (২০০৫), কাহিনি দীপ্তরূপ দাস। ১০) বিরহিনী (২০০৯), কাহিনি সমরেশ মজুমদার। ১১) ঊনিশ-বিশ (২০১০), কাহিনি অনিল দে। ১২) চিত্রকূট (২০১১), কাহিনি আবুল বাশার। তাঁর পরিচালিত এই ফিল্মের অভিনেতারা সবাই বনগাঁর। অনেক অখ্যাত শিল্পীকে তিনি হাতে ধরে অভিনয় শিখিয়ে দেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সরকারি চাকরি পান গ্রন্থাগারে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের অভিনীত তিনটি শর্টফিল্ম পরিচালনা করেন—ক) ভীমলোচনের বক্তাবিভ্রম, খ) কিস্তিমাত, গ) আমার নামে নাম। ফিল্মগুলি সাধারণ মানুষকে দেখিয়েছেন নিজেরাই খরচে। বেশির ভাগ ফিল্মগুলির সম্পাদনা বাপীন দত্ত। অভিনয়ে ছিলেন কল্যাণপ্রসাদ নাথ, পুলক পাল, বৈশাখী চ্যাটার্জী/কর্মকার, সুকুমার সাহা, সঞ্চিতা দাস, তাপস মুখার্জী, নারায়ণ বিশ্বাস, নন্দিনী বিশ্বাস, দেবাশিস দাস, শংকর দাস, দিলীপ ঘোষ, কল্পনা মণ্ডল, দীপশিখা ঘোষচৌধুরী। ভরত বিশ্বাস প্রমুখ। অনেকগুলি ফিল্মের আবহ ও সুরকার ছিলেন

* এরপর ২ পাতায়

দীপ্তরূপ মানবতার স্বরূপ খুঁজে ফেরেন

[illegible]


কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। লেখা দেওয়ার জন্যে অপেক্ষারত দীপ্তরূপ দাস

স্থল বন্দর
বনগাঁর প্রথম প্রভাতী সংবাদপত্র

দীপ্তরূপ দাসের জীবনাবসান

বন্দর নিউজ: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বনগাঁ শহর এরিয়া কমিটির চার নম্বর শাখার সভ্য দীপ্তরূপ দাস(৬৪) রবিবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বনগাঁ আঞ্চলিক শাখার যুগ্ম সম্পাদক ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, আরণ্যক শাখার আমৃত্যু সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র বর্তমান। তার শেষ ইচ্ছা অনুসারে তার মৃতদেহ পরিবারের পক্ষ থেকে এনআরএস মেডিকেল কলেজে দান করা হয়। দীপ্তরূপ দাসের মরদেহ লাল পতাকায় আচ্ছাদিত করে শেষ শ্রদ্ধা জানান পার্টি জেলা কমিটির সদস্য সুমিত কর। মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের নীরেন্দ্রনাথ দাস। পাঠাগারের সভাপতি অলক বিশ্বাস, সম্পাদক আশীস বসু সহ তাঁর সহকর্মীরা। শ্রমিক পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক হিসাবে চারবছর আগে অবসর নেন তিনি। দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন।



বনগাঁর নিজবাসভবনে স্মরণসভার শেষে সবার মাঝে দীপ্তরূপ।







বনগাঁর
নিজবাসভবনে
পরিবার ও
বনগাঁ লেখক
শিল্পী সংঘ
আয়োজিত
স্মরণসভা।





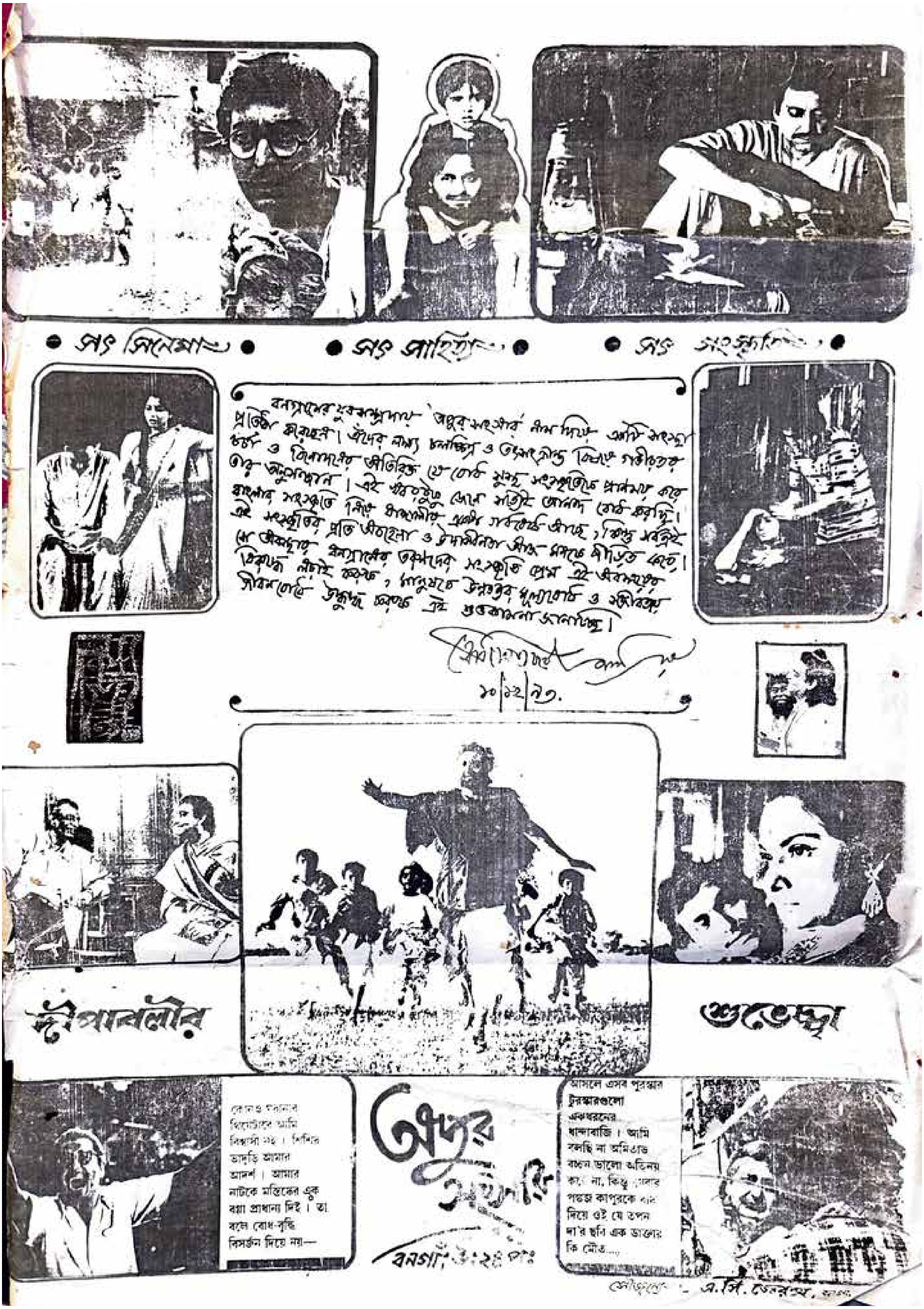








বনগাঁর লাইব্রেরি এসোসিয়েশন আয়োজিত টাউন লাইব্রেরিতে স্মরণসভা।



অপুর সংসার-কৃত সৌমিত্র কোলাজ।

সংরক্ষিত নানা জিনিস



সিল করে সংরক্ষিত অ্যাশট্রে। ছোট অ্যাশট্রেতে শেষ খাওয়া সিগারেট।



প্রিয় ধূপদানি, বাঁধানো দাঁত, সানগ্লাস ও ঘড়ি।



ওষুধপত্র, ইনহেলার ও শেষ খাওয়া ওষুধ।



শখের ভিডিও ক্যাসেট, অডিও ক্যাসেট ও সি.ডি.-এর সংগ্রহের একাংশ।



শেষ মাখা
তেল ও অন্যান্য
জিনিসপত্র।



শেষ সিগারেটের
বাক্স, চশমা ও
অন্যান্য জিনিস।



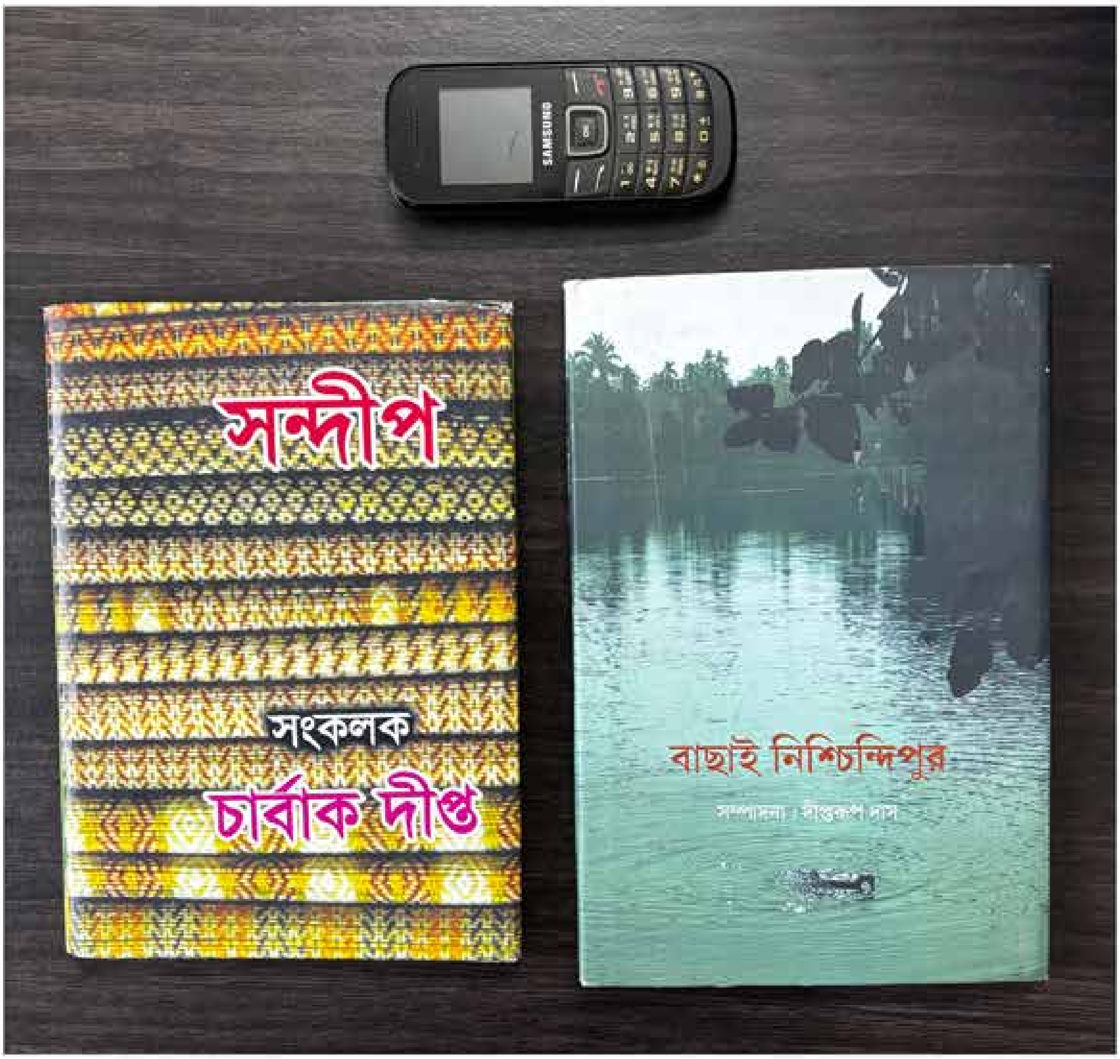
হিসেবের খাতা ও টয়লেট পেপার রোল দিয়ে তৈরী কিছু হাতের কাজ।



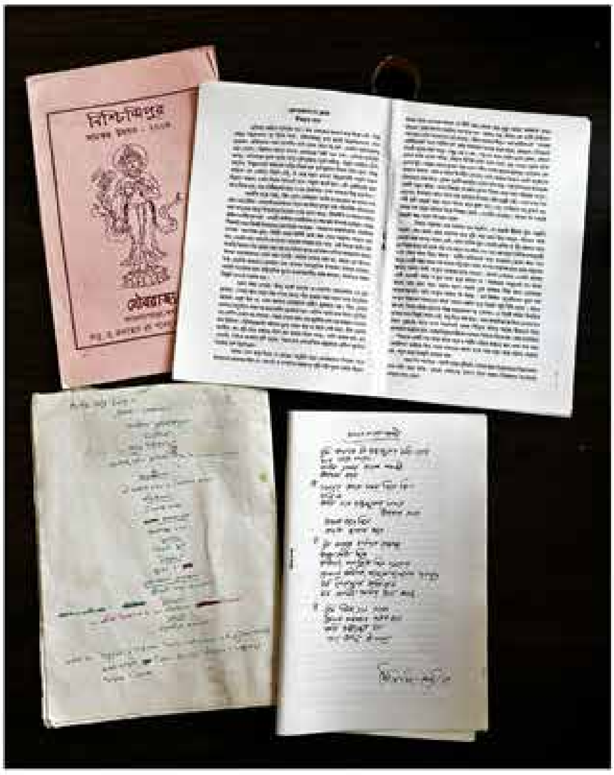
ছেলের গানের অনুষ্ঠানে অতিথিদের মন্তব্যের খাতা ও শেষ ধূপের প্যাকেট।



শেষ ব্যবহৃত
ধুনুচি, চায়ের
কাপ ও গ্লাস।



সম্পাদিত বই ও
শেষ ফোন।





সম্পাদিত নিশ্চিন্দিপুর লিটল ম্যাগাজিন, ছেলের বিয়ের খসড়া, প্রবন্ধ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা।

সারস্বত উৎসবের আমন্ত্রণ পত্র ও যৌবরাজ্য কোচিং সেন্টারের ভর্তির আবেদনপত্র।



শখের ফটো এলবামের কয়েকটি।



প্রাণের চেয়েও
প্রিয় ক্রোম ফিল্মস,
স্লাইড ফিল্মসের
সঙ্গে চালানোর জন্য
নিজহাতে সংকলিত
অ্যালবাম- মৃত্যুহীন
প্রাণ ও সর্বক্ষণের সঙ্গী
কালো ব্যাগ।



নিজহাতে তৈরী
সত্যজিৎ রায়ের
কোলাজ, ছেলের
বিয়ের অ্যালবাম ও
ফটো কিউব আর
জীবনের ধ্রুবতারা
ডিরোজিও ও
বার্নার্ড শ।



শেষ জামা প্যান্ট
বাড়ির দরজায়
ঝোলানো ও
সংরক্ষিত।



শখের কেনা
গ্রামোফোন।



উপর থেকে, প্রাণের প্রিয় ভিডিও প্রজেক্টর, নানা অনুষ্ঠানে পাওয়া সম্মান, রেকর্ড প্লেয়ার, মেথির শিশি, খুচরো জমানোর ঘট, কলকাতার ফ্ল্যাটের অ্যাশ ট্রে ও স্টীল প্রজেক্টর।





জীবনের শেষ ছবি, স্ত্রী, ছেলে ও পুত্রবধূর সঙ্গে রাজারহাটে ছেলের ফ্ল্যাটে। হাতে ছেলের কমিকস।

